শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃত

প্রথম খণ্ড

-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তত্ত্ব-

সরল গঠনতত্ত্ব, বারিবেগবিজ্ঞান

প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল বি-ই

এম-আই-ই (ইণ্ড), এফ্-আর-এস্-এ (লণ্ডন)

রোড ইঞ্জিনিয়ার

সন ১৩৫২ সাল

ইং ১৯৪৬

[ভিক্ষামূল্য দুই টাকা মাত্র]

প্রকাশক—

শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল

১নং বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড

কলিকাতা

কৃষ্ণনগর

শ্রীভাগবত প্রেস হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ-পত্র

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় শ্রীরাম নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

নবদ্বীপ-হরিবোল-কুটীর-প্রতিষ্ঠাতা

ভালবাসার মূর্ত্ত বিগ্রহ

শ্রীগুরু-গৌরগত-প্রাণ

নিত্যধাম প্রাপ্ত

শ্রীল গিরিধারী দাস হরিবোলের

অপার্থিব ভালবাসা, প্রাণঢালা আশীর্ব্বাদ

ও অপার করুণা স্মরণ করিয়া

তাঁহারই উদ্দেশে

ভক্তি-অর্ঘ্য সহ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

অবতরণিকা

স্বয়ং ভগবান শ্রীনন্দনন্দন শ্রীবৃন্দাবনে অশেষ বিশেষে রসাস্বাদন করিয়াও যখন পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না, যখন প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয়-সুখাস্বাদনে বা স্বমাধুরী-ভোগে অসমর্থ হইয়া তিনি ক্ষুব্ধমতি হইয়া পড়েন, তখনই তাঁহার শ্রীনবদ্বীপে শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি-সুবলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে অবতারের প্রয়োজনীয়তা হয়। শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয় ও শ্রীশচীনন্দন তত্ত্বতঃ এক হইয়াও লীলাদি-বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহাই গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়িগণের অভিমত। শ্রীমন্ মুরারি গুপ্তের কড়চা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাদি ব্যতীত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি বঙ্গভাষানিবদ্ধ গ্রন্থেও এই মূল তত্ত্বকথাই বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হইয়াছে। লীলাবিগ্রহচিত্ত শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বিবিধ কৌশলে শ্রীচৈতন্যকেই শ্রীগোকুলনাথ হইতে অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও তাহাতে দার্শনিক প্রণালীতে শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখন বিরলপ্রচার কতিপয় লোকমাত্র এই মতে আস্থাবান হইয়া এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় উদ্বুদ্ধচিত্ত শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-চরণ স্বকীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দার্শনিক ভিত্তিতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তদীয় অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ নির্দ্দেশ

পূর্ব্বক তাহারই যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখনীতে শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরাজত্ব অংশটা অপরিস্ফুট থাকায় শ্রীখণ্ডকীর্ত্তি শ্রীখণ্ডবিলাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের কৃপা-ইঙ্গিতে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ও ধামালীতে শ্রীগৌরাঙ্গের অপরূপ (ভাব-সম্মিলনাত্মক) নাগরালির বিবৃতি দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দার্শনিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য। এই সকল মৌলিক গ্রন্থমালার অনুকরণে ও অনুসরণে উত্তরকালে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। এই অমূল্য গ্রন্থ রাজির কতকগুলি তৎকালে (কলিকাতার) বটতলার মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত হইয়া তথাকথিত অনভিজ্ঞ বা অল্প শিক্ষিত বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচারিত হইত; আবার কতক-গুলি অন্ধকারময় কারাকক্ষে কীটদষ্ট ও জরাজীর্ণ অবস্থায় নিহিত থাকিয়াই লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করিত বা অন্তর্হিত হইত। কালক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের নিস্কৃত দাস সুশিক্ষিত মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ যখন তদীয় অগ্রজ ভক্তপ্রবর হেমন্ত কুমারের সঙ্গ-প্রভাবে, সৎপরামর্শে ও শুভ ইচ্ছার অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে আত্মদান হইলেন, তখন বটতলার এই ছিন্ন ভিন্ন ও মুদ্রাকর-প্রমাদে বিজড়িত গ্রন্থগুলিই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তিপূত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া "অমিয়নিমাইচরিত" স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করত কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—সর্ব্বসম্প্রদায়ের নরনারীর হৃৎকর্ণরসায়ন হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে শিশির বাবুর 'অমিয়নিমাইচরিত' কত শত ধর্ম্মচ্যুত লোককে সৎপথে আনিয়াছে, কত শত বিমুখকে অন্তর্মুখীন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-কল্পতরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশীতল ও কৃতকৃতার্থ করিতেছে—তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রেমময় শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সত্য সত্যই 'অমৃত সরোবর'—ভক্তগণ স্ব স্ব ভাবানুযায়ী এই অমৃত-সরোবরে

অবগাহনপূর্ব্বক যথাসাধ্য ভক্তিরত্ন আহরণ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন। তাঁহারা এই রত্নমালার সুন্দর সুন্দর হার গাঁথিয়া জগদ্বাসী নরনারীকেও পরাইয়া ধন্য ধন্য করিয়াছেন। এই প্রেমপুরুষোত্তমের লীলাস্বরূপা কামধেনুর নিকট সুযোগ্য ভক্তবৎস কখনও বিফল মনোরথ হয় না. তৃষ্ণানুরূপ কিছু না কিছু পান করিবেই। 'শ্রীচৈতন্য-রসায়ন'-নামক গ্রন্থ-প্রণয়নকালে শ্রীগৌরসুন্দর স্বপ্নাবেশে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকে এই কথারই ইঙ্গিত দিয়াছেন—(নরোত্তম বিলাস পৃঃ ২০১)—

"মোর লীলারসে মগ্ন মোর ভক্তগণ।
আস্বাদয়ে নানামত করিয়া বর্ণন॥
যে যৈছে রূপ বর্ণিব, সে সব তৈছে হয়।
না কর সন্দেহ, এ পরানন্দময়॥"

বস্তুতঃ এই লীলাপারাবারের আদ্যন্ত না থাকায় এবং সর্ব্বত্রই প্রেম বৈচিত্রী, রসবঙ্গী ও ভাবমাধুর্য্যের বিদ্যমানতায় যিনি যে ভাবেই বর্ণনা করুন না কেন, তাহাই ভাবক ও রসিকগণের রতিবর্দ্ধক ও আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে।

আমাদের আলোচ্য এই **শ্রীগৌরলীলামৃত** গ্রন্থখানি লীলাবিষয়ক হইলেও সুযোগ্য গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মমতের তাত্ত্বিকাংশগুলিও ইহাতে সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ভাষাটি প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। গ্রন্থকার সহজভাবে ও সরল ভাষায় গুরুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলিকেও এমন হৃদয়ঙ্গম করিবার তুলিয়াছেন যে তাহাতে কঠিন কঠিন জটিল বিষয়গুলিও বুঝিতে মোটেই কষ্ট করিতে হয় না। লীলামাধুরী বজায় রাখিয়া তত্ত্বভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এ জাতীয় একখানি গ্রন্থের অভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বহুদিন হইতে বোধ করিতেছিল। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার সেই ভাবটি পূর্ণ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বিস্ময়ের

ব্যাপার এই যে ইনি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব না হইয়াও 'হৃদি যস্য প্রেরণয়া' ন্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বগুলিও স্বয়ং উপলব্ধি করত লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। 'বর্ণচোরা' রসাল ফলের ন্যায় কত শত রসময় শ্রীগৌরভক্ত যে প্রচ্ছন্নভাবে প্রচ্ছন্ন গৌরাঙ্গের ভজন করিতেছেন, তাহা মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের অগোচরই বটে। অধুনা তাঁহার সঙ্কলিত বিরাট গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তত্ত্বই' প্রকাশিত হইলেন। আমরা অন্যান্য খণ্ডও দেখিবার সৌভাগ্য বাঞ্ছা করিতেছি। ইচ্ছা ছিল, আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ ও আস্বাদন করিয়া তাঁহার লেখনীর সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব, কিন্তু দৃষ্টিমান্দ্য-বশতঃ আপাততঃ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গ্রন্থকারের প্রচেষ্টার ভূয়োভূয়ঃ স্তুতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। জয় গৌরসুন্দর! জয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ, জয় লীলা-পরিবেশক ভক্তবৃন্দ!!

শ্রীধাম-নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস

নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতোপম লীলা-মাধুরী বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া মাদৃশ সাধনভজনহীন ভাষানভিজ্ঞ অকিঞ্চনের পক্ষে—"বামনের চাঁদ ধরার" ন্যায়—হাস্যোদ্দীপক বটে, কিন্তু "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"—এইরূপ অসম্ভব ব্যাপারও যাঁহার কৃপায় সম্ভবপর হয়, সেই পরম পুরুষের অভয়পদ স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ কিছু কিছু অনুভব করিয়া আত্মশোধন-মানসে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। **শ্রীগৌর-লীলামৃত** গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে **গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তত্ত্ব**, দ্বিতীয় খণ্ডে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর **নবদ্বীপ-লীলা** এবং তৃতীয় খণ্ডে তাঁহার **নীলাচল-লীলা** বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি চারিদিকে পৈশাচিক ধর্ম্মান্ধতার ও বর্ব্বরতার অভিযান আরম্ভ হইয়াছে এবং মানবতার ও সভ্যতার মূলে নির্ম্মম কুঠারাঘাত চলিতেছে। এহেন সঙ্কটময় দিনে নানা অসুবিধা বশতঃ মুদ্রণাদি কার্য্য আশানুরূপ না হওয়ায়, এক্ষণে শুধু প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

প্রথম খণ্ডে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সার সঙ্কলন করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সরল ভাষায় বিন্যস্ত করিতে, নানা স্থান হইতে প্রয়োজনানুকূল পুষ্পরাজি আহরণ করিয়া একটী সুদৃশ্য গুচ্ছ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সুতরাং ইহাতে আমার নিজস্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। সাধুভক্ত মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থে যাহা পাইয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে ধারাবাহিকরূপে সন্নিবিষ্ট করিতে যত্নবান হইয়াছি। যাঁহাদের সুমধুর বাণী অবলম্বন করিয়া এবং যাঁহাদের রচিত গ্রন্থের সাহায্যে ইহা লিখিত হইল, তাঁহাদের সকলের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি আমাকে

বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে এবং তাহারই পয়ার সংখ্যা এই গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। তদনুযায়ী '১' দ্বারা আদিলীলা, '২' দ্বারা মধ্যলীলা এবং '৩' দ্বারা অন্ত্যলীলা সূচিত করিয়া, প্রথমতঃ লীলার অঙ্ক, তৎপরে পরিচ্ছেদের অঙ্ক এবং সর্ব্বশেষে পয়ার-সংখ্যার অঙ্ক লিখিত হইল—যথা "চৈঃ চঃ ১।২।৩" দ্বারা বুঝিতে হইবে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পয়ার। মুদ্রাকর-প্রমাদে ও নিজ অজ্ঞতার ফলে এই গ্রন্থে বহু অশুদ্ধি ও অপসিদ্ধান্ত থাকাই সম্ভব। আমার বিনীত প্রার্থনা—অদোষদর্শী সুধীবৃন্দ সেগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন এবং দোষাদির বিচার না করিয়া গ্রন্থখানিকে করুণানয়নে দর্শন করিবেন।

বহু ভক্তিগ্রন্থপ্রকাশক অকিঞ্চন বৈষ্ণব শ্রীল হরিদাস দাস এম-এ, বেদান্ততীর্থ এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক বাগ্মীপ্রবর শ্রীমৎ স্বামী চৈতন্য গোবিন্দ ভারতী মহোদয়দ্বয় এই অধমকে নানাভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া গ্রন্থ-প্রণয়নে উৎসাহিত করিয়াছেন। লীলাগতপ্রাণ স্বামিজির কৃপাশীর্ব্বাদে আমার দৃষ্টি শ্রীভগবানের মাধুর্য্যভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস মহোদয় অন্যাধিক পঁয়ত্রিশখানি ভক্তিগ্রন্থ ভারতের নানা স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া স্বরচিত ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের অবতরণিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মুদ্রণ-বিষয়ে তিনি আনুকূল্য না করিলে গ্রন্থখানি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইত না। পরম শ্রদ্ধার সহিত আমি উভয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি। এই শুভ প্রচেষ্টার ফলে ভক্ত ও তত্ত্ব-পিপাসুর আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইলে আমার যাবতীয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

দুর্গাবাস, নবদ্বীপ-ধাম
অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ } বিনীত—
গ্রন্থকার

পরিচ্ছেদ-বিবরণ

তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বাশ্রয়; তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বমাধুর্য্য-ও সর্ব্বরস-পূর্ণ (৩২-৩৩)। তিনিই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এবং প্রকাশভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে অভিহিত হন (৩৩)। শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্যের কিরণস্বরূপ ব্রহ্ম হইলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, সূর্য্যমণ্ডলস্বরূপ পরমাত্মা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশবিভূতি এবং পূর্ণরূপ শ্রীভগবান (চতুর্ভুজ নারায়ণ) হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি (৩৪-৩৫)। শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহী ভেদ নাই; স্বজাতীয় বিজাতীয় বা স্বগত ভেদও তাঁহাতে নাই। তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় (৩৬)। তাঁহার নরলীলাই সর্ব্বোত্তম; নর-দেহেও তিনি বিভু; সচ্চিদানন্দময় ব্রজধাম তাঁহার লীলাস্থলী (৩৭)। তিনি নিত্যনবকিশোর ও মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার; শৃঙ্গার রসই তাঁহার সর্ব্বসম্পত্তি; তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ; তিনি নিজমাধুর্য্যে নিজেই মুগ্ধ হইয়া যান (৩৮)। তাঁহার চারি অনন্যসাধারণ গুণ—রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্য (৩৯)।

৩। শক্তিতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব ৪০-৪৭

শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রধানশক্তি—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিরূপিণী যোগমায়া তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি (৪০)। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বিবিধা বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। প্রকৃতিরূপা জীবমায়া বিশ্বের গৌণ নিমিত্ত কারণ এবং প্রধানরূপা গুণমায়া বিশ্বের গৌণ উপাদান কারণ। জীবমায়াই জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে মায়িক বস্তুতে মুগ্ধ করে (৪১)। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই জীবের মায়া বন্ধনের ও তাপত্রয়ের কারণ। চিচ্ছক্তি ত্রিবিধ—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী (৪২-৪৩)। মাদনাখ্যমহাভাবময়ী শ্রীরাধিকাই হ্লাদিনী-শক্তির সারস্বরূপা এবং স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা শক্তি (৪৪)। লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও গোপাঙ্গনাগণ তাঁহারই

অংশবিশেষ; শ্রীরাধা স্বয়ংরূপে এবং স্বীয় কায়ব্যূহরূপা সখী-মঞ্জরীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করেন (৪৫)। শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর কিছুই তিনি জানেন না, আর কিছুই তিনি চাহেন না। শ্রীরাধা-প্রেমের তুলনা নাই (৪৬-৪৭)।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিত রূপ অর্থাৎ রসরাজ-মহাভাবের অপূর্ব্ব মহামিলনই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপ। শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব ও গৌরকান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজলীলায় অপূর্ণ তিনবাসনা পূর্ণ করিলেন এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে যুগধর্ম্ম ও প্রেমভক্তি প্রচার করিলেন (৪৭-৫০)। প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে একবার করিয়া শ্যামসুন্দর ও গৌরসুন্দর ধরায় অবতীর্ণ হয়েন। যে দ্বাপরে শ্যামসুন্দর অবতীর্ণ হয়েন, তাহারই পরবর্ত্তী কলিযুগে গৌরসুন্দর আবির্ভূত হয়েন। গৌরসুন্দর শ্যামসুন্দরেরই আবির্ভাব-বিশেষ (৫১)। করুণাবতার দয়াল ঠাকুর শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর ন্যায় নির্ব্বিচার প্রেমদাতা ও পতিতের বন্ধু হয় নাই, আর হইবেও না (৫২-৫৩)।

স্বয়ংরূপ ও প্রকাশরূপ; তদেকাত্মরূপ—বিলাস ও স্বাংশ; কায়ব্যূহ (৫৫-৯)। শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব; পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। পঞ্চপ্রকার মুক্তি। কৃষ্ণলোক, সিদ্ধলোক ও কারণার্ণব বা কারণসমুদ্র (৬০-১)। কারণার্ণব-শায়ী প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণু (প্রকৃতির বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী), গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ বা পদ্মনাভ, যাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম ও-পদ্ম-মৃণালে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিত (ইনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের বা সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী) এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ বা গুণাবতার বিষ্ণু (ব্যষ্টি

পণ্ডিত) ও ভক্তিতত্ত্ব (শ্রীবাস পণ্ডিত)—এই পাঁচজনকে লইয়া পঞ্চতত্ত্ব হয় (৭৪-৬)। শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধার (৭৭-৮)। প্রেমভক্তি এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বসম্পত্তি (৭৮-৯)। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম। প্রকৃত বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম হইয়া আপনাকে হীন মনে করেন। এই সম্প্রদায়ে সংসার-ত্যাগের বা প্রবৃত্তি ধ্বংসের প্রয়োজন নাই। বৃত্তিগুলিকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত রাখিয়া অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করাই উপদিষ্ট হইয়াছে (৮০-২)। সংসারত্যাগীর পক্ষে দৈহিক সুখ ও সর্ব্ববিধ ভোগ ত্যাগ করা উপদিষ্ট হইয়াছে (৮০-২)। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সাধন—ইহার প্রভাবে রাগ-দ্বেষ বিদূরিত হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যায়। পরমুখাপেক্ষী হওয়া বা শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বিষয়ীর দ্রব্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ (৮৩-৪)।

৪। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ৮৫-৮৯

ঋগ্বেদে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। কলিযুগে হরিনাম বিনা আর গতি নাই। নাম ও নামী অভিন্ন (৮৫-৬)। নামাভাসেও মুক্তিলাভ হয়। প্রেমভক্তিই নামের মুখ্যফল, পাপক্ষয় ও মোক্ষলাভ ইহার আনুষঙ্গিক ফল। বিষয়চিন্তা করিলে নামে রসবোধ হয় না। নিরপরাধে শ্রীনামের আশ্রয়গ্রহণ করিলে চিত্তে প্রেমের উদয় হয় (৮৭-৮)। দশবিধ নামাপরাধ (৮৯)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব) ৯০-১৫৭

সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করিলে অতুল আনন্দলাভ করা যায়। আপাতসুখকর অনিত্য বিষয়ে সুখ নাই (৯০)। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রিয় বা আপনার জন আর কেহ নাই। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। প্রভুর সুখেই দাসের সুখ। শ্রীকৃষ্ণসুখানুকূল কার্য্যই ভক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণে মমতাই প্রেম। ভক্তি বিনা প্রেম হয় না, আর প্রেম বিনা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না (৯১)। শ্রীকৃষ্ণই বেদের সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রবণ-

কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তিই অভিধেয় বা বক্তব্য বিষয় এবং ভক্তির ফলস্বরূপ প্রেমই প্রয়োজন বা পরম পুরুষার্থ (৯২)। ভক্তিও তাহার প্রাধান্য (৯৩-৪)। নববিধা-ভক্তি (৯৫)। শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ (৯৬-৭)। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য, তিনি মোক্ষকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন (৯৮)। ভক্তিমার্গে অভিমান ও ইন্দ্রিয়লালসা ত্যাগ করা এবং জীবে সম্মান দেওয়া আবশ্যক (৯৯)। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার প্রকৃতি। তিনিই জীবের একমাত্র আশ্রয়। ভক্তের লক্ষণ (১০০-২)। রতি বা ভাব ও প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ শুধুপ্রেমেরই কাঙ্গাল। কাম ও প্রেম। প্রেম বিনা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না (১০৩-৪)। প্রেমবিকাশের ক্রম—শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম (১০৫-৯)। সকাম সাধনা (১০৬)। সাধনভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা এবং সাধ্যভক্তি—ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। বৈধীভক্তি ও রাগানুগা বা রাগভক্তি (১০৯-১০)। প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ অবস্থা (১১১)। স্বরূপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও আরোপসিদ্ধা ভক্তি (১১২)। বৈধীভক্তি—স্বধর্ম্মাচরণ, শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, ভগবচ্ছরণাগতি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও জ্ঞানশূন্যা ভক্তি (১১১-৬)। আমি-তোমার ও তুমি-আমার ভাব (১১৬)। রাগভক্তির পঞ্চভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (১১৭-১২০)। শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি (১২১)। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি (১২১-৫)। রাগাত্মিকা ভক্তি ও তদনুসারী রাগানুগা বা রাগভক্তি (১২৫-৭)। রাগভক্তির ভজন (১২৮-৩০)। সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি (১৩১-২)। শুদ্ধা রতি ও মিশ্রা রতি (১৩২-৩)। প্রেমবৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। রূঢ়ভাব ও অধিরূঢ় ভাবরূপ মহাভাব (১৩৩-৭)। রূঢ়ভাবের অনুভাব (১৩৮)। শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ। শান্তাদি রতির শেষ সীমা (১৩৮-৯)। শ্রীরাধা-প্রেমের বৈশিষ্ট্য (১৩৯-৪০)।

নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। সখী-মঞ্জরীগণ শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহ (১৪১)। অষ্টসখী (১৪২)। সখীগণের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত যুগলকিশোরের নিকুঞ্জসেবা লাভ হয় না (১৪৩)। শ্রীকৃষ্ণসুখই ব্রজগোপীগণের একমাত্র লক্ষ্য (১৪৩-৫)। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিধারণ। বিরহকাতরা ব্রজগোপীগণের আত্মবিস্মৃতি ও শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ (১৪৫-৬)। স্বকীয়া ও পরকীয়া। গোপী প্রেমের বৈশিষ্ট্য। প্রকট ও অপ্রকটলীলা (১৪৭-৫০)। ব্রজগোপীগণের পরকীয়া লীলা ব্যভিচার-দুষ্ট নহে, স্বয়ং অরুন্ধতীও তাঁহাদের পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছা করেন (১৫১) অঘটনঘটনপটীয়সী ভগবতী যোগমায়ার অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা (১৫১-২)। শ্রীরাধিকাই রূপে, গুণে, প্রেমে ও সৌভাগ্যে সর্ব্বাধিকা; রাসলীলায় তাঁহার প্রেমমহিমা। প্রেমবৈচিত্ত্য (১৫২-৪) পরকীয়ানিবন্ধন দুর্ল্লভতা। রসের অবস্থান ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপ (১৫৫-৬)। প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত ও তুমি-আমি ভাব। বিপরীত বিলাস (১৫৫-৭)।

কৃষ্ণভক্তিরস ও স্থায়ীভাব (১৫৮)। শৃঙ্গাররস (১৬০-১)। শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধ মুখ্যা রতি ও হাস্যাদি সপ্তপ্রকার গৌণী রতি (১৫৯-৬০) রসশাস্ত্রে স্থায়ীভাব নামে অভিহিত। ইহারাই স্বযোগ্য বিভাব (১৬১-৪), অনুভাব (১৬৪-৫), সাত্ত্বিকভাব (১৬৫-৭), ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব (১৬৭-৮)— এই চারিভাবের সংযোগে পরিপুষ্ট ও আস্বাদনীয় হইয়া পঞ্চবিধ মুখ্য রসে ও সাতপ্রকার গৌণ রসে পরিণত হয়। রত্যাদির আস্বাদন-অবস্থার নাম 'রস'। যাহার আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই, তাহাকে 'রস' বলা যায় না। স্থায়ীভাবই রসের মূল বা ভিত্তিস্বরূপ, বিভাব তাহার কারণ-স্বরূপ, অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব তাহার কার্য্য-স্বরূপ এবং ব্যভিচারী ভাব তাহার সহায়-স্বরূপ। বিভাবাদি চারিভাবের সংযোগে আনন্দচমৎকারিতা লাভ করিয়া মধুরা রতিই শৃঙ্গার

বা উজ্জলরসে পরিণত হয় (১৫৯-৭৫)। বিংশতি প্রকার অলঙ্কার (১৬৯-৭৫)। শৃঙ্গার রসে নায়ক বলিতে শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে এবং নায়িকা বলিতে শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণকে বুঝায়। নায়িকাভেদ (১৭৬-৮৮)। অষ্ট নায়িকা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা (১৮৪-৮)। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গার রস দ্বিবিধ। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার (১৮৯-৯৩)। প্রোষিতভর্ত্তৃকার দশ দশা (১৯৩-৪)। সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান ভেদে সম্ভোগ চারিপ্রকার (১৯৪-৭)। নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণী (১৯৭-২০১)। যুগল-কিশোরের অপূর্ব্ব প্রেমলীলা (২০১-৩)। শৃঙ্গার-রসাকৃষ্ট বহির্ম্মুখ জীবকে আত্মপরায়ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রেমের খেলা। বেদের ব্রহ্ম ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপ (২০৩)।

শ্লোক-সূচী

পয়ারাদির সূচী

শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃত।

প্রথম খণ্ড

—গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব—

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাভাষ

১। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপূর্ব্বলীলা—

১৪০৭শকে (ইং ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধরায় **আবির্ভাব,** ১৪৩১শকে (ইং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে) মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে তাঁহার **সন্ন্যাসগ্রহণ** এবং **১৪৫৫** শকে (ইং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) সম্ভবতঃ আষাঢ় মাসে তাঁহার **তিরোভাব।** এইরূপে তিনি ৪৮ বৎসর কাল ধরাধামে প্রকট ছিলেন। **প্রকটকালের** প্রথম ২৪ বৎসর নবদ্বীপধামে তাঁহার **গার্হস্থ্য-লীলা** এবং শেষ ২৪ বৎসর নীলাচলধামে তাঁহার **সন্ন্যাস-লীলা।** এইভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধার গৌরকান্তির অন্তরালে নিজ শ্যামকান্তি ঢাকিয়া যুগধর্ম্ম ও প্রেমধর্ম্ম জগতে প্রচার করেন এবং ব্রজের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া ব্রজলীলায় অপূর্ণ তিন বাসনা পূর্ণ করেন। শ্রীরাধা-ভাব-দ্যুতিসুবলিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের চির আদরের শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু, তিনিই আমাদের কলিপাবনাবতার গৌরহরি। তাঁহার পিতার নাম **শ্রীজগন্নাথ মিশ্র** এবং মাতার নাম **শ্রীশচীদেবী।**

যথাসময়ে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর **বিদ্যারম্ভ** হয়। অধ্যয়নকালে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। এই সময়ে একদিন তাঁহার অগ্রজ **বিশ্বরূপ** গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপের বয়স তখন ষোল বৎসর এবং মহাপ্রভুর বয়স ছয় বৎসর মাত্র। পুত্রশোকাতুরা শচীমাতার অত্যধিক আদরে গৌরহরি ক্রমশঃ দুরন্ত ও উদ্ধত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ছোট্ট ছেলেটীর দুরন্তপণায় পাড়ার সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। শচীমাতা আর তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। কথিত আছে, এই সময়ে মহাপ্রভু প্রিয় বয়স্যগণের সহিত সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনও করিতেন। ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার **পিতৃবিয়োগ** হয়। অতঃপর তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারে সামান্য অর্থকষ্ট দেখা দিয়াছিল। ১৬ বৎসর বয়সেই তিনি অধ্যয়ন শেষ করিয়া টোলে **অধ্যাপনা আরম্ভ** করেন। দিন দিন টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অল্পদিনেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অধ্যাপনা আরম্ভকালেই বল্লভাচার্য্যের সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা **শ্রীলক্ষ্মীদেবীর** সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

২২।২৩ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু পিতৃকার্য্য করিবার জন্য **গয়াধামে যাত্রা** করেন এবং সেই স্থানেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট **শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত** হন। গয়াযাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি পাণ্ডিত্যাভিমানী ও উদ্ধতের শিরোমণি ছিলেন। ভক্তিমূলক কোন কথাই তখন তাঁহার মুখে আসিত না, প্রতিবেশী বৈষ্ণবগণের সহিত তিনি বরং ঠাট্টা বিদ্রূপই করিতেন। কেবল ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কয়েক মাসের জন্য **পূর্ব্ববঙ্গে** যাইয়া তথায় **শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন** প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থানকালে তাঁহার প্রথমা ভার্য্যা শ্রীলক্ষ্মীদেবী মরজগৎ ত্যাগ করেন। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত অধ্যাপনায় মন দিলেন। এখন তিনি নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত, সকলেই

তাঁহাকে বহু সম্মান করেন। এখন আর তাঁহার সংসারে অর্থকষ্ট নাই। এইবার শচীমাতা তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ২০ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা **শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর** পাণিগ্রহণ করেন। নববধূর বয়স তখন ১০ বৎসর মাত্র।

গয়া হইতে মহাপ্রভু সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বে যিনি পাণ্ডিত্যাভিমানী ও উদ্ধতের শিরোমণি ছিলেন, পূর্ব্বে যিনি পথে ঘাটে দলবল লইয়া কৌতুকরঙ্গ করিয়া বেড়াইতেন, তিনিই এখন বৈষ্ণবসুলভ বিনয়ের খনি, তিনিই এখন সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। এখন তাঁহার মুখে শুধু কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণগুণগান এবং কৃষ্ণবিরহে আকুল ক্রন্দন ও মূর্চ্ছা। এই সময়ে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতিকে লইয়া **শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন** আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে নিত্য আনন্দস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ বহু ভক্ত আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। এইরূপে নবদ্বীপে এমন এক বৈষ্ণবসম্প্রদায় গঠিত হইল, যাঁহাদের **উপাস্য দেবতা** হইলেন দ্বিভুজ মুরলীধর **ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ**। এই সম্প্রদায়ের মতে লক্ষ্মীপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ হইলেন পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি মাত্র। তাৎকালীন বৈষ্ণবগণের অধিনায়ক ছিলেন শান্তিপুর-নাথ সীতাপতি **শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য**। কথিত আছে, তাঁহারই সপ্রেম হুঙ্কারে ও কাতর আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হন। বহুদিন যাবৎ নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং চিরদিনের জন্য তিনি মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত ভক্ত হইয়া পড়িলেন।

তাৎকালীন নবদ্বীপ নগরের কোটাল ছিলেন **জগাই** ও **মাধাই** নামে ঘোর অত্যাচারী ও মহাপাষণ্ড দুই ভাই। নিত্যানন্দ প্রভুর আগ্রহে ও মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহারা পরম বৈষ্ণব হইয়া পড়েন। সেই সময়ে নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা যবন **চাঁদকাজী** ছিলেন বৈষ্ণবদ্বেষী ও সঙ্কীর্ত্তনের ঘোর বিরোধী। তিনি ছিলেন আবার গৌড়-বাদসাহের দৌহিত্র। সেই চাঁদকাজীও যখন মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন, তখন আর সঙ্কীর্ত্তনের ও শ্রীনাম-প্রচারের কোন প্রতিবন্ধক থাকিল না। এইরূপে নবদ্বীপে অবাধ সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেখানে এক অভিনব ধর্ম্মভাবের জাগরণ দেখা দিল। এইখানে মহাপ্রভুর **নবদ্বীপ-লীলা** শেষ হইল।

অতঃপর মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা মাতা, কিশোরী ভার্য্যা ও প্রিয় ভক্তগণকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া **সন্ন্যাস-গ্রহণ** করেন। নবদ্বীপের অধ্যাপকমণ্ডলী মহাপ্রভুর নাম-সঙ্কীর্ত্তন পছন্দ করিতেন না, নবীন ছাত্রের দলও ক্রমে ক্রমে মহাপ্রভুর বিরোধী হইয়া উঠিল। তখন দীনদয়াল পতিতপাবন গৌরহরি ভাবিলেন- সুখের সংসার ত্যাগ করিয়া দীন হীন কাঙ্গাল বেশে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কলিহত মলিন জীবের কঠিন হৃদয়ও কোমল হইতে পারে, তখন আর তাঁহার বিরোধী দলও শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবে না। অনাদি-বহির্ম্মুখ মলিন জীবের সুকঠিন চিত্ত দ্রব করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জগতে প্রেমভক্তি বিলাইবার জন্য মহাপ্রভুর এই **সন্ন্যাস-লীলা**।

কাটোয়া নগরে শ্রীপাদ **কেশব-ভারতীর** নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক **বাসুদেব সার্ব্বভৌম** ছিলেন তখন স্বাধীন উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন, তিনি ভক্তি মানিতেন না। তাঁহার সহিত অতিবিনীতভাবে শাস্ত্র বিচার করিয়া এবং স্বীয়

অসাধারণ পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করেন। অতঃপর সার্ব্বভৌম সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইলেন। এই ঘটনার পর নীলাচলে মহাপ্রভুর ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। উড়িষ্যারাজ **প্রতাপরুদ্র** পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর **গৌড়ীয় ভক্তগণ** তাঁহাদের প্রাণের প্রাণকে দেখিবার জন্য প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে যাইতেন এবং চারিমাস কাল তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়া বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া আসিতেন।

সন্ন্যাস-লীলার **প্রথম ছয় বৎসর** কাল মহাপ্রভু ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া এবং অবসরকালে নীলাচলে থাকিয়া, স্বীয় আচরণ ও উপদেশাদি দ্বারা প্রেমভক্তি প্রচার করেন। দক্ষিণাঞ্চল ভ্রমণকালে গোদাবরীতীরে তিনি মহাভাগবত **রায় রামানন্দের মুখে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব** প্রচার করিয়া তাঁহাকে নীলাচলে লইয়া আসেন। এই রামানন্দ ছিলেন উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনে বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশের গ্রামে গ্রামে নাম-প্রেম উপদেশ দিয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াই মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। প্রভুর বিচ্ছেদভয়ে ভক্তগণ নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া গমনে বাধা দিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন যাওয়ার আলোচনাদিতে আরও দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। এইরূপে সন্ন্যাসের পর চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরে, ১৪৩৬ শকের বিজয়া দশমীর দিনে মহাপ্রভু **গৌড়ে** জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন। গৌড়দেশে আসিয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে শচীমাতাকে দর্শন দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনপথে রামকেলি গ্রামে যাইয়া তথায় গৌড়রাজ্যের সুচতুর মন্ত্রিদ্বয় **রূপ**

ও **সনাতন** নামে দুই ভাইকে কৃপা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন-পথে বহু সংখ্যক লোক অনুগমন করায় মহাপ্রভু সনাতনের অনুরোধে কানাঞির নাটশালা হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়মানুসারে **জন্মভূমি দর্শন** করিতে নবদ্বীপে যাইয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দর্শন দান করেন। সেবারে আর তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হয় নাই। নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াই মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য আবার ব্যস্ত হইলেন। ভক্তগণের অনুরোধে বর্ষার কয়মাস নীলাচলে থাকিয়া, ১৪৩৭ শকের শরৎকালে তিনি লোকসমাগমভয়ে বনপথ ধরিয়া **শ্রীবৃন্দাবনে গমন** করেন। ফিরিবার পথে মহাপ্রভু প্রয়াগধামে **রূপকে** এবং বারাণসীধামে **সনাতনকে** বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণয়ন ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য উভয়কেই শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। সেই সময়ে অদ্বিতীয় বৈদান্তিক, দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু **শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী** বারাণসীধামে বিরাজ করেন; সুপ্রসিদ্ধ মায়াবাদী এই প্রকাশানন্দ ছিলেন—মহাপ্রভুর ঘোর বিরোধী। মহাপ্রভু তাঁহাকে শাস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, বেদশাস্ত্র তাঁহার ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী নহেন, বরং পক্ষপাতী এবং শ্রীভগবানে প্রেমভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। অতঃপর প্রকাশানন্দ সরস্বতী সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ করেন। এইরূপে সন্ন্যাসের পর ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল।

পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি স্বীয় ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য পণ্ডিত-প্রধান বাসুদেব সার্ব্বভৌম, সন্ন্যাসি-প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বৈষ্ণব-প্রধান অদ্বৈতাচার্য্য, ভূপতি-প্রধান প্রতাপরুদ্র, গৌড়রাজ্যের সুচতুর মন্ত্রিদ্বয় রূপ-সনাতন প্রভৃতি দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকে স্বমতে আনয়ন করেন। এই প্রচারকার্য্যে **নিত্যানন্দপ্রভু** ছিলেন তাঁহার

দক্ষিণহস্তস্বরূপ। বাঙ্গালা দেশে স্বীয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে নিযুক্ত করেন। এইরূপে **সমগ্র** ভারত সঙ্কীর্ত্তন-রোলে মুখরিত ও প্রেমভক্তি প্রবাহে প্লাবিত হইল।

সন্ন্যাসলীলার **শেষ আঠার বৎসর** কাল মহাপ্রভু অবিচ্ছিন্নভাবে নীলাচলে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি **নীলাচল** ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। তন্মধ্যে প্রথম **ছয় বৎসর** কাল তিনি আদেশ উপদেশের দ্বারা এবং স্বীয় আচরণের দ্বারা **শক্তিশালী** ধর্ম্মপ্রচারক সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা অন্যত্র প্রেমভক্তি প্রচার করিতেন এবং ভক্তভাবে ভক্তগণের সহিত নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়া নিজে প্রেম-ভক্তিরস আস্বাদন করিতেন। অবশিষ্ট **দ্বাদশ বৎসর** কাল কৃষ্ণ-বিরহোন্মাদে তাঁহার অপূর্ব্ব **গম্ভীরালীলা।** গম্ভীরালীলায় তিনি রাজ গুরু কাশীমিশ্রের বাটীর একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠমধ্যে রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। তখন তাঁহার অন্তরে নানা ভাবের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইত। এই সময়ে ছিল অদ্ভুত দিব্যোন্মাদ ও অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন। যখন কিঞ্চিৎ বাহ্য-স্ফূর্ত্তি হইত, তখন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু দিনে দিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

(চৈঃ চঃ ২।২।৬৬)

স্বরূপ-দামোদর ছিলেন ব্রজলীলায় ললিতা সখী এবং **রামানন্দ রায়** ছিলেন বিশাখা সখী।

দিন দিন মহাপ্রভুর **দিব্যোন্মাদ** বাড়িতে থাকে। তিনি যখন যাহা দেখিতেন, তাহাতেই তাঁহার মনে বৃন্দাবনলীলার স্ফূর্ত্তি হইত। অভ্যাসমত তিনি স্নান-ভোজনাদি ও শ্রীজগন্নাথদর্শন করিতেন বটে, কিন্তু বৃন্দাবনস্ফূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইত না।

সকল স্থানেই তিনি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল বিলাস দর্শন করিতেন। উদ্যান বা উপবন দেখিলেই শ্রীবৃন্দাবনের নিধুবন-নিকুঞ্জবনের কথা, কোন উচ্চ-ভূমি দেখিলেই গিরি গোবর্দ্ধনের কথা এবং সমুদ্র দেখিলেই যমুনার কথা তাঁহার মনে উদয় হইত। যমুনাভ্রমে একদিন তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

গম্ভীরালীলায় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অনন্ত বৈচিত্র্য আস্বাদন করিয়া জীবকে দেখাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ভক্তের দেহ-মন কিরূপ ভাবে বিচলিত ও বিকারপ্রাপ্ত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা লব। ভিত্তে মুখ-শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥"
"হস্তপদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে। সন্ধি ছাড়ি' ভিন্ন হয়ে, চর্ম রহে স্থানে॥
হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট হয়, কূর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এই মত অদ্ভুতভাব শরীরে প্রকাশ। মনেতে শূন্যতা, বাক্যে হাহা হুতাশ॥
কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

(চৈঃ চঃ ২।২।৪-৬ ও ১১-১৫)

এইরূপে মহাপ্রভু প্রেমভক্তির প্রতি ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের প্রতি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া **৪৮ বৎসর বয়সে** অপ্রকট হন। লোকচক্ষে তিনি অপ্রকট হইলেও—

**"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"**

২। স্মরণীয় ঘটনা ও তাহাদের আনুমানিক সময়—

১৪০৬ শকে মাঘের শেষে শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দাক্ষিণগ্রামে স্বীয় পৈতৃকভবনে মহাপ্রভু মাতৃ-গর্ভে প্রবেশ করেন। গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, পিতা জগন্নাথ মিশ্র ১৪০৭ শকের আষাঢ় মাসে সস্ত্রীক নবদ্বীপে ফিরিয়া আইসেন। ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা-দিনে সন্ধ্যাকালে সুমধুর হরিনাম-সঙ্কীর্তনের ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে মহাপ্রভুর নবদ্বীপধামে আবির্ভাব। সন্ধ্যার পরেই সেদিন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়। পরমভাগবত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় জ্যোতিষের গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, সেদিন ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে শচীমাতার বয়স ৪৪ বৎসর, অগ্রজ বিশ্বরূপের বয়স ১০ বৎসর, নিত্যানন্দপ্রভুর বয়স ১১ বৎসর, অদ্বৈতপ্রভুর বয়স ৫২ বৎসর, হরিদাস ঠাকুরের বয়স ৩৫ বৎসর এবং মুরারিগুপ্তের বয়স ১২ বৎসর হইয়াছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মাত্র ১৫ মাস পরে গদাধর পণ্ডিতের জন্ম হয়।

দ্রষ্টব্য (১)—প্রকটকালের প্রথম ২৪ বৎসর নবদ্বীপধামে মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা এবং শেষ ২৪ বৎসর নীলাচলে তাঁহার সন্ন্যাস-লীলা। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম হইতে সন্ন্যাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—এই ২৪ বৎসরের লীলার নাম **আদিলীলা,** তৎপরবর্তী ৬ বৎসরের অর্থাৎ সন্ন্যাসের প্রথম ৬ বৎসরের লীলার নাম **মধ্যলীলা** এবং সন্ন্যাসের শেষ ১৮ বৎসরের লীলার নাম **অন্ত্যলীলা** বলা হইয়াছে।

(ক) **আদিলীলা**—

(১) পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত **বাল্যকাল**। মহাপ্রভুর বাল্যকালে, ১৪১২ শকের মধ্যে-ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্ন প্রদর্শন, হরিনামে প্রীতি, অন্নপ্রাশন-কালে ভাগবত-পুঁথি আলিঙ্গন, বাল্যচপলতা, অনন্তশয্যা, মৃত্তিকা

ভক্ষণ, তৈর্থিক বিপ্রের প্রতি কৃপা, বিষ্ণু-নৈবেদ্যভোজন, বর্জ্জা হাঁড়ির উপর উপবেশন, মুরারিগুপ্তের প্রতি উপদেশ—এইরূপ বহুবিধ অলৌকিক লীলা প্রকটিত হয়।

(২) ১৪১৩ শকে অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণ,

(৩) ১৪১৬ শকে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া দিনে মহাপ্রভুর উপনয়ন ও ভগবদ্ভাব প্রকাশ,

(৪) ১৪১৮ শকে মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ,

(৫) ১৪২৩ শকে অধ্যাপনা আরম্ভ ও প্রথম বিবাহ,

(৬) ১৪২৪ শকে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন এবং সেই শকের শেষভাগে মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে গমন ও প্রথমা ভার্য্যা শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর স্বধামপ্রাপ্তি,

(৭) ১৪২৫ শকের প্রথমেই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন,

(৮) ১৪২৬ শকে দিগ্বিজয়ী-উদ্ধার,

(৯) ১৪২৭ শকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিবাহ,

(১০) ১৪৩০ শকে আশ্বিন মাসে গয়াযাত্রা,

(১১) ১৪৩০ শকের শেষ পৌষে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন ও অধ্যাপনায় শৈথিল্য,

(১২) ১৪৩০ শকের মাঘ মাসে নবদ্বীপ ধামে ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ,

দ্রষ্টব্য (২)—একবৎসর কাল যাবৎ মহাপ্রভু ভক্তগণসহ **কীর্ত্তনাদি** করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন।

"তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর। রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর॥"

(চৈঃ চঃ ১।১৭।৩০)

"মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্ত্তন। বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১ম)

(১৩) ১৪৩১ শকে বৈশাখমাসে মহাপ্রভুর অধ্যাপনাশেষ,

(১৪) ১৪৩১ শকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পূর্ব্বদিনে (?) নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত মিলন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ম),

(১৫) অতঃপর অদ্বৈতপ্রভুকে আহ্বান, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও হরিদাস ঠাকুরের আগমন, মহাপ্রকাশ, জগাই-মাধাই উদ্ধার, অদ্বৈত-প্রভুর জ্ঞানচর্চ্চা, গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রতি কৃপা, লোকনাথ গোস্বামীর আগমন ও ভূগর্ভ গোস্বামীর সহিত তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে গমন, মহা-সঙ্কীর্ত্তন ও চাঁদকাজী উদ্ধার—এইরূপ নানা লীলাবৈচিত্র্য,

(১৬) ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে নবদ্বীপ-লীলার অবসান।

(খ) **মধ্যলীলা**—

(১) ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে সংক্রান্তি দিনে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ,

দ্রষ্টব্য (৩)—"চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥" (চৈঃ চঃ ২।১।২১)। এই পয়ার হইতে জানা যায় যে, ২৪ বৎসরের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৪৩১ শকে যে মাঘ মাস তাহার শুক্লপক্ষে প্রভুর **সন্ন্যাসগ্রহণ**। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত নামক মুরারিগুপ্তের কড়চা (৩।২।১০) হইতে জানা যায় যে, মাঘ মাসের শুভ সংক্রান্তিদিনে রবি-সংক্রমণ ক্ষণে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ঐ দিনেই সূর্য্যদেব মকর রাশি হইতে কুম্ভ রাশিতে সংক্রমণ করেন। আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২৬শ হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে বলিতেছেন—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ-দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥" প্রামাণিক কড়চার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য পয়ারটীর এইরূপ অর্থ করা হয়—উত্তরায়ণ আরম্ভকালীন মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে আমি অবশ্যই যাইব। মাঘ মাস হইতেই শুভ উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। অতএব অনুমান করা

হয় যে, ১৪৩১ শকে মাঘ মাসের সংক্রান্তিদিনেই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ। তখন শুক্ল পক্ষ ছিল।

শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ২৬শ) হইতে আরও জানা যায় যে, শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বদিনে মহাপ্রভুর কাটোয়ায় আগমন ও সন্ন্যাসের প্রস্তাব এবং কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে নিশাযাপন। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ন্যাসের আয়োজন, অপরাহ্ণে ক্ষৌরকার্য্যাদি সম্পাদন, গঙ্গাস্নান ও সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ। অতঃপর সারারাত্রি গুরুর সহিত নৃত্যাদি এবং তৎপর দিন প্রভাতে বিদায় গ্রহণ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় **জ্যোতিষ গণনা** দ্বারা স্থির করিয়াছেন—১৪৩১ শকের ২৯শে মাঘ শনিবারে মাঘী সংক্রান্তি এবং ঐদিনে প্রায় চারিদণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণিমা ছিল। সে কারণে অনুমান করা হয় যে, ২৮শে মাঘ শেষ রাত্রে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ এবং ২৭শে মাঘ কাটোয়া নগরে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকট আগমন, সন্ন্যাসের প্রস্তাব ও কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে নিশা-যাপন। ২৮শে মাঘ প্রাতঃকাল হইতে সন্ন্যাসের আয়োজন ও অপরাহ্ণে ক্ষৌরকার্য্যাদি সম্পাদন ও অধিবাস এবং ২৯শে মাঘ শনিবার মাঘী সংক্রান্তি দিনে চারিদণ্ডের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ। অতঃপর সমস্তদিন গুরুগৃহে কৃষ্ণ-কথা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি এবং রাত্রিকালে গুরু কেশব ভারতীর সহিত নৃত্যকীর্ত্তনাদি। পরদিন প্রভাতে বিদায় গ্রহণ। এইরূপে প্রামাণিক বাক্যের সমন্বয় করা হইয়াছে।

(২) **১৪৩১ শকের ১লা ফাল্গুন** প্রভাতে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর কাটোয়া নগর পরিত্যাগ, ও তিন দিন তিন রাত্রি রাঢ় দেশে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ। ৪ঠা ফাল্গুন নিত্যানন্দ প্রভুর কৌশলে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আগমন, তথায় শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসিগণের সহিত মিলন, দশদিন তথায় অবস্থান, অতঃপর শচীমাতার অনুমতিক্রমে নীলাচল-যাত্রা।

(৩) ১৪৩১ শকের ফাল্গুনেই মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন, চৈত্র মাসে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা (চৈঃ চঃ ২।৭।৩-৫)।

(৪) ১৪৩২ শকে প্রথম বৈশাখে মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে যাত্রা এবং দুই বৎসর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ। ভ্রমণকালে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়কে আত্মসাৎকরণ ও তাঁহার মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব প্রকাশ, রঙ্গ-ক্ষেত্রে বেঙ্কটভট্টের অষ্টমবর্ষীয় বালকপুত্র গোপালের (ভবিষ্যতে ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট) প্রতি কৃপা, শ্রী-বৈষ্ণবগণের ও মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের মতখণ্ডন, পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ, বিশ্বরূপের সংবাদপ্রাপ্তি এবং দক্ষিণদেশ হইতে ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত —এই দুই গ্রন্থ সংগ্রহ।

(৫) ১৪৩৩ শকে চৈত্রের শেষে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন ও গৌড়ে সংবাদ প্রেরণ,

(৬) অতঃপর পরমানন্দ পুরী, স্বরূপদামোদর, সেবক গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, কাশীশ্বর গোস্বামী, ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণের নীলাচলে আগমন.

(৭) ১৪৩৪ শকে স্নানযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে প্রথম আগমন, এবং চারিমাসকাল পরে তাঁহাদের গৌড়ে প্রত্যাগমন,

(৮) ১৪৩৪ শকে পৌষ মাসে নিত্যানন্দ প্রভুকে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গৌড়দেশে প্রেরণ,

(৯) ১৪৩৬ শকে স্নানযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে দ্বিতীয় আগমন। এই বৎসরেই গৌড়দেশে জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কথা। সেকারণে ভক্তগণ মহাপ্রভুর আদেশে রথযাত্রার পরেই গৌড়ে ফিরিয়া যান।

দ্রষ্টব্য (৪)—গৌড়ীয় **ভক্তগণের নীলাচলে আগমন** সম্বন্ধে জানা যায় যে, তাঁহারা **মোট বিশবার** আসিয়াছিলেন—"বিংশতি বৎসর

ঐছে করে গতাগতি।" (চৈঃ চঃ ২।১।৪৫), অর্থাৎ গৌড়ীয় ভক্তগণ মোট বিশবার নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

সন্ন্যাস-লীলার শেষ আঠার বৎসরের প্রতি বৎসরেই ভক্ত-সমাগম হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমবারেই মহাপ্রভু ভক্তগণকে আদেশ করিয়াছিলেন—"তোমরা প্রতিবৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে।" (চৈঃ চঃ ২।১৫।৪১)। একে ত ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাণের প্রাণকে দেখিবার জন্য সততই উৎকণ্ঠিত থাকেন, তাহাতে আবার প্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিবার জন্য আদেশ পাইলেন। এরূপ অবস্থায়, প্রভু যখন প্রকটকালের শেষ আঠার বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে নীলাচলে ছিলেন, তখন এই আঠার বৎসরের প্রতি বৎসরেই যে তাঁহারা নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না।

মোট বিশবার ভক্ত-সমাগমের মধ্যে **অন্ত্যলীলায়** অর্থাৎ সন্ন্যাসের শেষ আঠার বৎসরে **আঠার বার** ভক্ত-সমাগম হইয়া থাকিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, **মধ্যলীলায়** অর্থাৎ সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসরের (১৪৩২-১৪৩৭ শকের) মধ্যে **মাত্র দুইবার** ভক্ত-সমাগম হইয়াছিল—**১৪৩৪ শকে** অর্থাৎ মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের প্রথম বৎসরেই একবার (চৈঃ চঃ ২।১।৪১) এবং **১৪৩৬ শকে** অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের তৃতীয় বৎসরে একবার (চৈঃ চঃ ২।১৬।১১)।

১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকে মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করেন। সেই দুই বৎসর তিনি নীলাচলে ছিলেন না বলিয়া ভক্ত-সমাগম হয় নাই। ১৪৩৪ শকে গৌড়ীয় ভক্তগণের **প্রথম** আগমন ও চারিমাসকাল অবস্থান। ১৪৩৫ শকে ভক্তগণ **দ্বিতীয়** বার নীলাচলে আসিয়া রথযাত্রার পরেই গৌড়ে ফিরিয়া যান। সেই বৎসরেই মহাপ্রভু গৌড়মণ্ডলে যাইয়া

১৪৩৭ শকের প্রথমেই নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার সময় বলিয়াছিলেন —"এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন।" (চৈঃ চঃ ৩।১৬।২৪৫)। সে কারণে ভক্তগণ ১৪৩৭ শকে নীলাচলে যান নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—১৪৩৫ শকে, রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু নীলাচলে ছিলেন, তবে সে বৎসর ভক্তসমাগম হয় নাই কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সম্ভবতঃ সেই বৎসরেই নীলাচলে গিয়াছিলেন। বিদায়কালে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"আমি এই বৎসর গৌড়দেশে যাইয়া ভক্তগণের সহিত মিলিত হইব, সুতরাং 'ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে'॥" (চৈঃ চঃ ৩।২।৩৯-৪০) ১৪৩৫ শকে শ্রীকান্তের মুখে প্রভুর নিষেধবাক্য শুনিয়া ভক্তগণ সে বৎসর নীলাচলে যান নাই। অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পরে) এই ঘটনা বর্ণিত হইলেও মহাপ্রভুর গৌড়মণ্ডলে গমন করিবার পূর্ব্বেই এইরূপ কথা বলা তাঁহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। মধ্যলীলায়, সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরে (১৪৩৬ শকে) গৌড়মণ্ডল দর্শন করিয়া পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্ত্যলীলায় তিনি যে আবার গৌড়মণ্ডলে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ যুক্তির অনুকূলে বলা যায় যে, অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরে ছয় বারই ভক্তসমাগম হইয়াছিল—এক বৎসরও বাদ যায় নাই। [দ্রষ্টব্য (৭) দেখ]। আর অবশিষ্ট বার বৎসর কাল মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলা—সে সময়ে তাঁহার পক্ষে ভক্তগণকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিবার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না।

(১০) ১৪৩৬ শকে বিজয়া দশমী দিনে মহাপ্রভুর **গৌড়মণ্ডলে যাত্রা**। গৌড়ে আসিয়া পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে, কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে, কাঞ্চনপল্লী গ্রামে শিবানন্দ সেনের ও

বাসুদেব দত্তের গৃহে, বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এবং কুলিয়া গ্রামে বংশীবদন ঠাকুরের পিতা মাধবদাসের গৃহে মহাপ্রভুর শুভাগমন। কুলিয়া গ্রামে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন, শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে শচীমাতা ও ভক্তগণের সহিত মিলন, এবং শচীমাতার অনুমতি লইয়া মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা। বৃন্দাবন-পথে অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষকে পরিত্যাগ, রামকেলি গ্রামে রাজমন্ত্রিদ্বয় রূপ ও সনাতনের সহিত মিলন এবং সনাতনের অনুরোধে বৃন্দাবনগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক কানাই্রর নাটশালা হইয়া শান্তিপুরে প্রত্যাগমন। ফিরিবার পথে মকর সংক্রান্তি দিনে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভাগমন এবং অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা। শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে অবস্থানকালে সপ্তগ্রাম মুলুকের একমাত্র উত্তরাধিকারী ষোড়শবর্ষীয় বালক **রঘুনাথের** (ভবিষ্যতে ছয় গোস্বামীর অন্যতম দাস রঘুনাথ) মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ। উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার পিতামাতার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভু অম্বিকাকালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শুভাগমন করিয়া তাঁহাকে নিতাই-গৌর-বিগ্রহ সেবা করিতে আদেশ করেন।

কথিত আছে, সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়মানুসারে জন্মভূমি ও পিতৃগৃহ দর্শন করিবার জন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপধামে গমন করেন। গৃহদ্বারে পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীহস্তে নিজ কাষ্ঠপাদুকা অর্পণ করিয়া তাঁহাকে নিজ মূর্তি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। মুরারির কড়চা (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং ৪।১৪।৮) হইতে জানা যায়—**প্রকাশ রূপে** প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকটে আসিয়া ছিলেন এবং নিজ মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া তাহাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রভুর সাক্ষাৎ সেবা করিতে লাগিলেন। অনেকের মতে, মহাপ্রভুর জন্মভিটায় তাঁহার

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবিগ্রহ-পূজা আরম্ভ করেন। প্রায় সেই সময়েই অম্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক নিতাই-গৌর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্রষ্টব্য (৫)—রামকেলিগ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া **রূপ ও সনাতন** দুই ভাই তাঁহার সঙ্গ লাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সংসার ত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। উভয়ের এক সঙ্গে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে, তাই কনিষ্ঠ রূপ একজন বিশ্বস্ত মুদির নিকটে দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য দেশে চলিয়া গেলেন মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন—বিশ্বস্ত লোকের মুখে এই সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপ স্বীয় কনিষ্ঠভ্রাতা অনুপমের সহিত শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। এদিকে সনাতন রাজকার্য্য পরিচালন না করাতে যবনরাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অতঃপর সনাতন গচ্ছিত অর্থের সাহায্যে কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করিয়া কারামুক্ত হন এবং প্রভু দর্শনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন।

(১১) ১৪৩৭ শকের প্রথম বৈশাখে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন।

(১২) ১৪৩৭ শকের শরৎকালে বিজয়াদশমী দিনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা।

(১৩) বৃন্দাবন পথে কাশীধামে তপনমিশ্রের সহিত মিলন এবং তাঁহার দশবৎসরের বালকপুত্র রঘুনাথের (ভবিষ্যতে ছয় গোস্বামীর অন্যতম ভট্ট রঘুনাথ) প্রতি কৃপা। অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন।

(১৪) শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে মকর সংক্রান্তির পূর্ব্বেই প্রয়াগে আগমন এবং রূপ গোস্বামীর সহিত মিলন। এই সময়ে মহাপ্রভু বল্লভভট্টের সহিত মিলিত হন। ১০ দিন শিক্ষাদানের পর মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন এবং মকরে স্নান করিয়া তিনি কাশীধামে গমন করেন।

(১৫) কাশীধামে সনাতনের সহিত মিলন, দুইমাস যাবৎ তাঁহাকে শিক্ষাদান ও শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ। এই সময়ে দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু প্রসিদ্ধ মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, তাঁহাকে ভক্তিমার্গে আনয়ন ও শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ।

দ্রষ্টব্য (৬)—মহাপ্রভুর আদেশে রূপগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। একমাস পরে, তিনি জ্যেষ্ঠ সনাতনের অনুসন্ধানে গৌড়দেশে গমন করেন, পথিমধ্যে কনিষ্ঠ অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। এই অনুপম ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীবের পিতা। অতঃপর রূপগোস্বামী মহাপ্রভু দর্শনে নীলাচলে গমন করেন। এদিকে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শুনিলেন যে রূপ ও অনুপম তাঁহারই সন্ধানে দেশে গিয়াছেন। তখন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া ঝারিখণ্ডের বনপথে নীলাচল যাত্রা করেন। বনপথের বিষাক্ত জল পানে তাঁহার গাত্রে কণ্ডু রোগ হয়।

(১৬) ১৪৩৭ শকের শেষ ভাগে অথবা ১৪৩৮ শকের প্রথমেই মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন।

(গ) **অন্ত্যলীলা,—**

দ্রষ্টব্য (৭)—পূর্ববর্ণনা হইতে জানা যায় যে অন্ত্যলীলার অর্থাৎ সন্ন্যাসলীলার শেষ আঠার বৎসরের প্রতি বৎসরেই গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে ছয়বারই ভক্ত সমাগম হইয়াছিল (অন্ত্যলীলার ১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১০ম ও ১২শ পরিচ্ছেদ দেখ)। **প্রথম বৎসরে** অর্থাৎ ১৪৩৮ শকে রূপগোস্বামী, **দ্বিতীয় বৎসরে** সনাতন গোস্বামী, **তৃতীয় বৎসরে** রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং **চতুর্থ বৎসরে** বল্লভভট্ট নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়াই জগন্নাথদেবের জলক্রীড়া দর্শন করেন এবং **ষষ্ঠ বৎসরে** ভক্তগণের সহিত তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি আসিয়াছিলেন।

(১) ১৪৩৮ শকে, অন্ত্যলীলার প্রথম বৎসরে, গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন (চৈঃ চঃ ৩।১।৯)। সেই সময়ে রূপ গোস্বামীর নীলাচলে আগমন (চৈঃ চঃ ৩।১।৪০), দশমাস কাল তাঁহার অবস্থান (চৈঃ চঃ ৩।৪।২৫) এবং গৌড়দেশ হইয়া পুনরায় তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে গমন (চৈঃ চঃ ৩।১।১৬৫)। রূপগোস্বামী তখন শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক একখানি নাটক রচনা করিতেছিলেন। সত্যভামাদেবীর স্বপ্নাদেশে এবং মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশে ব্রজ-লীলা ও পুর-লীলা পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিয়া নাটক দুইখানির নাম 'বিদগ্ধমাধব', ও 'ললিতমাধব' এইরূপ রাখা হয়। মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছিলেন—"কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাঁতে॥" (চৈঃ চঃ ৩।১।৬১)। রূপ গোস্বামীর নীলাচলত্যাগের ১০ দিন পরে সনাতন গোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ ৩।৪।২৫)।

(২) ১৪৩৯ শকের প্রথম বৈশাখে সনাতন গোস্বামীর নীলাচলে আগমন (চৈঃ চঃ ৩।৪।২), এবং জ্যৈষ্ঠমাসে মর্য্যাদারক্ষণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু-কর্তৃক তাঁহার পরীক্ষা (চৈঃ চঃ ৩।৪।১১০)। আষাঢ় মাসে গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন (চৈঃ চঃ ৩।৪।১০০)। মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে সনাতনের কণ্ডুরোগ দূর হইয়া দেহ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইল (চৈঃ চঃ ৩।৪।১৯২)। এক বৎসর কাল সনাতনের নীলাচলে অবস্থান, অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনে গমন (চৈঃ চঃ ৩।৪।১৯১)। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে রূপ-গোস্বামী বৃন্দাবনযাত্রা করিলেও, বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিতে গৌড়দেশে তাঁহার এক বৎসর বিলম্ব হয় (চৈঃ চঃ ৩।৪।২০৫), সে কারণে

তিনি সনাতন গোস্বামীর পরে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হন।

(৩) ১৪৭০ শকে রঘুনাথদাস গোস্বামীর ও গৌড়ীয়ভক্তগণের আগমন (চৈঃ চঃ ৩।৬।২৩৯)।

দ্রষ্টব্য (৮)—অনুমান ১৪২০ শকে **রঘুনাথদাস গোস্বামীর** জন্ম, ১৪৩৬ শকে শান্তিপুরে মহাপ্রভু-দর্শন। ১৪৩৮ শকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে মহাপ্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকটে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা (চৈঃ চঃ ৩।৬।১৫) এবং বিষয়-কর্ম্মের গোলমাল চুকাইতে এক বৎসর বিলম্ব (চৈঃ চঃ ৩।৬।৩৪)। ১৪৩৯ শক হইতে নীলাচলে পলাইয়া যাইবার সঙ্কল্প। পিতামাতার অনুমতি লইয়া জ্যৈষ্ঠমাসে নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপালাভের আশায় পানিহাটীগ্রামে তাঁহার গমন, নিতাই-চাঁদের দণ্ডাদেশে তথায় চিড়া-মহোৎসব। গৃহে ফিরিয়া গিয়া নীলাচলে পলাইয়া যাইবার জন্য বারবার চেষ্টা ও ধরা পড়া। ১৪৪০ শকে রঘুনাথ ধরা পড়িবার ভয়ে নীলাচলযাত্রী গৌড়ীয়ভক্তগণের সঙ্গ লইতে সাহস করিলেন না। অতঃপর সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন এবং ১২ দিনে নীলাচলে গমন (চৈঃ চঃ ৩।৬।১৮৬)।

(৪) ১৪৪১ শকে গৌড়ীয়ভক্তগণের ও বল্লভভট্টের নীলাচলে আগমন (চৈঃ চঃ ৩।৭।২-৩)।

(৫) ১৪৪২ শকে নরেন্দ্রসরোবরে জগন্নাথদেবের জল-লীলা দিনে গৌড়ীয়ভক্তগণের নীলাচলে আগমন (চৈঃ চঃ ৩।১০।৩৯)।

(৬) ১৪৪৩ শকে গৌড়ীয়ভক্তগণের নীলাচলে আগমন (চৈঃ চঃ ৩।১২।৪০)। হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ।

দ্রষ্টব্য (৯)—১৪৪৩ শকে গৌড়ীয়ভক্তগণের সহিত তাঁহাদের গৃহিণীগণ আসিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তিন পুত্রসহ শিবানন্দ সেনের গৃহিণীও আসিলেন। তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস, যিনি ভবিষ্যতে **কবিকর্ণপূর** নামে বিখ্যাত হন। নীলাচলেই শিবানন্দ-পত্নীর

গর্ভসঞ্চার হয় (চৈঃ চঃ ৩।১২।৪৫-৪৯) এবং গৌড়ে ফিরিয়া যাওয়ার পরে শিশুর জন্ম হয়। নবজাত শিশুকে মহাপ্রভুর চরণ-সমীপে যতশীঘ্র সম্ভব লইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই অনুমান করা যায় যে ১৪৪১ শকে গর্ভসঞ্চার, ১৪৪২ শকের প্রথমেই শিশুর জন্মগ্রহণ এবং ১৪৪৩ শকে আষাঢ় মাসে শিশুকে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে লইয়া যাওয়া হয়। পরে এই শিশুর বয়স যখন সাত বৎসর হইল, তখন শিবানন্দ নিজ পত্নী সহিত তাঁহাকে নীলাচলে আনিয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠস্পর্শে সপ্তমবর্ষীয় বালকের মুখে একটী নূতন সংস্কৃত শ্লোক স্ফুরিত হইয়াছিল (চৈঃ চঃ ৩।১৬।৬৯)।

দ্রষ্টব্য (১০)—সম্ভবতঃ ১৪৪৩ শকেই কাশীবাসী তপনমিশ্রের পুত্র **রঘুনাথ ভট্টের** নীলাচলে আগমন এবং আটমাস কাল পরে তাঁহার কাশীধামে প্রত্যাগমন। চারি বৎসর পরে তাঁহার পিতামাতা কাশীপ্রাপ্ত হইলে নীলাচলে তাঁহার পুনরাগমন এবং আটমাস কাল পরে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে গমন। বিদায়কালে মহাপ্রভু তাঁহাকে ১৪ হাত লম্বা তুলসীর মালা ও ছুটা নামক পানের খিলি দিয়া কৃপা করেন।

(৭) এইরূপে অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময়কার অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে, ভগবানাচার্য্যের ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্যের নীলাচলে আগমন, প্রকৃতি-সম্ভাষণ-অপরাধে ছোট হরিদাস-বর্জ্জন, দামোদর পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড ও প্রভুর আদেশে তাঁহার নদীয়া গমন, প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণকথাশ্রবণ, রামচন্দ্রপুরীর নীলাচলে আগমন, রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেমাভিমান প্রভৃতি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

(৮) অবশিষ্ট দ্বাদশ বর্ষকাল (শক ১৪৪৩-৫৫) প্রভুর অদ্ভুতপূর্ব্ব গম্ভীরালীলা।

৩। তাৎকালীন নবদ্বীপ,—

প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই এখন গঙ্গাগর্ভে লুক্কায়িত। তাহার উত্তরাংশ গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভগ্ন হইতে থাকিলে, তত্রতা অধিবাসিগণ ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে সরিয়া আসিয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরাংশ প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গঙ্গা-প্রবাহের পরিবর্ত্তন হেতু এইরূপ বিপর্যায় ঘটিয়াছে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে, চতুর্যোজন ব্যাপী প্রাচীন নবদ্বীপ বহুজন-পূর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। গঙ্গার এক এক ঘাটে তখন শত শত লোক স্নানাদি করিত। প্রাচীন নবদ্বীপে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও শাস্ত্রচর্চ্চা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁতি, গোয়ালা, মালাকর, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণেতর জাতিও তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র এবং বিদ্যালোচনার পীঠস্থানস্বরূপ ছিল। নবদ্বীপ তখন উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের নানাস্থান হইতে ছাত্র সম্প্রদায় দলে দলে আসিয়া তথায় বিদ্যাশিক্ষা করিত। নবদ্বীপে তখন গলিতে গলিতে টোল। টোলগুলি দেশ বিদেশের ছাত্রে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে সকলকে মিথিলার শরণ গ্রহণ করিতে হইত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় পণ্ডিত **বাসুদেব সার্ব্বভৌম** মিথিলা হইতে ন্যায়ের একখানি সুপ্রসিদ্ধগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রচলন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রধান শিষ্য কুশাগ্রবুদ্ধি **রঘুনাথ শিরোমণি** বিদ্যার্থীরূপে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক তথাকার পণ্ডিত-প্রধান

পক্ষধর মিশ্রকে তর্কে পরাজিত করিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন এবং ন্যায় বিষয়েও নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করেন। সেই সময়ে, স্মার্ত্ত চূড়ামণি **রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য** ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিসমুদয় নিরূপণ করিয়া এবং তদনুসারী স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া নবদ্বীপের গৌরব বৃদ্ধি করেন। সেই সময়ে, 'তন্ত্রসার'-প্রণেতা সাধক-চূড়ামণি **কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ** নবদ্বীপ ধামকে অলঙ্কৃত করেন। নবদ্বীপ তখন কেবল বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চ্চা লইয়াই উন্মত্ত থাকিত; ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষতঃ ভাগবত ধর্ম্মের প্রতি, তাহার তাদৃশ আস্থা দেখা যাইত না। তার্কিক পণ্ডিতগণের তর্কযুদ্ধে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

৪। তাৎকালীন দেশের অবস্থা—

সেন রাজগণের রাজত্বকালে নবদ্বীপই বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বাঙ্গালায় হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটে, তখন বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপ হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়। বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষে কখন কখন হিন্দুরাজা দেখা যাইত বটে, কিন্তু মুসলমানই ছিল দেশের প্রকৃত রাজা। মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালে, হিন্দু রাজা সুবুদ্ধি রায়ের একজন পাঠান কর্ম্মচারী গৌড়রাজ আলাউদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া **হুসেন সাহ** নামে গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন **সাকর মল্লিক** (ভবিষ্যতে ছয় গোস্বামীর অন্যতম সনাতন গোস্বামী) এবং সহকারী মন্ত্রী ছিলেন **দবীর খাস** (ভবিষ্যতে ছয় গোস্বামীর অন্যতম রূপগোস্বামী)। সেই সময়ে উড়িষ্যায় স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব চলিতেছিল। উড়িষ্যারাজ গজপতি **প্রতাপ রুদ্রের** দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মুসলমানগণ তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইত না। চারিদিকেই তখন অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করিত এবং সীমান্তে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লাগিয়াই থাকিত।

গৌড়রাজ হুসেন সাহের প্রতিনিধিস্বরূপ এক একজন কাজি সৈন্যসামন্তে পরিবেষ্টিত থাকিয়া স্থানে স্থানে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তখন চাঁদকাজি ছিলেন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা। কাজির প্রধান কার্য্য ছিল—বিচার করা এবং ইসলামধর্ম্ম প্রচার করা।

কাজির অধীনে হিন্দু জমিদারগণ রাজকর আদায় করিতেন এবং কাজির অনুমতিক্রমে কখন কখন রাজ্য-শাসনও করিতেন। জমিদার-গণের অধিকাংশই ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। তাঁহারা সকলেই কার্য্যদক্ষ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং সাধারণতঃ রাজা নামে অভিহিত হইতেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খাঁ, সপ্তগ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামে দুই ভাই, রাজসাহী জেলার খেতুরীগ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত, বর্দ্ধমানের নিকটে কুলীনগ্রামে গুণরাজ খাঁর পুত্র সত্যরাজ খাঁ (লক্ষ্মীনাথ বসু), বড়গাছিগ্রামে রাজা হরি হোড়ের পুত্র কৃষ্ণদাস হোড় প্রভৃতি জমিদারগণের নাম পাওয়া যায়। সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাস ছিলেন ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা এবং খেতুরীর রাজা কৃষ্ণানন্দ ছিলেন নরোত্তমদাস ঠাকুরের পিতা।

হিন্দু জমিদারগণের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁহাদিগকে ভূমিদান ও অর্থদান করিয়া পোষণ করিতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ নিশ্চিন্তমনে বিদ্যাচর্চ্চা ও শাস্ত্রানুশীলন করিবার যথেষ্ট অবসর পাইতেন। গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আর পরমুখাপেক্ষী হইতে হইত না।

৫। তাৎকালীন ধর্ম্মভাব—

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে, তাহার অতুল প্রভাবে হিন্দুর বৈদিক ধর্ম্ম ও পূজা দিন দিন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। কালপ্রভাবে সেই বৌদ্ধধর্ম্মও ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া সুরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতির দ্বারা

সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিতে লাগিল। তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া তান্ত্রিকগণও ক্রমে ক্রমে আচারভ্রষ্ট হইয়া অধর্ম্মের ও কদাচারের স্রোত সমাজে প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। শঙ্করাচার্য্যের দুর্ব্বোধ্য বেদান্তধর্ম্ম কোনও কালেই জনসাধারণের মন-প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। এইরূপে জাতীয় ধর্ম্ম-জীবন দিন দিন দুর্ব্বল ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল। তৎকালে রচিত শীতলা, মনসা, সত্যপীর প্রভৃতি বিবিধ দেবদেবীর গান, পাঁচালি, ছড়া প্রভৃতি লইয়াই জনসাধারণ তখন সন্তুষ্ট থাকিতেন। বৈষ্ণব-সুলভ প্রেমভক্তিরসের সুবিমল স্রোত তখনও জনসমাজে প্রবাহিত হয় নাই।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তদীয় লীলার সহায়তা করিবার নিমিত্ত শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভু, রাঢ়দেশে একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীহট্টে মুরারিগুপ্ত, চন্দ্রশেখরাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি, বুঢ়নে হরিদাস ঠাকুর, বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে মুকুন্দ দাস ও নরহরি সরকার ঠাকুর, চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও বাসুদেব দত্ত এবং নদীয়ায় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, গঙ্গাধর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণের সংখ্যা তখন অতি অল্পই ছিল, এবং তাঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন কমলাক্ষ মিশ্র (অদ্বৈতাচার্য্য নামে পরিচিত) নামে একজন বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও কর্ম্মের উজ্জ্বল মূর্ত্তি। শান্তিপুরেই তাঁহার নিবাস, নবদ্বীপেও তাঁহার একখানি বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে অদ্বৈতসভা নামে একটী সভা ছিল, তথায় বৈষ্ণব-গণ মিলিত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভাগবত-ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন।

তখনকার জনসাধারণ ঐহিক সুখকেই সংসারের সার ভাবিয়া কেবল বিষয়সুখে ও ইন্দ্রিয়-সেবায় ব্যস্ত থাকিত। সাধুবৈষ্ণবগণ পথে ঘাটে অপদস্থ ও লাঞ্ছিতই হইতেন। কেহ হরিনাম করিলে পাষণ্ডীগণ

তাঁহাকে উপহাস, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিত। দেশের এইরূপ দুরবস্থা ও ধর্ম্মবিপ্লব দেখিয়া এবং কলিহত জীবের উদ্ধারের আর কোনও উপায় না পাইয়া, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন —প্রেমভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে ধরায় অবতীর্ণ করাইবেন। ধর্ম্মের এইরূপ মহাসঙ্কটকালে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য শ্রীভগবানের লীলাগ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কথিত আছে, অদ্বৈতপ্রভুর সপ্রেম হুঙ্কারে ও কাতর প্রার্থনায় আকৃষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইলেন। তাই অদ্বৈতাচার্য্যকে **গৌরআনা গোসাঞি** বলা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাগবৎ-তত্ত্ব

১। শ্রীভগবানের লীলাগ্রহণ—

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা ৪।৭-৮)—অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, আমি সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যুগে যুগে তিনি স্বীয় বাক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান কলিযুগেও তিনি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম এবং প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া দেশ, জাতি ও সমাজকে রক্ষা করিলেন।

বৈষ্ণব মহাজনগণ বলেন—বর্ত্তমান কলিযুগের এই গৌরাঙ্গ-অবতার যুগাবতার নহেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্য সর্ব্ব অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের প্রয়োজন হয় না, তাঁহার অংশভূত যুগাবতারের দ্বারাই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। গৌর-অবতারে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের অন্তরঙ্গ বা মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, প্রকট ব্রজলীলায় অপূর্ণ তিন বাসনা পূরণ (শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব দেখ) এবং সেইভাবে জগতে প্রেমভক্তির প্রচার। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥" (চৈঃ চঃ ১।৩।২০)। প্রতি কলিযুগেই যুগাবতার অবতীর্ণ হয়েন, কিন্তু তাঁহার দ্বারা ব্রজপ্রেম প্রচার হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না।

ব্রজের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের সময়ও হইয়াছিল। তাই গৌর-অবতারে তিনি মুখ্যভাবে অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সাধন করিলেন এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে যুগাবতারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেন। যিনি সর্ব্ব অবতারের অবতারী, যিনি নিত্য পূর্ণপুরুষ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বাংশ লইয়াই তাঁহার অবতরণ হয়। সে কারণে তাঁহার অবতরণকালে অন্যান্য সমস্ত অবতারই তাঁহার অঙ্গে আসিয়া মিলিত হয়েন। যুগাবতারও তাঁহার অঙ্গান্তর্ভূত থাকায় যুগাবতারের কার্য্য তাঁহাতেই প্রকাশ পাইল।

কৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণ নিজাঙ্গান্তর্ভূত বিষ্ণুদ্বারাই অসুরসংহার ও জগৎ পালন করেন। "বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।" (চৈঃ চঃ ১।৪।১২)। অসুর-সংহার প্রভৃতি যেমন কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনও তেমনি গৌরাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অঙ্গান্তর্ভূত যুগাবতারই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণরূপে একবার এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে একবার, কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে অলাতচক্রের ন্যায় ধারাবাহিকরূপে অবতরণ করিয়া প্রকটলীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা নিত্য—কোন কালেই ইহার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নাই। "ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥" (চৈঃ চঃ ১।৩ ৪)। ব্রহ্মার একদিনকে **কল্প** বলে। প্রতিকল্পে মনু নামে খ্যাত ব্রহ্মার ১৪ জন পুত্র প্রজাপতি বা সৃষ্টির অধিপতি হইয়া ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালকে **মন্বন্তর** বলা হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে এক **দিব্যযুগ**। ৭১ চতুর্যুগে বা দিব্য-যুগে এক মন্বন্তর এবং ১৪ মন্বন্তরে এক কল্প বা ব্রহ্মার একদিন। মতান্তরে সহস্র দিব্যযুগে এককল্প। বর্ত্তমানে ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়া সপ্তম মন্বন্তর অর্থাৎ সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল চলিতেছে। এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরযুগের শেষ-ভাগে শ্রীকৃষ্ণ ধরায় অবতীর্ণ হইয়া প্রেমলীলা করিয়া থাকেন। সেই দ্বাপরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে তিনিই আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন। সুতরাং ব্রজলীলা ও গৌরলীলা একই লীলাপ্রবাহের দুইটী অংশ মাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েই ব্রহ্মার একদিনে মাত্র একবার করিয়া ধরায় আবির্ভূত হয়েন।

২। ব্রহ্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব—

শ্রুতি বা বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। বেদ যাহা বলেন তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অস্থি বা বিষ্ঠা সাধারণতঃ অপবিত্র হইলেও শঙ্খরূপ অস্থিকে এবং গোময়রূপ বিষ্ঠাকে বেদশাস্ত্র পবিত্র বলিয়াছেন, সে কারণে

শঙ্খ ও গোময় মহাপবিত্ররূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বিনা আপত্তিতে বেদ-বাক্য গ্রহণ করিতে হইবে। বেদের সহিত যাহার বিরোধ হইবে, তাহা শ্রদ্ধেয় বা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

জ্ঞান ভাণ্ডার বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের নাম উপনিষদ্। যিনি সকলের মূল বা আশ্রয়, যিনি নিখিল কারণেরও পরম কারণ, উপনিষদে তাঁহাকেই **ব্রহ্ম** নামে অভিহিত করা হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দে সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তুকেই বুঝায়। বৃংহতি 'বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম'—অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং যিনি অন্যকেও বৃহৎ করেন তিনিই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্মের বৃহৎ করিবার শক্তি আছে। বেদও এই অর্থের সমর্থন করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।৮) বলেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে," অর্থাৎ ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মের শক্তি আছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের 'বৃংহয়তি'-অংশ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বা অব্যক্ত শক্তিক বলিয়াছেন। ব্রহ্মের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি সেই শক্তির ক্রিয়া বা বিলাস না থাকে, তবে ব্রহ্মকে পূর্ণ বলা যায় না। পদ্ম পুরাণের উত্তর খণ্ড হইতে জানা যায় যে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য সৃষ্টি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জীবকে ভগবদ্বিমুখ করিবার জন্য ভক্তিবিরোধী মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং বেদের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ দ্বারা সাকার, সবিশেষ ও সশক্তিক ব্রহ্মকে নিরাকার, নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিক রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৩।১৯) আরও বলেন—"অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মের হস্ত, পদ, চক্ষু বা কর্ণ না থাকিলেও তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, দেখেন ও শুনেন। যখন গ্রহণ চলনাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে তখন ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়ও আছে;

সুতরাং ব্রহ্ম হইলেন ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সবিশেষ বা সাকার বস্তু। ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্তপদাদি না থাকায় তাঁহাকে হস্তপদাদি শূন্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের হস্ত পদাদি অপ্রাকৃত বা চিন্ময় এবং তিনি সাকার।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (৩।১) বলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎব্রহ্ম।" ব্রহ্ম হইতে ভূত বা জীব সকল জন্মায় বলিয়া জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম অপাদান কারক, ব্রহ্মদ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মই অন্তর্যামীরূপে জীবের অন্তরে বাস করায় জীব সকল জীবিত থাকে বলিয়া জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম করণ কারক এবং ব্রহ্মেই জীব সমূহ লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম অধিকরণ কারক। সবিশেষ বস্তুতেই অপাদানাদি তিন কারক দৃষ্ট হয় বলিয়া এই তিন কারকই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের প্রমাণ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে থাকিলে, এ সমস্ত কার্য্য তিনি করিবেন কিরূপে? সুতরাং ব্রহ্ম নির্বিশেষ বা নিরাকার নহেন, তিনি সবিশেষ ও সাকার।

সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে জানা যায় যে প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ছিলেন। তখন—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (তৈঃ উঃ)—সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের বহু হইয়া লীলা করিবার সঙ্কল্প হইল। সঙ্কল্প বা ইচ্ছা মনের একটী কার্য্য, সুতরাং প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন প্রাকৃত মনের সৃষ্টি হয় নাই, তখনও ব্রহ্মের মন ছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরও জানা যায়—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (ছান্দোগ্য উঃ) অর্থাৎ সৃষ্টি সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্ম **প্রকৃতির** প্রতি ঈক্ষণ বা দর্শন করিলেন এবং সেই **ঈক্ষণ** দ্বারা প্রকৃতিতে সৃষ্টি শক্তি সঞ্চারিত হইলে, জড়া প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম যখন ঈক্ষণ করিলেন, তখনও তাঁহার চক্ষু ছিল। প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের মন ও চক্ষু উভয়ই থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার মন ও চক্ষু উভয়ই

অপ্রাকৃত বা চিন্ময়। সুতরাং ব্রহ্ম অপ্রাকৃত সাকার বস্তু। বেদ যেখানে ব্রহ্মকে নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার প্রাকৃত আকার বা গুণ নাই, তাঁহার আকার ও গুণ সমস্তই অপ্রাকৃত বা চিন্ময়।

সমগ্র সৃষ্টির পশ্চাতে যে শক্তিমান্ পুরুষ আত্মগোপন করিয়া আছেন, সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব উপনিষদসমূহে নিরূপিত হইয়াছে। বেদের অন্তে স্থাপিত বলিয়া উপনিষদকে **বেদান্ত** বলা হয়। ব্যাসদেব সেই বেদান্তের বাণী বেদান্ত-সূত্রে বা ব্রহ্মসূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্রের নিগূঢ় অর্থ সাধারণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া তিনিই আবার পুরাণাদিতে সূত্রের মর্ম প্রকাশ করেন। সকল পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। নিখিল বেদের তাৎপর্য্য যাহা বেদান্তসূত্রে নিহিত আছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। স্বয়ং ব্যাসদেব **শ্রীমদ্ভাগবতকেই** সকল বেদান্তের সার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (ভাঃ ১২।১৩।১৫ দেখ)। সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রদায়ক বেদরূপ কল্পতরুর ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—**"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"** অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অনন্যাপেক্ষ বা স্বয়ংসিদ্ধ তিনি সকলেরই মূল। বেদের ব্রহ্ম বলিতে চিদানন্দময় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীগীতায় (১৪।২৭) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা পরম আশ্রয়—ঘনীভূত ব্রহ্মই তিনি। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব॥" (চৈঃ চঃ ১।২।৫)। সকলের মূল তত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ববিষয়ে একমাত্র তিনিই পূর্ণ অর্থাৎ কোনও বিষয়ে তিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য নিজ স্বরূপশক্তিরই বৈচিত্র্য বা প্রকাশ-বিশেষ। তিনি সর্ব্বশক্তির মূলাধার,

তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বাশ্রয়। যেখানে যাহা কিছু আছে, যেখানে যাহা কিছু অনুভূত হইতেছে, সে সমস্তেরই মূল তিনি। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (শ্বে: উঃ ৬।১৪)। তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন, তাঁহারই জ্যোতিতে চন্দ্রসূর্য্যাদি যাবতীয় পদার্থ জ্যোতিষ্মান্। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বরাট্ বা স্বপ্রকাশ পুরুষ, নিজ প্রভাবেই তিনি প্রকাশমান। তাঁহার সমান বা প্রধান কেহ নাই।

* **ব্রহ্মসংহিতা** বলেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" চিদ্ঘনানন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে পূর্ণতমস্বরূপে বিরাজিত।• সকল বস্তুর, সকল কার্য্যের ও সকল সম্বন্ধের মূলে একমাত্র তিনিই আছেন। তিনি স্বয়ং অনাদি অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই, কিন্তু তিনি সকলেরই আদি, সকলেরই মূল এবং সকল কারণেরই একমাত্র কারণ। • তিনি সমস্ত ঈশ্বরত্বের মূল, তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তিনি পরম-ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। তিনি সৎ বা নিত্য সকল সময়েই তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত।• তিনি চিদানন্দঘন স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াও ভাতিত্বে তিনি অন্যের বুঝিবার যোগ্য হয়েন, আবার আনন্দঘন থাকিয়াও তিনি সকলকে আনন্দিত করেন এবং নিজেও আনন্দলাভ করেন।• অস্তিত্বে তিনি **সৎ**—যাহার কখনও নিবৃত্তি হয় না, ভাতিত্বে তিনি **চিৎ**—যাঁহার প্রকাশ কখনও বিলুপ্ত হয় না, আবার প্রিয়ত্বে তিনি **আনন্দ** স্বরূপ—সকল সময়েই যিনি পরম প্রীতির বিষয়।•

• "ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্ব-কারণ-প্রধান॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ সবার আধার॥

সচ্চিদানন্দতনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ॥” (চৈঃ চঃ ২।৮।১০৬-৮)। কবিরাজ গোস্বামীর এই সংক্ষিপ্ত উক্তি **শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সার**। বেদের ব্রহ্ম হইলেন দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সমস্ত শক্তির, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সমস্ত মাধুর্য্যের মূল আধার। সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই মূল তত্ত্ববস্তু। তিনি সর্ব্ব অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান, তিনিই সর্ব্ব কারণের মূল কারণ। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সকল অবতারের আবির্ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল—তাঁহার ভগবত্তা হইতেই অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা। অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে রসমাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ। তিনি প্রেমময়, রসময় ও আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রেমের ও আনন্দের অনন্ত ধারা অনাদিকাল হইতে উৎসারিত হইতেছে। তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নাম “কৃষ্ণ।” তাঁহার অসমোর্দ্ধ রস-মাধুর্য্য এমনই চিত্তাকর্ষক যে তাহা দেখিয়া শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মুগ্ধ হইয়া যান।

যাহা অদ্বয় বা দ্বিতীয়শূন্য, যাহা জ্ঞান বা কেবল মাত্র চিৎ (অপ্রাকৃত), যাঁহাতে অচিৎ বা জড়ের চিহ্নমাত্রও নাই, তাহাই **অদ্বয় জ্ঞান**। যাহা অদ্বয় জ্ঞান বা অখণ্ড চৈতন্য বস্তু তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ **তত্ত্ব** বা পরম পুরুষার্থ বস্তু বলেন। “অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।”, অর্থাৎ ব্রজে যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই অদ্বয়জ্ঞান-রূপতত্ত্ব। সচ্চিদানন্দতনু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোনও বস্তু নাই; সৃষ্টির পূর্ব্বে শুধু তিনিই ছিলেন, তিনিই এই সৃষ্ট জগৎ, সৃষ্টির অবসানে বা প্রলয়ে তিনিই শুধু থাকিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১) হইতে জানা যায় যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই প্রকাশ-বিশেষে **ব্রহ্ম-পরমাত্মা ও ভগবান** এই তিন নামে অভিহিত

হয়েন। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সাধকের অধিকার-ভেদে বা ভাবের তারতম্যানুসারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নাম ধারণ করেন। যাঁহার যেরূপ উপাসনা, তাঁহার সেইরূপ অনুভব হয়। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এক অখণ্ড বস্তু হইলেও জ্ঞানিগণ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গ যোগিগণ তাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে এবং ভক্তগণ তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবানরূপে অনুভব করেন। পরব্যোমস্থ নৃসিংহ-বামনাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবান এবং পরব্যোমাধিপতি লক্ষ্মী-পতি চতুর্ভুজ নারায়ণকে পূর্ণ ভগবান বলা হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের আশ্রয়, পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাই তাঁহাদের ভগবত্তার মূল। তাঁহারা কেহই স্বয়ং ভগবান নহেন। রূপ-গুণ-লীলাদিশূন্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, রূপ-গুণাদিবিশিষ্ট সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা তাঁহার অংশ-বিভূতি বা আংশিক প্রকাশ, এবং রূপ-গুণ-লীলাদিবিশিষ্ট চতুর্ভুজ নারায়ণ তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি। লক্ষ্মীপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ হইলেও আকারে, মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ এবং শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ।

• নির্ব্বিশেষ **ব্রহ্ম** শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-সূর্য্যের কিরণ-স্বরূপ এবং **পরমাত্মা** সূর্য্য-মণ্ডল স্বরূপ। • সূর্য্য যেমন কিরণ-রাশির আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। নিজলোকে সূর্য্যদেব সাকার মূর্ত্তিতে অবস্থান করিলেও, চর্ম্মচক্ষে তাঁহার সাবয়ব আকার গ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং তাঁহার নিরাকার কিরণমাত্র দেখিয়া যেমন সূর্য্যদেবকে নিরাকার বলিয়া বোধ হয়, তেমনি সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দরাকার গ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং তাঁহার নিরাকার কান্তিমাত্র দেখিয়া, জ্ঞানিগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিরাকার **ব্রহ্ম** রূপে অনুভব করেন। • তাঁহাদের দৃষ্টিতে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বই ব্রহ্মরূপে একটী নির্ব্বিশেষ তেজঃপুঞ্জ বস্তু

মাত্র। সূর্য্যের কিরণ দেখিয়া যেমন সূর্য্যের অস্তিত্ব মাত্র বুঝা যায়, তেমনি জ্ঞানমার্গে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সত্তা মাত্র অনুভূত হয়, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই শুধু জ্ঞান জন্মে। জ্ঞানমার্গে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত মাধুর্য্যের অনুভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত গুণের আধার হইলেও, তাঁহার নির্ব্বিশেষ প্রকাশরূপ ব্রহ্মে কোনরূপ গুণের আবিষ্কার নাই।

আবার রক্তবর্ণ সূর্য্য-মণ্ডল দেখিয়া যেমন সূর্য্যের প্রকাশ বুঝা যায়, তেমনি অষ্টাঙ্গ যোগিগণ আত্মদর্শন দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের **পরমাত্মা**-রূপ স্বরূপকে হৃদয়ে অনুভব করেন। এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে অনন্তকোটি জীবের অন্তরে অবস্থিত। একই সূর্য্যমণ্ডল যেমন বহুস্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রকাশ পায়, তেমনি একই পরমাত্মা স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীবের প্রত্যেকের অন্তরে প্রকাশিত হয়েন। চিরসাথী ও পরমাশ্রয় হইলেও জীব-সম্বন্ধে পরমাত্মা উদাসীন ও সাক্ষী মাত্র। শ্রীকৃষ্ণে মমতা-জ্ঞান না থাকায় যোগিগণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্মা-স্বরূপকে কেবল হৃদয়ে অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করেন। ইঁহাদিগকে শান্ত ভক্ত বলা যায়।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের যে পূর্ণরূপ, তিনিই **ভগবান্**। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের সমষ্টিরূপ ভগ শ্রীভগবানে বিদ্যমান। ভক্তগণ তাঁহাদের শুদ্ধভক্তির প্রভাবে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের কর-চরণাদি-যুক্ত বিশিষ্ট রূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কোটি ব্রহ্মানন্দ-তুচ্ছকারী অনন্ত সেবা-সুখ-বৈচিত্র্য উপভোগ করেন। ব্রহ্মের বা পরমাত্মার লীলা-পরিকরাদি নাই বলিয়া জ্ঞানী বা যোগী কেহই

সবিশেষ ভগবৎ স্বরূপের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বৈচিত্রী উপভোগ করিতে পারেন না।

প্রাকৃত জীবে যেমন জড় দেহ ও চিন্ময় আত্মা—এইরূপ দেহ-দেহী ভেদ দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণে সেরূপ **দেহ-দেহী ভেদ** নাই। নিজ অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার বিগ্রহ বা দেহও সচ্চিদানন্দময়। তাঁহার দেহে সৎ, চিৎ, ও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ এক ও অভিন্ন, উভয়ই অনন্ত, বিভু ও সর্ব্বগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা স্বীয় স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস। নর-লীলার স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহার চিন্ময় দেহে জন্ম প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরলীলার অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত মানুষের ন্যায় প্রতীত হয়েন বটে, কিন্তু প্রাকৃত দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাকৃত পঞ্চভূতে গঠিত নহে। আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সৎ বা ধ্বংস-রহিত এবং চিদ্ঘন বা চিন্ময়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নাম, বিগ্রহ, লীলা, লীলাস্থলী ও লীলাসহচর সমস্তই অপ্রাকৃত বা চিন্ময় ও মায়াতীত—তাঁহারা কেহই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।

প্রাকৃত বস্তুতে ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। আম্রবৃক্ষের সহিত নিম্ববৃক্ষের যে ভেদ তাহার নাম **স্বজাতীয়** ভেদ, বৃক্ষের সহিত প্রস্তরাদির যে ভেদ তাহার নাম **বিজাতীয় ভেদ,** আর বৃক্ষের শাখাপল্লবাদির যে ভেদ তাহার নাম **স্বগত ভেদ**। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহে কোনরূপ ভেদ না থাকায় দেহের যে কোনও অংশে যে কোনও শক্তি অভিব্যক্ত হইতে পারে, দেহের যে কোন ইন্দ্রিয় যে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ আবার পরস্পর **বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়**—অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তাঁহাতে বিরুদ্ধগুণের যুগপৎ সমাবেশ দৃষ্ট হয়। "অণোরণীয়ান্" (কঠোপনিষদ্) অর্থাৎ তিনি যে সময়ে অণু হইতেও অণু, ঠিক সেই সময়েই তিনি মহান্ হইতেও মহান্। দাম-বন্ধন লীলায়, উদূখলে বন্ধন-

ব্যাপারে, মা যশোদা যত রজ্জু আনয়ন করেন, সকলই দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়া যায়—পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-স্নেহের বশে বন্ধনদশা স্বীকার করেন। ইহাতে বিভুত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ বিকাশ হইয়াছিল।—"আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ (কঠোপনিষদ্)—অর্থাৎ যে সময়ে তিনি বসিয়া বা শুইয়া আছেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ সম্ভবপর হয়।

শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রাকৃত হেয় গুণ নাই বটে, কিন্তু তিনি অনন্ত অপ্রাকৃত গুণের আধার। কেহই তাঁহার গুণসমূহের অন্ত পায়েন না। ব্রজধামে তিনি নিজ ভগবত্তা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া নরলীলা করিয়া থাকেন। **"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥"** (চৈঃ চঃ ২।২১।৮৩)। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপই নরাকৃতি। ব্রজে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর গোপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ংরূপে বিরাজিত। নরলীলাই তাঁহার সর্ব্বোত্তম লীলা। গোপবেশ-বেণুকর-নবকিশোর নটবর-রূপে তাঁহার যে অপরূপ রূপ, তাহাই তাঁহার স্বরূপ। ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত সাকার নর-দেহেও তিনি **বিভু** বা সর্ব্বব্যাপক। সসীমে অসীমের অভিব্যক্তি আছে বলিয়া মা-যশোদা শিশুপুত্রের মুখগহ্বরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন। বিভিন্ন স্বরূপে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে, তন্মধ্যে ব্রজের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ব্রজ-লীলাতেই তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ। তাঁহার লীলাস্থলী ব্রজধামের সমস্তই **চিদানন্দময়**। তথাকার বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণি, জল অমৃত, সহজকথাই গান, চলনই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী, ধেনুগণ কামধেনু এবং চন্দ্রসূর্য্য চিদানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়। ব্রজের আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত মাধুর্য্যরসে পরিপূর্ণ। শিখিপুচ্ছচূড় বেণুবাদনরত ব্রজেন্দ্র,

নন্দনের অপরূপ ব্রজলীলার সুমধুর রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও লোভ জন্মিয়াছিল।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-নবকিশোর। নিত্যনূতন লীলাবিলাস-বিশিষ্ট কৈশোর বয়সই তাঁহার প্রশস্ত বয়স। নরলীলা করিলেও প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার যৌবন বা বার্দ্ধক্য নাই। জননীর গর্ভ হইতে তাঁহার যে জন্ম, তাহা আত্মপ্রকাশমাত্র। ব্রজে তিনি কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই তিন অবস্থাতেই লীলা করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার ধরায় অবতরণ। তিনি মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার, নায়িকা শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত নিরন্তর কামক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য। শৃঙ্গার রসই কিশোরশেখর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসম্পত্তি দিবারাত্র কুঞ্জক্রীড়াতেই তাঁহার কৈশোর বয়স সফল হয়।

শৃঙ্গার-রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের তুলনা নাই—"সে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণি করে আকর্ষণ।" (চৈঃ চঃ ২।২১। ৮৭)। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ—কেয়ূর কুণ্ডলাদি যে সমস্ত অলঙ্কার তিনি শ্রীঅঙ্গে ধারণ করেন, তাহাতে অঙ্গের শোভাবৃদ্ধি না হইয়া শ্রীঅঙ্গের শোভা দ্বারা অলঙ্কারেরই শোভা বৃদ্ধি হয়। মৃদু মধুর হাস্য-শোভিত মুখকমলে মোহন মুরলী ধারণ করিয়া ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে তিনি যখন দাঁড়ান, তখন তাঁহার পরম মনোহর রূপকে আরও মনোহর দেখায়; তাঁহার নবীন নীরদসদৃশ শ্যাম কলেবর, ময়ূরপুচ্ছাদিশোভিত সুচারু মুখমণ্ডল, মকর-কুণ্ডলাদিশোভিত মনোহর শ্রবণযুগল, অপূর্ব্ব ভঙ্গিময় ভ্রূনর্ত্তন ও বঙ্কিম নয়নকটাক্ষ এতই ত্রিভুবনমোহন যে, অন্যের কথা কি, তিনি নিজেই নিজরূপ-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া যান—"আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।১১৪)। যে মদন স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দ্বারা ত্রিভুবন মুগ্ধ করে, সেই মদনকেও তিনি মুগ্ধ করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম মদন

মোহন। অবশ্য শ্রীরাধা যতক্ষণ তাঁহার পার্শ্বে থাকেন, ততক্ষণই তিনি মদনমোহন, নচেৎ তিনি নিজেই মদন-কর্তৃক মুগ্ধ হইয়া যান। শ্রীবৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত নবীন মদন প্রাকৃত মদনের দর্প চূর্ণ করিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ সহ রাসবিলাসাদি করেন এবং সেই রূপে তিনি স্বীয় নিত্যনবায়মান রসমাধুর্য্য তাঁহাদিগকে আস্বাদন করান। সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণুধ্বনি করেন, তখন পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হয়, যমুনায় উজান বহে এবং স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্তই কম্পিত ও পুলকিত হইয়া অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের **রূপ-মাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য, প্রেম-মাধুর্য্য ও লীলা-মাধুর্য্য**— এই চারিটী অসাধারণ গুণ আর অন্য কোনও স্বরূপে নাই; তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় ভাবের বিকাশ ব্রজধাম ব্যতীত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক **রূপ** দর্শনে পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত পুলকিত হয় (ভাঃ ১০।৩৫।১৫) এবং তাঁহার সর্ব্বভূত-মনোহর **বেণু** ধ্বনির শ্রবণে শিব-ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ পর্য্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হন (ভাঃ ১০।৩৫।১৫)। শ্রীকৃষ্ণের **প্রেম**-মাধুর্য্যের আর তুলনা নাই— শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—"হে প্রিয়তম! দিবাভাগে তুমি যখন বনে বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার দর্শন না পাইয়া ক্ষণার্দ্ধকালও আমাদের নিকট একযুগ বলিয়া মনে হয়, দিনান্তে আবার যখন তোমার দর্শন পাই, তখন নিমেষের ব্যবধানও অসহ্য বলিয়া বোধ হয় (ভাঃ ১০।৩১।১৫)। রাসপঞ্চাধ্যায়ে (ভাঃ ২৯-৩৩ অধ্যায়) বর্ণিত মনোহর রাসলীলায় তাঁহার অপরূপ **লীলা**-মাধুর্য্য সম্যক প্রকারে প্রকটিত হইয়াছে।

৩। শক্তিতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব—

যাহা কিছু করা যায়, তাহাই কার্য্য এবং যাহা দ্বারা কার্য্য হয়, তাহাই শক্তি। কার্য্যমাত্রই কারণ-সাপেক্ষ, কারণ-বিনা কোন কার্য্যই হইতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে কারণের আশ্রয়ে শক্তিই কার্য্য করে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল কারণের পরম কারণস্বরূপ।

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥" চৈঃ চঃ (২।৮।১১৬)। অগ্নির শক্তি যেমন তাহার দীপ্তি, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম—এই তিন ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি প্রধানতঃ তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়—যথা, চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। অগ্নিস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের দীপ্তিস্থানীয়া **চিচ্ছক্তি** হইতে শ্রীকৃষ্ণের ধাম-পরিকরাদির, ধূমস্থানীয় **মায়াশক্তি** হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড বা জড় জগতের, এবং স্ফুলিঙ্গস্থানীয়া **জীবশক্তি** হইতে জীব-সমূহের প্রকাশ হয়। অন্তরঙ্গাশক্তি বা স্বরূপশক্তি চিচ্ছক্তিরই নামান্তর। চিচ্ছক্তির সহায়-তায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস করিয়া থাকেন বলিয়া চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা শক্তি। আবার চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ শক্তিও বলা হয়। **যোগমায়া** নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি এই চিচ্ছক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় চিচ্ছক্তিরূপিণী এই যোগমায়া লীলারসপুষ্টির জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও গোপাঙ্গনাগণের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখেন এবং সেইরূপে বিচিত্র লীলারস আস্বাদনের ও বিচিত্র আনন্দানুভবের সুবিধা করিয়া দেন। লীলাসাধিনী শক্তি এই যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য-দেহ ধারণ করেন, এই যোগমায়ার অন্তরালেই তিনি লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। এই যোগমায়ার কার্য্য চিন্ময় **ভগবৎ-ধামে** এবং মায়াশক্তির কার্য্য **প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে**।

যে উৎপাদন করে তাহাকে **নিমিত্ত কারণ** এবং যে বস্তু কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে **উপাদান কারণ** বলা হয়। কুম্ভকার যেমন মৃদ্ঘটের নিমিত্ত কারণ এবং মৃত্তিকা যেমন তাহার উপাদান-কারণ, সেই রূপে জীব-মায়া প্রাকৃত জগতের নিমিত্তকারণ এবং গুণমায়া তাহার উপাদান-কারণ। এই জীবমায়া ও গুণমায়া মায়াশক্তিরই দ্বিবিধা বৃত্তি। প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু (অনুচ্ছেদ ১১ দেখ) জীবমায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া এবং তদ্বারা তাহাতে সৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া বিশ্ব সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হন এবং মায়াশক্তি তাহার গৌণ নিমিত্ত-* কারণ, তাহার নাম প্রকৃতিরূপা **জীবমায়া**, আর যে অংশ জগতের গৌণ উপাদান-কারণ তাহার নাম প্রধানরূপা **গুণমায়া**। এই জীবমায়াই বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া তাহাকে মায়িক বস্তুতে মুগ্ধ করে। জীবকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখা এই **জীবমায়ার কার্য্য**।

মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা শক্তি, কারণ এই শক্তি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও এবং শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও, ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ধাম-পরিকরাদি হইতে দূরে অবস্থান করে। আলোকের সহিত যেমন অন্ধকারের প্রকাশ নাই, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় হইলেও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে মায়ার সহিত তাঁহার কোনও সংযোগ নাই, মায়া তাঁহার সংস্পর্শেই আসিতে পারে না। জীবের ভগবৎ-উন্মুখতা যেমন অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য, ভগবৎ-বিমুখতাও তেমনি বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য। জীব শক্তি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা এই দুই শক্তির মধ্যস্থলে থাকিয়া উভয় শক্তিকেই অঙ্গীকার করে বলিয়া জীব শক্তির অপর নাম **তটস্থাশক্তি**। শ্রীগীতায় ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীবকে জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি বলা হইয়াছে।

* কারণ হন। মায়ার যে অংশ জগতের গৌণ নিমিত্ত-

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। অনাদি বহির্ম্মুখ জীব অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া স্বীয় স্বরূপ-জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং সেইরূপে নিত্যসুখ ও চিরশান্তি লাভ করিতে পারে। সেই জীবই আবার বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। তখন তাহার স্বরূপ জ্ঞান বহিরঙ্গা শক্তির বৃত্তিবিশেষ রূপ জীব মায়ার **আবরণী শক্তির** দ্বারা আবৃত হইয়া যায়। এইরূপে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সেই জীব জীবমায়ার **বিক্ষেপ শক্তির** প্রভাবে মায়িক বস্তুতে মুগ্ধ হয় এবং তজ্জন্য ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করে। যেখানে সূর্য্যের আলোক, সেখানে যেমন অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে মায়া থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই জীবের মায়া-বন্ধনের ও তাপত্রয়ের একমাত্র কারণ। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥" (চৈঃ চঃ ২।২০।১০৪)। এইরূপে দুঃখ ভোগ করিতে করিতে দৈবক্রমে সাধু বৈষ্ণ লাভ হইলে, তাঁহার কৃপায় জীব ভগবৎ-সাধন করিয়া মায়া-মুক্ত হন এবং ত্রিতাপজ্বালা হইতে অব্যাহতি পান। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন— "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" (গীতা, ৭।১৪)। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া জীব দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত মায়া-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি ঘটে না।

সৎ-চিৎ-আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি তিন রূপে অভিব্যক্ত হয়। তাঁহার সৎ-অংশের শক্তির নাম **সন্ধিনী** বা আধার শক্তি, চিৎ-অংশের শক্তির নাম **সম্বিৎ** বা জ্ঞানশক্তি এবং আনন্দ অংশের শক্তির নাম **হ্লাদিনী** বা আনন্দদায়িনী শক্তি। এই ত্রিবিধা শক্তির প্রভাবেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, প্রকাশ ও আনন্দের বিধান চলিতেছে। নিত্য সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ স্বয়ং সত্তাস্বরূপ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ নিজ সন্ধিনী শক্তির দ্বারা নিজের

ও অপরের সত্ত্বাকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও নিজ সম্বিৎ শক্তির দ্বারা নিজেও জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানাইতে পারেন। আবার তিনি স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও নিজ হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা নিজে আনন্দানুভব করেন এবং অপরকেও আনন্দানুভব করাইয়া থাকেন।

যাহার সহিত মায়ার কোনও সংস্পর্শ নাই, তাহাকে **বিশুদ্ধসত্ত্ব** বলা হয়। ইহা স্বরূপ শক্তিরই বৃত্তি-বিশেষ। বিশুদ্ধ সত্ত্বে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই তিন শক্তি যুগপৎ বিদ্যমান থাকিলেও, তাহাদের পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে না। সন্ধিনী শক্তি প্রাধান্য লাভ করিলে তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাতা পিতা প্রভৃতি এবং ভগবদ্ধাম-সমূহ প্রকাশিত হয়। আবার যখন সম্বিৎ শক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ এবং এবং ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি যে তাঁহারই আবির্ভাব-বিশেষ এইরূপ জ্ঞান বা অনুভূতিই সম্বিতের সার। "সুখস্বরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।১১১)। এই হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা সুখস্বরূপ কৃষ্ণ ভক্ত পোষণ করিয়া ভক্তকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন এবং নিজেও সুখ আস্বাদন করেন। হ্লাদিনী-সার সমবেত সম্বিৎই ভক্তির স্বরূপ। ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বে নিত্য প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়েন। আনন্দই নিত্য সুখময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী শক্তি আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিদ্যমান। শ্রীরাধা এই হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ যেমন মূল ভগবান, তাঁহার পূর্ণ শক্তি শ্রীরাধাও তেমনি মূল লক্ষ্মী। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধা পৃথক বস্তু নহেন। তাঁহারা একই স্বরূপ একই আত্মা হইয়াও শুধু লীলারস আস্বাদনের

নিমিত্ত অনাদি কাল হইতে পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বই সকল তত্ত্বের সার, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনাই পরম সাধ্যবস্তু এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপ।

হ্লাদিনী শক্তির সার-স্বরূপা শ্রীরাধিকাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা শক্তি। হ্লাদিনীর সার হইল প্রেম, প্রেমের সার হইল ভাব এবং ভাবের চরম পরিণতির নাম মহাভাব। শ্রীরূপগোস্বামীর মতে প্রেমের একই অবস্থার দুইটী নাম—ভাব ও মহাভাব। ভাবের সর্ব্বোচ্চ দশারূপ এই মহাভাব মোদন ও মাদন ভেদে দ্বিবিধ। মাদনই মহাভাবের চরম অবস্থা, মাদনেই প্রেমের চরম বিকাশ। সর্ব্বগুণময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণী মাদনাখ্য মহাভাবের বিগ্রহ-স্বরূপা। **মাদনাখ্য মহাভাব** একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই অভিব্যক্ত হয়, অন্যত্র এমনকি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেও ইহার প্রকাশ নাই। রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-পরিপাটীর চরম-উৎকর্ষ একমাত্র মাদনাখ্য মহাভাবেই বিদ্যমান। এই মাদনাখ্য মহাভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-মনোমোহিনী শ্রীরাধারাণী প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া থাকেন। চিন্ময়ানন্দময়ী শ্রীরাধারাণী প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং নিত্য নবকিশোরী। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণই তাঁহার আরাধনা, তাই তাঁহার নাম শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণের মনে যখনই যে বাসনার উদয় হয়, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণী তখনই তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণাত্মিক শ্রীরাধার অন্তরে বাহিরে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই বিরাজ করেন। একমাত্র শ্রীরাধাই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থা। শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত নবীন মদন-রূপে অনুভব করিতে বা তাঁহার নিত্যনবনবায়মান মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে সক্ষম নহেন। "রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়

বিকার।" (চৈঃ চঃ ১।৪।৫২)। দুগ্ধের ঘনীভূত অবস্থা রূপ ক্ষীর যেমন দুগ্ধের বিকার, মহাভাবও সেইরূপ প্রণয়ের বা প্রেমের বিকার বা ঘনীভূত অবস্থা। সে কারণে মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীকে কৃষ্ণ-প্রেমের বিকার বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়-বিকার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূততম অবস্থা বা পরম পরাবস্থা রূপ মাদনাখ্য মহাভাবই **শ্রীরাধার তত্ত্ব।**

কৃষ্ণগত-প্রাণা প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য প্রেমলীলা করিয়া তাঁহাকে সুমধুর লীলারস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কোনও কার্য্য নাই। বৃহতগৌতমীয় তন্ত্র বলেন—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর-দেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥" শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই রূপ-গুণাদি সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনিই সকল ঐশ্বর্য্যের ও সকল মাধুর্য্যের আধার। সর্ব্ব-মোহন শ্রীকৃষ্ণকেও তিনি মোহিত করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠের **লক্ষ্মীগণ,** দ্বারকার **মহিষীগণ** ও ব্রজের **গোপাঙ্গনাগণ** ইহাঁরা সকলেই অখিলব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকারই অংশ-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ, শ্রীরাধা হইতেও তেমনি তাঁহাদের কান্তাগণের প্রকাশ হইয়া থাকে। কোনও ভগবৎ স্বরূপের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, সেই স্বরূপের কান্তার সহিত শ্রীরাধারও সেই সম্বন্ধ। ব্রজে কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে লীলা করেন। শ্রীরাধাও তথায় স্বয়ংরূপে লীলা করেন এবং স্বীয় কায়ব্যূহরূপা সখী-মঞ্জরী রূপে ব্রজলীলার সহায়তা করেন। মধুর লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত নিত্য কামক্রীড়া বা প্রেমের খেলা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধারাণীর আত্মসুখ-বাসনা নাই, প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্যই

তাঁহার কন্দর্পপীড়া ও প্রেমের খেলা। নিত্য নবকিশোরী শ্রীরাধা-রাণীর সর্ব্বাবয়ব নিত্যনবায়মান লাবণ্যভরে ঢল ঢল। তাহা দেখিয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের মন-প্রাণ প্রেমানন্দে নাচিয়া উঠে। হাব-ভাবাদি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া মদন-মোহন শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই যেমন শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্ত করিতে পারেন না, তেমনি শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহই শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্ত করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেম আমায় করায় উন্মত্ত॥" চৈঃ চঃ ১৪।১০৬ শ্রীকৃষ্ণমনোমোহিনী শ্রীমতী রাধারাণী মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণপ্রেম। তাঁহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে গঠিত। শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উৎপত্তি-স্থান। তিনি ভিন্ন আর কেহই স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সম্যক প্রীতিবিধান করিতে পারেন না।

কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাঁহার অন্তরে বাহিরে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই বিরাজ করেন। অন্তরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদি চিন্তা করেন এবং তাঁহার সঙ্গ সুখাদি অনুভব করেন। বাহিরে তিনি যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ হয়, তাহাতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপিত বা স্ফুরিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধারাণী সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা নীরদবরণ বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা পাইতে চাহিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার নয়ন যুগল, শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাক্য ও মোহন বেণুধ্বনি শ্রবণের নিমিত্ত তাঁহার কর্ণদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার নাসিকা, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার রসনা, এবং শ্রীকৃষ্ণের কোটীন্দুশীতল অঙ্গস্পর্শের নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ—সদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই তিনি জানেন না, আর কিছুই তিনি চাহেন না। শ্রীরাধা যাহা চাহেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণতেই তাহা পাইয়া থাকেন।

আবার শ্রীকৃষ্ণ যাহা চাহেন, একমাত্র শ্রীরাধাতেই তাহা পাইয়া থাকেন। শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাগল, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি শ্রীরাধার জন্য পাগল। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে যেমন শ্রীরাধার প্রাণের পিপাসা মিটে না, শ্রীরাধাকে না পাইলে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পিপাসা মিটে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥ যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ॥ যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধর-রস আমা করে বশ॥ যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দুশীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥ এই মত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥" (চৈঃ চঃ ১০০-৫)। শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদির কণিকা-মাত্রই ত্রিভুবনের আনন্দের হেতু হইলেও, শ্রীরাধার রূপ রসাদি হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করে। সে কারণে শ্রীরাধার রূপাদিকে শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু বা জীবনানন্দ-প্রদাত্রী বলা হইয়াছে। সম্ভোগান্তে শ্রীরাধার অপূর্ব অঙ্গ মাধুরী দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়েন। মদনমোহন শ্যামসুন্দরের মনোমোহিনী শ্রীমতী রাধা রাণীর প্রেম-মহিমার তুলনা নাই।

৪। **শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব**—"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি। ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।৪৯-৫০)। মাদনাখ্য মহাভাবের বিগ্রহ-স্বরূপা শ্রীরাধা এবং শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এক স্বরূপ ও এক আত্মা হইয়াও লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতে দুই পৃথক দেহধারণ করিয়া লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগে রসবিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত উভয়ে আবার একত্ব প্রাপ্ত হইয়া

শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এতদুভয়ের মিলনে উৎপন্ন যে একটী রূপ, সেইটীই শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর স্বরূপ। শ্রীরাধার গৌর-কান্তির অন্তরালে নিজ শ্যাম কান্তি ঢাকিয়া, দুই জনে একদেহ হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হইয়াছেন। "নন্দ সুত বলি যারে ভাগবতে গাই। সে-ই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥" (চৈ চঃ ১।২।৬)।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অপূর্ব্ব মহামিলনে উৎপন্ন এক অভিনব বিগ্রহের আভাস প্রেমিক কবি বিদ্যাপতির হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাভাবে কবি গাহিয়াছেন— "প্রেম সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান॥ কানু হোয়ব যব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা॥" রাই-কানুর অপূর্ব্ব মহা মিলনই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে শ্যামসুন্দর শ্রীরাধার-ভাবে বিভাবিত হইয়া এবং তাঁহার ন্যায় দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল অপূর্ব্ব গম্ভীরা লীলা করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার সত্ত্বা পৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য কিছুমাত্র বুঝা যায় না। অদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও নিত্যানন্দপ্রভু—এই দুইজনের নিকটে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু স্বীয় প্রকৃতস্বরূপ—রসরাজ-মহাভাবের মিলিত বিগ্রহ—একমাত্র রায় রামানন্দের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় বলিতে-ছেন—"পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপ রূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।২২১-২)। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করেন। তৎকালে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত সাধ্য

সাধনতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি স্বীয় স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। রায় রামানন্দ সহসা দেখিতে পাইলেন—প্রভুর সন্ন্যাসিরূপের পরিবর্ত্তে শ্যামসুন্দরের গোপ-রূপ, তদগ্রে এক স্বর্ণ পুত্তলিকা, আর সেই পুত্তলিকার গৌরকান্তিতে শ্যামসুন্দরের শ্যামকান্তি আচ্ছাদিত। এই সব দেখিয়া রামানন্দের মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি মহাপ্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—"তুমি মহাভাগবত, শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রেম—তাই আমাতে তোমার শ্রীরাধা-কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।" মহাপ্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া—"রায় কহে—তুমি প্রভু! ছাড় ভারি ভুরি। মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥"—"তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ-মহাভাব দুই এক রূপ॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।২২৯ ও ২৩৩)। রসরাজ-মহাভাবের অপূর্ব্ব মহামিলনই মহাপ্রভুর স্বরূপ—ইহা দেখিয়া রামানন্দ আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর মহাপ্রভু স্বীয় গৌরবর্ণের কারণ বলিতেছেন— "গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।" (চৈঃ চঃ ২।৮।২৩৮)। গোপেন্দ্রসুত শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও শ্রীরাধা স্পর্শ করেন না—এইরূপ উক্তি দ্বারা মহাপ্রভু ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে বিদ্যুদবর্ণা শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শে যখন তাঁহার অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন তিনি গোপেন্দ্রসুত শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই নহেন। শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছেন। স্বরূপতঃ মহাপ্রভু শ্রীরাধা কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গিত ও তাঁহার সহিত অবাধে মিলিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই। এই গৌরাঙ্গ-স্বরূপেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সহিত নিত্য রমণ করেন এবং শ্রীরাধার ভাবে নিজ দেহ-মন বিভাবিত

করিয়া নিজ মাধুর্য্যরস নিজে আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা-ভাব দ্যুতি-সুবলিত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপের গৌরহরি। বাহিরে তাঁহার অঙ্গ কান্তি গৌরবর্ণ হইয়াছে বটে, অন্তরে কিন্তু তিনি নবজলধর শ্যাম শৃঙ্গার-রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অন্তঃকৃষ্ণ, বহির্গৌর।

অখিলরসামৃতসিন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার। ব্রজে তিনিই ছিলেন শৃঙ্গার রসের আস্বাদ্য বা বিষয় এবং মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী ছিলেন শৃঙ্গার রসের আস্বাদক বা আশ্রয়। ব্রজলীলায় রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপেই শৃঙ্গাররস আস্বাদন করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্রয়রূপে তিনি স্বীয় অসমোর্দ্ধ্বরস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। তাই তিনি প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—"কৈছে তুয়া প্রেম, কৈছন মধুরিমা কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর। এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ, কি কহব না পাইয়া ওর॥ ভাবিয়া দেখিনু মনে তোহারি স্বরূপ বিনে, এ সুখ আস্বাদ কভু নয়। তুয়া ভাব-কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি, নদীয়াতে করব উদয়॥" (বলরাম দাস)। ব্রজ ধামে শ্রীকৃষ্ণ নানারস বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথায় তাঁহার **তিনটি বাসনা** অপূর্ণ ছিল—যথা, (১) শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা কিরূপ? (২) শ্রীরাধা-ভোগ্য স্বীয় মাধুর্য্যই বা কিরূপ? এবং (৩) সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার সুখসম্ভোগ হয় কিরূপ? এই তিনটি বস্তু অনুভব করিবার নিমিত্ত তাঁহার লালসা জন্মে। শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার ব্যতীত এই তিন বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। তাই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব ও গৌর কান্তি অঙ্গীকার করিয়া রসরাজ-মহাভাব মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্রজলীলায় অপূর্ণ তিন বাসনা গৌর লীলায় পূর্ণ করিলেন। আর সেই সঙ্গে তিনি আনুষঙ্গিকভাবে যুগধর্ম

ও প্রেমভক্তি জগতে প্রকাশ করিলেন। ব্রজলীলায় অপূর্ণ তিন বাসনাই গৌর-অবতারের মূল বা মুখ্য কারণ এবং নাম ও প্রেম প্রচার—তাহার আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় বিষয়রূপে এবং গৌর লীলায় আশ্রয়রূপে লীলারস আস্বাদন করিলেন। সে কারণে ব্রজলীলা ও গৌরলীলা দুইটী পৃথক লীলা নহে এবং দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ ও কলির শ্রীগৌরাঙ্গ দুইটী পৃথক অবতার নহেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রজলীলা ও গৌরলীলা একই গৌরলীলা প্রবাহের দুইটী অংশ মাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ একই অবতারের দুইটী ভাব মাত্র। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত যে দ্বাপরে শ্যামসুন্দর অবতীর্ণ হয়েন, তাহারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে তিনিই আবার প্রেমকারুণ্যময় লীলা-বিলাসের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে অবতীর্ণ হয়েন। নবদ্বীপের গৌরসুন্দর ব্রজের শ্যামসুন্দরেরই আবির্ভাব-বিশেষ।

প্রেমকল্পতরু পতিতপাবন গৌরহরি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অযাচিতভাবে সকলকেই শৃঙ্গার-রসাত্মক প্রেমভক্তি অবাধে দান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে।" (চৈঃ চঃ ১।৩।২০)। সর্ব্ব অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। দ্বাপরে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধী ব্যক্তিকে তো কখনই প্রেমদান করেন নাই, নিরপরাধ ব্যক্তিকেও সহজে তাহা দেন নাই। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি নাহি দেন রাখেন লুকাইয়া॥" (চৈঃ চঃ ১।৮।১৯)। প্রেমভক্তি না দিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণ অব্যাহতি পান, তাহা হইলে তিনি প্রেমরত্ন লুকাইয়া রাখিয়া কেবল ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই ভক্তকে পরিতৃপ্ত করিয়া

থাকেন। গৌর অবতারে তিনিই আবার অপরাধের কোনও রূপ বিচার না করিয়া নিরপরাধের তো কথাই নাই, অপরাধী ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত অযাচিত ভাবে প্রেম দান করিয়াছেন। দ্বাপরে প্রেমদান বিষয়ে তাঁহার নিজের যে কৃপণতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা দূর করিয়া নির্ব্বিচার করুণা-বিলাস দেখাইবার জন্য তিনিই আবার পরবর্ত্তী কলিযুগে ভুবনপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং অনর্পিত প্রেমভক্তিরূপ অমূল্য সম্পত্তি আচণ্ডাল নরনারীর মধ্যে অযাধে বিতরণ করিলেন। পতিত-পাবন গৌরহরির অযাচিত ও নির্ব্বিচার কৃপার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী জগাই-মাধাই নামে দুই মহাপাপীর উদ্ধার। বিশ্বকে প্রেমভক্তি দিয়া ভরণ পোষণ করেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের একটী নাম বিশ্বম্ভর। তাঁহার ন্যায় এমন নির্ব্বিকার প্রেমদাতা এমন করুণার অবতার, পতিতের বন্ধু ও দয়াল ঠাকুর অন্য কোনও যুগে আর হয় নাই, আর হইবেও না।

অপরাধ থাকিতে প্রেমোদয় হয় না। তাই পরম কারুণিক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অপরাধী ব্যক্তিকে হরিনাম করাইয়া এবং শ্রীনামের প্রভাবে তাহার চিত্ত-শোধন ও অপরাধ খণ্ডন করাইয়া দেব-দুর্লভ প্রেমমহাধন অকাতরে দান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেমাবতার গৌরহরির অপূর্ব্ব প্রেমময় মূর্ত্তি ও প্রেমঢলঢল চক্ষুর ভুবনমোহন চাহনি দেখিয়া অপরাধী ব্যক্তির হৃদয়ের মলিনতা বিধৌত হইয়া যাইত এবং শ্রীনামের প্রভাবে তাঁহার দেহে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের ও সুদুর্লভ প্রেমের উদয় হইত। শ্রীনামের এমনই অদ্ভুত গুণ যে তদাশ্রয়ে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অপরাধের খণ্ডন হয়, ভবিষ্যতেও আর পাপে প্রবৃত্তি থাকে না। যদি কোন অপরাধীর কোনও বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সেই বৈষ্ণবের দ্বারা অপরাধ ক্ষমা করাইয়া মহাপ্রভু সেই অপরাধীর

বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করিতেন। কলিপাবনাবতার গৌরহরির কৃপা-দৃষ্টি ব্যতীত ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করা যায় না। তাঁহার পবিত্র নামেরও এমন অদ্ভুত গুণ যে—"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাহার হয় প্রেমোদয়।" শ্রীগৌর-নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে দেব-দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম আপনা আপনি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃত ভক্ত হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ ও প্রেম বর্দ্ধন করুন।

৫। শাস্ত্রাদিতে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার—

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণকালে গর্গ মুনি নন্দ মহারাজকে বলিলেন—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" (ভাঃ ১০।৮।১৩) অর্থাৎ "তোমার এই পুত্র যুগে যুগে তনু ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। গত তিন যুগে ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণের তনু প্রকটিত হইয়াছে। ইদানীং এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ইঁহার নাম "কৃষ্ণ" রাখা হইল।" প্রকৃতপক্ষে দ্বাপরের পর কলি হইলেও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক কলিযুগে পীতবর্ণে অবতার হইয়াছিল—এইরূপ মনে করা অসঙ্গত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।২০ ও ২৬) হইতে জানা যায় যে সত্যযুগে ইনি শুক্লবর্ণ ও ত্রেতায় রক্তবর্ণ। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে পীত বা গৌর বর্ণের শ্রীগৌরাঙ্গই কলিযুগের অবতার, নচেৎ শ্লোকোক্ত পীতবর্ণের অবতার কোন্ যুগে আবির্ভূত হয়েন, তাহা বুঝা যায় না। বস্তুতঃ কলিতে লীলাবতার নাই বলিয়া শ্রীবিষ্ণুকে ত্রিযুগ বলা হয়। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের ন্যায় কলিযুগের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হয়েন না। সে কারণে তাঁহাকে কলির প্রচ্ছন্ন অবতার বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, স্বয়ং ভগবানের যুগাবতারত্ব নাই।

কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কলিযুগের অবতার বলা হইয়াছে।

কলিযুগের অবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩২)। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। তিনি—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং," অর্থাৎ দ্বাপরের ন্যায় কলিযুগেও তিনি বস্তুতঃ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ত্বিষা বা কান্তিতে তিনি অকৃষ্ণ বা পীত বা গৌর। অন্তরে তিনি কৃষ্ণবর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বটেন, কিন্তু স্বীয় হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করিয়া এবং তদ্দ্বারা নিজ শ্যামাঙ্গ ঢাকিয়া তিনি কলিযুগে গৌরবর্ণ হইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী 'কৃষ্ণবর্ণ'—শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—"কৃ-ষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥ কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ। কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥ (চৈঃ চঃ ১।৩।৪২-৩)। অর্থাৎ কৃ ও ষ্ণ এই দুই বর্ণ সর্ব্বদা যাঁহার মুখে বিরাজিত, অথবা যিনি প্রেমবিবশ হইয়া 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ'-এই নাম ও এই নামের মহিমা পরম প্রীতির সহিত বর্ণন করেন, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণ-নাম ও কৃষ্ণ-কথা সদাই স্ফুরিত হয় বলিয়া তাঁহাকে যে 'কৃষ্ণবর্ণ' বলা হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলা হইল—তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং অর্থাৎ তিনি অঙ্গ ও উপাঙ্গ (অঙ্গের অঙ্গ) রূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান। অন্যান্য অবতারে সুদর্শনাদি অস্ত্রের দ্বারা ও সৈন্যাদি পার্ষদ-গণের দ্বারা অসুর সংহারাদিরূপ যে সব কার্য্য সাধিত হইত, গৌর-অবতারে কর-চরণাদি অঙ্গ ও অঙ্গুলি-আদি উপাঙ্গদ্বারা তাহাই সাধিত

হইয়াছে। ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—"রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারো না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার॥" বস্তুতঃ মহাপ্রভুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শনে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শনে এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিনাম-শ্রবণে পাষণ্ডীগণের মন হইতে আসুরিক ভাব বা ভক্তিবিরোধী বাসনা তিরোহিত হইত এবং চিত্তে ভক্তি ও প্রেমের উদয় হইত। এইভাবে মহাপ্রভুর অঙ্গ ও উপাঙ্গ বা প্রত্যঙ্গকে অস্ত্র ও পার্ষদ বলা হইয়াছে। অথবা—কলিহত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবানের নামই অস্ত্র এবং নিত্যানন্দ-প্রমুখ পার্শ্বচরগণ পার্ষদরূপে গণ্য। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের দ্বারা মহাপ্রভুর ধর্ম সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই শ্লোকের শেষাংশে বলা হইল যে সুমেধা বা বিবেকীগণ সঙ্কীর্তন প্রধান যজ্ঞের (পূজা-সম্ভার) দ্বারা তাঁহার ভজনা বা উপাসনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে যুগধর্ম্ম শ্রীনামসঙ্কীর্তন প্রচলিত করেন। সঙ্কীর্ত্তনেই তাঁহার পরম প্রীতি।

মহাভারতেও মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে বর্ণিত সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী—এই চারিটী নাম মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা সম্বন্ধে এবং সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত ও নিষ্ঠা-শান্তি পরায়ণ—এই চারিটী নাম তাঁহার সন্ন্যাসলীলা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়। মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে বহু বহু পুরাণ বচন ও বহু বিদ্বজ্জনের অনুভবাদি বিদ্যমান আছে। সুতরাং মহাপ্রভুর আবির্ভাব একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিখিল শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ।

৬। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপ—

মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে পূর্ণ থাকিয়া অনাদি কাল হইতে অনন্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। একই বৈদূর্য্যমণি

যেমন আধার ভেদে নীলপীতাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এক ও অখণ্ড হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন। অনন্ত স্বরূপে তাঁহার অনন্তলীলা প্রকটিত হইলেও এবং বিভিন্নস্বরূপে বিভিন্নশক্তির বিকাশ হইলেও, সকল স্বরূপে তত্ত্বতঃ একই মূর্ত্তি বিদ্যমান, সকল স্বরূপে একমাত্র তিনিই বিরাজ করেন। এইরূপে সকল বিষয়ে একমাত্র তিনিই আছেন, সকল কার্য্য একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে। তথাপি তিনি অনাদি কাল হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় হ্লাদিনীশক্তি স্বরূপা শ্রীরাধিকার সহিত শৃঙ্গার-রসাত্মক প্রেমের খেলা খেলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার। তাঁহার কার্য্য হইল শুধু প্রেমলীলা করা, রাসলীলাই তাঁহার একমাত্র প্রিয় কার্য্য।

ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি বিকাশের তারতম্যানুসারে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-রূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ রূপ—এই তিন রূপে লীলা করিয়া থাকেন। স্বয়ংরূপ বলিতে শিখিপুচ্ছ-বিভূষিত মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনের যেরূপ রূপ, তাহাই বুঝায়। সর্ব্ব-অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই স্বয়ং রূপটী স্বয়ংসিদ্ধ। ইহা অন্য কোনও রূপের অপেক্ষা রাখে না। সকলের মূল রূপটীই হইল স্বয়ংরূপ—যাহাকে আশ্রয় করিয়া অপরাপর স্বরূপের প্রকাশ হয়। স্বয়ং রূপ ব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপে নিখিল শক্তির বিকাশ নাই।

প্রকাশও বিলাস ভেদে স্বয়ংরূপের আবির্ভাব দ্বিবিধ। একই বিগ্রহের একইকালে বহুস্থানে যে বহুবিধ রূপ তাহার নাম **প্রকাশ**। শ্রীবৃন্দাবনে একই কৃষ্ণ একই প্রকার শরীরে দুই দুই গোপীর মধ্যে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিয়া পৃথক পৃথক ভাবে রাসলীলা করিলেন—তখন প্রত্যেক গোপীই দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই পার্শ্বে আছেন।

দ্বারকায় আবার একই কৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র গৃহে স্বতন্ত্রভাবে আবির্ভূত হইয়া একই বিগ্রহে, একই সময়ে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। লীলারস পোষণের নিমিত্ত রাসে বা মহিষী বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের একইরূপ-গুণ-লীলা বিশিষ্ট বহু মূর্ত্তির যে যুগপৎ আবির্ভাব, তাহাকে প্রাভব প্রকাশ বা মুখ্য প্রকাশ বা সংক্ষেপে **প্রকাশ** বলা হয়। ইহা সৌভরী প্রভৃতি ঋষিগণের কায়ব্যূহের মত নহে। সৌভরী ঋষি যোগবলে পঞ্চাশটী দেহ ধারণ করিয়া রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। কায়ব্যূহ রচনা করিয়া তিনি বহুদেহ হইলেও সকল দেহেরই ক্রিয়া একইকালে একই প্রকার হইত। সেই কায়ব্যূহের এক মূর্ত্তি যখন যাহা করিত, অন্য মূর্ত্তি গুলিও সেই সময়ে সেইরূপ কার্য্যই করিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বিভু বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ মূর্ত্তি যুগপৎ বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রকাশ হয়। ঋষিগণের তাদৃশ শক্তি প্রকাশের ক্ষমতা নাই বলিয়া নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তির বিচিত্রতা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ মূর্ত্তি যোগিগণকেও মোহিত করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয়।

লীলাবিশেষের জন্য একই দেহে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে বা বর্ণে স্বয়ং রূপের যে আবির্ভাব, তাহাকে বৈভব প্রকাশ বা গৌণ প্রকাশ বা **বিলাস** বলা হয়। "একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম॥" (চৈঃ চঃ ১।১।৩৮)। আকার বর্ণাদির একতা থাকিলে মুখ্য প্রকাশ বা সংক্ষেপে **প্রকাশ** এবং আকারাদির বিভিন্নতা থাকিলে গৌণ প্রকাশ বা **বিলাস**। বিলাসে স্বরূপত্ব এক ও অভিন্ন থাকিলেও আকৃত্যাদি বিভিন্ন হয়। এই বিলাস

তদেকাত্মরূপেরই অন্তর্গত। নৃসিংহ-বামনাদি তদেকাত্মরূপ স্বয়ং রূপের সহিত অভেদে বা তদেকাত্মভাবে বিরাজিত হইয়াও আকারাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে এবং মথুরা-দ্বারকায় তিনি বাসুদেব রূপে লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। ব্রজে তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন গোপভাব, গোপলীলা ও গোপবেশ এবং মথুরা-দ্বারকায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ভাব, ক্ষত্রিয়লীলা ও ক্ষত্রিয়বেশ। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই দ্বিভুজ, আর মথুরা-দ্বারকায় তিনি সাধারণতঃ দ্বিভুজ, সময় সময় চতুর্ভুজ। দ্বিভুজ স্বরূপে স্বয়ং রূপের সহিত সমান আকার ও বর্ণ থাকে বলিয়া দ্বিভুজ স্বরূপকে স্বয়ং রূপের **প্রকাশ** বলা হয়। আর চতুর্ভুজ স্বরূপে আকার বিভিন্ন হয় বলিয়া চতুর্ভুজ স্বরূপকে স্বয়ং রূপের **বিলাস** বলা হয়। রজত-ধবল শ্রীবলরাম মূলতঃ শ্যাম-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের সমান হইলেও, বর্ণভেদ থাকায় শ্রীবলরাম হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি। প্রকাশ অপেক্ষা বিলাসে ন্যূনশক্তি প্রকটিত হইয়া থাকে।

স্বয়ং রূপের সহিত তদেকাত্মরূপের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, কিন্তু আকৃত্যাদির ঈষৎ পার্থক্য থাকায় তদেকাত্মরূপকে স্বয়ং রূপ হইতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরাম-নৃসিংহ-বামনাদি স্বরূপকে **তদেকাত্মরূপ** বলা হয়। বিলাস ও স্বাংশ ভেদে এই তদেকাত্মরূপ দুইপ্রকার। **বিলাসে** একই স্বরূপ লীলা-বিশেষের জন্য পৃথক আকৃত্যাদিতে প্রকটিত হয়েন। বৃন্দাবনে শ্রীবলরাম, পরব্যোমে চতুর্ভুজ নারায়ণ, দ্বারকায় বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ নামে দ্বারকা চতুর্ব্যূহ—ইহারা সকলেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। স্বয়ংরূপ অপেক্ষা বিলাসে শক্তি-আদি কোন কোন গুণ কিঞ্চিৎ অল্প

থাকে। স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাদি এত অধিক পরিমাণে প্রকটিত হয় যে তাহা দেখিয়া বিলাসরূপ বাসুদেবের পর্য্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল এবং তাহা আস্বাদন করিবার জন্য লোভ জন্মিয়াছিল। বিলাস অপেক্ষা ন্যূনশক্তি যাহাতে প্রকাশ থাকে, তাহাকে স্বাংশ বলা হয়। স্ব-স্ব ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলাবতারগণ স্বাংশের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। শক্তি-আদি গুণের তারতম্যানুসারে বিলাস ও স্বাংশ অনেক প্রকারের আছে।

কার্য্য-বিশেষের জন্য নিজ দেহ হইতে যে বহু দেহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **কায়ব্যূহ** বলে। শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের আদ্য বা সাক্ষাৎ কায়ব্যূহ বা প্রকাশ-বিশেষ। নিজ লীলার সহায়তার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কায়ব্যূহরূপে শ্রীবলরাম হয়েন। স্বরূপতঃ শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। গুরু, সখা ও ভৃত্য —এই তিন ভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ স্বরূপ শ্রীবলরামের স্বতন্ত্র ধাম নাই। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালনরূপ সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। মূল সঙ্কর্ষণ রূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণসমীপে থাকিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। আবার সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনরূপ সেবাকার্য্যের জন্য তিনি মহাসঙ্কর্ষণ-রূপে বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামসমূহ প্রকাশ করেন এবং ত্রিবিধ পুরুষাবতার রূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করেন। তিনিই আবার অনন্ত ও শেষরূপে পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের শয্যা-ছত্র-পাদুকাদি সেবার উপকরণরূপে সাক্ষাৎসেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করেন। এইরূপে যে বলরাম শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করিয়া আজ্ঞা পালনরূপ সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই আবার গৌরলীলায় সহায়তা করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। "সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ। সেই বাম শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নিত্যানন্দ॥"

(চৈঃ চঃ ১।৫।৯)। লীলাবিশেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণই যেমন শ্রীচৈতন্য বা শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইয়াছেন, শ্রীবলরামও তেমনি শ্রীনিত্যানন্দরূপে প্রকট হইয়াছেন। কৃষ্ণাবতারে যিনি বলরাম, গৌরাবতারে তিনিই নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন একই বস্তু, শ্রীবলরাম ও শ্রীনিত্যানন্দ তেমনি একই বস্তু। ইহাই **নিত্যানন্দ তত্ত্ব।**

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে, মায়াপারে, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন চিন্ময়ধাম বা লীলাস্থান বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহের ন্যায় ভগবৎ-ধাম-সমূহও বিভুত্বাদি-গুণবিশিষ্ট। ভগবৎ-ধাম মাত্রেরই সাধারণ নাম বৈকুণ্ঠ এবং ধাম-সমষ্টির নাম **পরব্যোম** বা মহাবৈকুণ্ঠ। পরব্যোমে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত বৈকুণ্ঠধাম অবস্থিত। যিনি যে স্বরূপের ভজনা করিয়া মুক্তিলাভ করেন, তিনি সেই স্বরূপের ধামে গমন করেন। যিনি যাঁহার উপাসক তিনি তাঁহার লোকাদি প্রাপ্ত হয়েন। উপাসকের রুচি বা তৃপ্তি অনুসারে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস মূর্ত্তি। শ্রীনারায়ণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য—এই চারি প্রকার **মুক্তি** প্রদান করিয়া জীব নিস্তার করেন। তিনিই আবার জ্ঞান মার্গের সাধককে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিয়া নির্বিশেষ সিদ্ধলোকে লইয়া যান।

নিখিল ভগবল্লোকের উপরিভাগে **শ্রীকৃষ্ণলোক** বিরাজিত। গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা—এই তিন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণলোকের স্থিতি, এই তিন স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিহার করেন। গোকুলের অপর নাম ব্রজধাম। বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক গোকুলেরই ব্রজধামই স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম, ব্রজেই তিনি স্বয়ংরূপে লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন। ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিক লীলামাধুর্য্য প্রকটিত।

ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ দ্বারকায় তিনি পূর্ণ, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য মিশ্রিত মথুরায় তিনি পূর্ণতর এবং বিশুদ্ধ মাধুর্য্যপূর্ণ গোকুলে বা ব্রজধামে তিনি পূর্ণতম। লীলাবিলাস বা প্রেমের খেলাই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কার্য্য। ব্রজে তিনি স্বয়ং-রূপে এবং মথুরা-দ্বারকায় তিনি বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ-এই চতুর্ব্যূহরূপে অর্থাৎ এই চারি মূর্ত্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নানাভাবে লীলা করিয়া থাকেন। এই দ্বারকা-চতুর্ব্যূহই আদি বা প্রথম চতুর্ব্যূহ। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে যেমন বাসুদেব বলা হয়, শ্রীবলরামকে তেমনি সঙ্কর্ষণ বলা হয়। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতে অনন্ত কোটি চতুর্ব্যূহের প্রকাশ হইয়াছে। পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ এবং তাহা হইতে ন্যূনশক্তি সম্পন্ন।

বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ পরব্যোমের সবিশেষ অংশ। পরব্যোমের নির্ব্বিশেষ অংশকে ব্রহ্মধাম বা সিদ্ধলোক বলা হয়। রথ-অশ্বাদি সাবয়ব বস্তু সমেত জ্যোতির্ময় সূর্য্যলোক যেমন নিরবয়ব জ্যোতির্মণ্ডল দ্বারা আবৃত থাকে, সেই রূপে সবিশেষ বা সাকার বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ধাম বা সিদ্ধলোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। নির্ব্বিশেষ এই সিদ্ধলোক চিৎ-স্বরূপ বা চিন্ময় হইলেও এখানে চিচ্ছক্তির বিকার রূপ কোনও মূর্ত্তি নাই। যাঁহারা **ব্রহ্ম-সাযুজ্য** অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি রূপ মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা এই নির্ব্বিশেষ সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হয়েন। আর যাঁহারা অপর চারিপ্রকার মুক্তির অর্থাৎ সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির যে কোনটী লাভ করেন, তাঁহাদের স্থান হয় বৈকুণ্ঠাদি পরব্যোমের সবিশেষ অংশে।

বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহের বহির্ভাগে বলয়াকারে যে জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক অবস্থিত, সেই সিদ্ধলোকের বহির্ভাগে এবং তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া যে চিন্ময় জলপূর্ণ সমুদ্র আছে, তাহার নাম **কারণার্ণব** বা কারণসমুদ্র। কারণার্ণবের অপর নাম, আবার কাহারও মতে তাহার

একাংশের নাম বিরজা। এই কারণার্ণবের কণিকামাত্র হইতে ভুবনপাবনী সুরধুনী বা গঙ্গার উৎপত্তি। কারণার্ণবের এক পারে মায়াধাম অর্থাৎ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাস স্থূল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার অপর পারে চিন্ময় পরব্যোম। প্রাকৃত সৃষ্টির প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টির কাল উপস্থিত হইলে মহাসঙ্কর্ষণ বা পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থিত প্রকৃতিরূপা মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করিবার জন্য আপনার এক অংশে কারণার্ণবে শয়ন করেন। মহাসঙ্কর্ষণের যে অংশ কারণার্ণবে শয়ন করেন, তিনি **কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার** নামে অভিহিত হন। এই প্রথম পুরুষ ঈক্ষণ দ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করিয়া এবং সূক্ষ্ম জীবরূপ বীর্য্য তাঁহাতে আধান বা অর্পণ করিয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। ইনিই বেদের—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়," ইনিই মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা। পুরুষরূপে প্রথমে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া ইনি আদ্য বা প্রথম অবতার। ইনিই মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতারের ও জগৎসৃষ্টির মূল কারণ এবং সমস্ত অবতারের বীজ। ইঁহার আর একটী নাম **মহাবিষ্ণু**। মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর প্রথম পুরুষাবতার অনন্ত কোটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় ঘর্ম্মজলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া সেই জলে ভাসমান অনন্ত নাগের শরীররূপ শয্যায় অর্থাৎ অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন। ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে বা ভিতরে শয়ন করেন বলিয়া কারণার্ণবশায়ীর এই অংশটীর নাম **গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়** পুরুষাবতার। ইঁহার নাভি হইতে মৃণালসহ একটি পদ্মের উদ্ভব হয়। সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয় আর পদ্মটীর মৃণালে **চতুর্দ্দশ ভুবন** অবস্থান করে। চতুর্দ্দশ ভুবন বলিতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য—এই **ঊর্দ্ধ সপ্ত লোক** এবং

অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই **অধঃ সপ্ত লোক** বুঝায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা হইবার উপযুক্ত জীব পাওয়া যাইলে, সেই ভাগ্যবান জীবের এইরূপে জন্ম হয় এবং দ্বিতীয় পুরুষ সৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়া জীব সৃষ্টি করেন। ইনিই জীব-কোটি ব্রহ্মা। উপযুক্ত জীবের অভাব হইলে দ্বিতীয় পুরুষই অংশরূপে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মার নাম হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ ভেদে ব্রহ্মা দ্বিবিধ। সূক্ষ্মরূপে হিরণ্যগর্ভ নামে তিনি ব্রহ্ম-লোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন এবং স্থূলরূপে বৈরাজ নামে সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই দ্বিতীয়-পুরুষই রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে রুদ্র—এই তিন **গুণাবতার** রূপে প্রকটিত হইয়া সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন।

গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের অংশ হইলেন **ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার**। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডগত দ্বিতীয় পুরুষের নাভিপদ্মের মৃণালে চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত যে ভূর্লোক বা ধরণী আছে, তাহাতে ইক্ষু-সুরা-ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-জল—এই সপ্তপ্রকার সমুদ্র অবস্থিত। তৃতীয় পুরুষ এই সপ্ত সমুদ্রের অন্যতম দুগ্ধ বা ক্ষীরোদ সাগরে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বলা হয়। ইনিই জগৎপালনকর্ত্তা গুণাবতার **বিষ্ণু**। ক্ষীরোদসাগরের কাঞ্চনময় শ্বেতদ্বীপই গুণাবতার বিষ্ণুর ধাম। পরব্যোমই তাঁহার নিত্যধাম, শ্বেতদ্বীপে তাহা প্রকটিত হয় মাত্র। এই তৃতীয় পুরুষই যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার রূপে যুগধর্ম্মাদি প্রবর্ত্তন করেন। ইনিই আবার নিজাংশ অনন্তদেব রূপে পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করেন এবং ছত্র, পাদুকা শয্যাদি মূর্ত্তি-ভেদে শেষরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। সর্পাকৃতি অনন্তদেবকে তৃতীয় পুরুষের আবেশাবতার বলা হয়।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভেদে পুরুষাবতার ত্রিবিধ হইলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে একেরই ত্রিবিধ প্রকাশ। ইহাঁরা সকলেই অন্তর্যামী পুরুষ এবং নারায়ণ অর্থাৎ নার বা জীবসমূহের অয়ন বা আশ্রয়। কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণু হইলেন প্রকৃতির বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, গর্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষ দ্বিতীয় পুরুষ ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ বা চতুর্ভুজ বিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড গত ব্যষ্টি জীবের অর্থাৎ সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী। এই তৃতীয় পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (গীতা ১৮।৬১)। সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে প্রকৃতি বা মায়ার সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। ইহাঁরা সকলেই মায়াধীশ। প্রথম পুরুষাবতারকে সঙ্কর্ষণের, দ্বিতীয় পুরুষাবতারকে প্রদ্যুম্নের এবং তৃতীয় পুরুষাবতারকে অনিরুদ্ধের প্রকাশ বিশেষ বলা হয়।

যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ স্বরূপ শ্রীবলরাম বা মূল সঙ্কর্ষণ, যিনি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে সকল অবতারের মূল কারণ, সেই বলরামই গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মূল-সঙ্কর্ষণের অংশ হইলেন মহাসঙ্কর্ষণ, আবার মহাসঙ্কর্ষণের অংশ হইলেন প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। বলরাম বা মূল সঙ্কর্ষণ ও মহাসঙ্কর্ষণকে অভেদ জ্ঞান করিয়া মহাবিষ্ণুকে বলরামের অংশ বলা হয়। মহাপ্রভুর লীলাসহচর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য (অদ্বৈতপ্রভু) এই মহাবিষ্ণুর অবতার। ইহাই **অদ্বৈত তত্ত্ব**। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা বলেন—"অদ্বৈতো যঃ সদাশিবঃ।" সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্যে সদাশিবও আছেন। পরব্যোমস্থ শিবলোকে সর্ব্ব কারণ স্বরূপ ও তমোগুণ-সম্বন্ধ-রহিত যে সদাশিবমূর্ত্তি পুরাণাদিতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাকে

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি বলা হয়। সংহার-কর্ত্তা রুদ্র এই সদাশিবের অংশ। শিব অর্থে মঙ্গল, তাই অদ্বৈত প্রভুর নাম-গুণাদি স্মরণে জীবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হয়।

বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে স্বয়ং রূপাদির যে আবির্ভাব তাঁহাকে **অবতার** বলা হয়। এক কৃষ্ণই অনন্ত লীলা বিলাসের নিমিত্ত অনন্ত অবতাররূপে প্রকাশ পায়েন। অগ্নিশিখা যেমন অভিন্ন অগ্নি রাশির আংশিক প্রকাশ অবতার সকলও তেমনি মূল অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার অংশরূপ প্রকাশ-বিশেষ বা রূপভেদ মাত্র।

অবতার তিন প্রকার—অংশাবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার। যে স্বরূপে ন্যূন শক্ত্যাদির প্রকাশ হয়, তাঁহাকে **অংশাবতার** বলা হয়। অংশাবতার বলিতে পুরুষাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, ও মন্বন্তরাবতার—এই চারিটীকে বুঝায়। ত্রিবিধ পুরুষরূপে অবতারের নাম পুরুষাবতার এবং সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সম্বন্ধীয় অবতারের নাম গুণাবতার। প্রতিযুগের অবতারকে যুগাবতার এবং প্রতি মন্বন্তরের অবতারকে মন্বন্তরাবতার বলা হয়। প্রতিযুগে তৎকালীন মন্বন্তরাবতারই যুগাবতার রূপে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আবার মৎস্য-কূর্ম্মাদি অসংখ্য লীলাবতার আছেন।

নিজ কার্য্য-সাধনার্থ শ্রীকৃষ্ণ নিজশক্তি দ্বারা নারদাদি মহত্তম যে জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাকে **আবেশ** বলা হয়। মুখ্য ও গৌণভেদে এই আবেশ দুই প্রকার। যাঁহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির আবেশ হয়, তাঁহাকে **আবেশ-অবতার** বা মুখ্যশক্ত্যাবেশাবতার বলা হয়। আর অল্প শক্তির আবেশহেতু অসাধারণ গুণাদি-সম্পন্ন যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের **বিভূতি**

বা গৌণ শক্ত্যাবেশ। বিভূতিতে শ্রীকৃষ্ণ শক্তির আভাসমাত্র থাকে, আর আবেশাবতারে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ হয়। আবেশাবতারের মধ্যে সনকাদি (অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার) চতুঃসন-অবতারে জ্ঞান-শক্তির আবেশ, জীব-কোটী ব্রহ্মাতে সৃষ্টি-শক্তির আবেশ, শেষ-নাগে ছত্র পাদুকাদি রূপে সেবন-শক্তির আবেশ, পৃথুতে পালন-শক্তির আবেশ এবং অনন্তদেবে ভূ-ধারণ-শক্তির আবেশ দৃষ্ট হয়। আবেশে আবেশকাল পর্য্যন্তই ভগবত্তার প্রকাশ থাকে, কিন্তু তদেকাত্মস্বরূপ সর্ব্বদাই ভগবত্তায় পূর্ণ থাকেন।

৭। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাব—

পার্থিব রাজার রাজকার্য্যে যেমন তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাব এবং অন্তঃপুরে নিজ পরিবারগণের মধ্যে তাঁহার মাধুর্য্যভাব প্রকাশ পায়, তেমনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রাজা শ্রীভগবানেরও ঐশ্বর্য্যভাব ও মাধুর্য্যভাব উভয়ই তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান। রাজা যখন রাজবেশে রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজ-কার্য্য পরিচালনা করেন, তখন প্রজাবর্গ নানা অভাব অভিযোগ লইয়া স-সম্ভ্রমে রাজসমীপে উপস্থিত হয় এবং করযোড়ে রাজার স্তুতিগান করিতে থাকে। সব দেখিয়া শুনিয়া রাজা তাঁহাদের বিচার করেন এবং যাহাকে যাহা দিবার, তাহাই দেন। প্রজাবর্গ প্রকৃতপক্ষে রাজাকে চায় না, তাহাদের দৃষ্টি শুধু রাজার ঐশ্বর্য্যের দিকেই থাকে।

রাজকার্য্য শেষ করিয়া রাজা আবার যখন অন্তঃপুরে যান, তখন আর তাঁহার রাজবেশ থাকে না, কেহই আর তাঁহার স্তুতিগান করে না। রাজ-অন্তঃপুরে অভাব-অভিযোগ জানাইবার ঘটা নাই, 'দেহি, দেহি'-রবও সেখানে নাই। সেখানে আছে শুধু স্নেহজড়িত আদর, আব্দার ও অনাবিল ভালবাসা। অন্তঃপুরের নিজজন রাজার নিকটে কিছুই চায় না, তাহারা চায় শুধু রাজাকেই। রাজার সেবা যত্ন করিয়াই তাহাদের

তৃপ্তি, তাহাদের শাশ্বত আনন্দ। তাহাদের কিছুরই অভাব থাকে না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজা তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, তিনি সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বাশ্রয়, সন্তুষ্ট হইলে তিনি জীবের নিখিল বাসনা পূর্ণ করেন—ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি ভাব। তিনি আবার স্বীয় অসমোর্দ্ধরস-মাধুর্য্যে জীবকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে নিতান্ত আপনার জন করিয়া লয়েন—ইহাই তাঁহার মাধুর্য্যভাব। এই মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার। (চৈঃ চঃ ২।২১।৯২)। জীব সাধারণতঃ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যেরই পূজা করিয়া থাকে। ভগবৎ-আরাধনা তাঁহাদিগের নিকট সাংসারিক বা স্বর্গীয় সুখলাভের একটা উপায়মাত্র। তাঁহারা কেবল ঐশ্বর্য্যই চাহেন, শ্রীভগবান্কে তাঁহারা চাহেন না। সে কারণে তাঁহারা শ্রীভগবানের রসমাধুর্য্যপূর্ণ হৃদয়ের সংবাদ লইবার অবসর পর্য্যন্ত পান না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্ত শ্রীভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে করেন এবং স্বসুখবাসনা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত শ্রীভগবানের উপাসনা ও পূজা করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রেম শিথিল হয় বলিয়া পূর্ণমাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তের পূজায় প্রীতিলাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত। আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি, না হই অধীন॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।১৬-১৭)।

মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের দিকটা জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন। পরম কারুণিক গৌরহরি সকলকে জানাইলেন—কোটিকন্দর্প-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রূপমাধুর্য্যের তুলনা নাই। "সে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥" (চৈঃ চঃ

২।২১।৮৪)। পতিতপাবন গৌরাঙ্গসুন্দর সকলকে দেখাইলেন—মদন-মোহন শ্যামসুন্দরে সকল সৌন্দর্য্যের ও সকল মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, সকল শান্তির ও সকল চরিতার্থতার তিনি অফুরন্ত ভাণ্ডার। দীনদয়াল গৌরহরি নিজে আচরিয়া জীবকে শিখাইলেন—অখিল রসামৃতসিন্ধু প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া জীব তাঁহার অসমোর্দ্ধ রসমাধুর্য্যের আস্বাদন লাভ করিতে পারে।

প্রাচীন কাল হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বীগণ সীতা-রাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ বা অপর কোনও নামে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। মধ্যযুগে এই বৈষ্ণবধর্ম্ম রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের দ্বারা ভারতের দক্ষিণে পুষ্টি লাভ করে। তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপূজারই বিধি দিয়াছেন। এইরূপে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের দিকটাই জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত হইত। কিন্তু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের কণাটী পর্য্যন্ত যে মাধুর্য্য-মণ্ডিত, তাঁহার নামাভাসেই যে জীবের সকল পাপ-তাপ দূর হইয়া যায় —শ্রীভগবানের এই মাধুর্য্যের দিকটা জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। শ্রীভগবানের এই মাধুর্য্যভাব শিক্ষা দিয়া এবং প্রেমের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সমগ্র ভারতকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন।

নন্দ-যশোদা পুত্রভাবে, সুবলাদি ব্রজবালকগণ সখ্য ভাবে, রাধিকাদি গোপীগণ কান্তাভাবে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন নাই, তাঁহাদের হৃদয় সদাই মাধুর্য্য-প্রেমে পরিপূর্ণ থাকে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যভাব হৃদয়ে জাগিলে, তাঁহার সহিত একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত মধুরভাবে হৃদয় ভরিয়া থাকিলে শ্রীভগবান্ একজন নিতান্ত আপনার জন হইয়া যান। মমতার আধিক্যই ঘনিষ্ঠতার হেতু। শ্রীভগবানে মমতাবুদ্ধি থাকিলে তাঁহার সহিত এমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে যে তাঁহার অভাবে প্রাণ

অভিভূত হইয়া পড়ে। প্রেমানন্দময় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনই এইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা শুদ্ধা প্রেমভক্তির ভিখারী। তিনি এমন প্রেম চাহেন, যাহাতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বা স্বসুখবাসনার লেশমাত্র থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যাচিয়াই এইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের অধীন হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধাভক্তি। আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন। সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।১৯-২০)।

প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্ত ঐহিক সুখ সম্পদ প্রার্থনা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ সেবাকেই তিনি পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। ইহা যে সেই চির-সুন্দরের জন্য, চির-বাঞ্ছিতের জন্য, চির-প্রিয়তমের জন্য প্রাণঢালা মধুময় প্রেমসেবা। ভক্তবৎসল প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ যাচিয়াই এইরূপ প্রেমিক ভক্তের প্রেমাধীন হইয়া থাকেন। তিনি যে প্রেমিক ভক্তের প্রেমাধীন না হইয়া থাকিতেই পারেন না। ভক্তই যে তাঁহার প্রাণ, ভক্তই যে তাঁহার সব। ভক্ত যে তাঁরই, তিনি যে ভক্তেরই। বিশুদ্ধ প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার একজন নিতান্ত আপনার জন। এইরূপে প্রেমিক ভক্ত স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভিখারীরূপে, অচ্যুত সখারূপে, বাধ্যবাধ্য চিরসাথী রূপে পাইয়া এবং সেই চিরসুন্দর প্রেমময়ের জন্য যথাসর্বস্ব অর্পণ করিয়া চিরতরে তৃপ্ত ও ধন্য হইয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিকধর্ম্ম

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য—এই পঞ্চবিধ বৈদিকধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত। বিষ্ণুর উপাসককে **বৈষ্ণব,** শক্তির উপাসককে **শাক্ত,** শিবের উপাসককে **শৈব,** সূর্য্যের উপাসককে **সৌর** এবং গণপতির উপাসককে **গাণপত্য** বলা হয়। এইরূপে উপাসনাপদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও, সকলেরই উপাস্য সেই একজন, যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্ববিষয়ে সকলেরই কর্ত্তা। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন নামে সেই একজনেরই উপাসনা করেন। সেই সর্ব্বগত-সর্ব্বময়-উপাস্য এক ভিন্ন দুই বা ততোধিক হইতে পারেন না। সেই এক ও অদ্বিতীয়ের চক্ষে শুধু হিন্দু কেন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই, এমন কি কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমান। সকলেই সেই একেরই স্নেহে সমভাবে পরিচালিত ও প্রতিপালিত হইতেছেন।

১। বৈষ্ণব সম্প্রদায়—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রধান ও প্রবল ছিল—যথা, **রামানুজী** বা শ্রী-সম্প্রদায়, **মধ্বাচারী** বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, **বিষ্ণুস্বামী** বা রুদ্র-সম্প্রদায় এবং **নিম্বার্ক** বা সনক-সম্প্রদায়। শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী রামানুজ স্বামীকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনকাদি চতুঃসন নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কাচার্য্যকে অঙ্গীকার করিয়া ভূমণ্ডল পবিত্র করেন। এতদ্ভিন্ন যত সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, তাহারা এই চারি প্রধান সম্প্রদায়ের কোনও একটীর অন্তর্ভুক্ত বা শাখাস্বরূপ। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজী বা শ্রী-সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রধান। রামানুজ স্বামী এই শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রামানন্দস্বামী প্রবর্ত্তিত **রামাৎ-সম্প্রদায়** রামানুজ

সম্প্রদায়েরই একটী শাখা। মধ্বাচার্য্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং নিম্বার্কাচার্য্য সনৎ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। **বল্লভাচারী সম্প্রদায়** বিষ্ণুস্বামী বা রুদ্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কথিত আছে, বেদভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়ের সারমর্ম প্রচার করেন। পরে মহাপ্রভুর সম-সাময়িক বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়া বল্লভাচারী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় গুরু প্রণালীর একত্ব নিবন্ধন মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তত্ত্বাংশে বা সাধ্য-সাধনাংশে উভয়ের মধ্যে বহু বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুর লৌকিক দীক্ষাগুরু।

২। বিভিন্ন মতবাদ—

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড—এই তিন ভাগে ইহা বিভক্ত। জ্ঞান কাণ্ডে ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদের এই জ্ঞান কাণ্ডের নাম **উপনিষদ।** বেদের অন্তে স্থাপিত বলিয়া উপনিষদের আর একটী নাম **বেদান্ত।** বেদান্তের অসংলগ্ন ভাবধারাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে সুসজ্জিত করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। স্বল্পাক্ষরে রচিত হওয়ার ফলে, ব্রহ্মসূত্রে নিহিত ব্রহ্মের সুগভীর তত্ত্ব দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। পরে শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ মনিষীগণ দুর্বোধ্য ব্রহ্মসূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া প্রত্যেকে ভাষ্য রচনা করেন এবং প্রত্যেকেই নিজভাষ্যে নিজ **মতবাদ** প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্থানীয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা উপনিষদেরই সংক্ষিপ্ত সার। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাকে একত্রে **প্রস্থানত্রয়** বলা হয়। নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ মনিষীগণ এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করেন।

ভাষ্যকারগণ সকলেই স্বীকার করেন যে ব্রহ্মই জগৎ-সৃষ্টির কারণ, কিন্তু এই সৃষ্টির সহিত ব্রহ্মের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা লইয়াই বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের একত্বকে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া তাঁহার **অদ্বৈতবাদ** অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই —এই দার্শনিক মত প্রচার করেন। রামানুজ ও বল্লভাচার্য্য উভয়েই অদ্বৈতবাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে রামানুজের **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ** এবং বল্লভাচার্য্যের **বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ** প্রসিদ্ধি লাভ করে। মধ্বাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া এবং ব্রহ্মের বহুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া তাঁহার **দ্বৈতবাদ** প্রচার করেন। নিম্বার্কাচার্য্য দ্বৈতবাদের প্রাধান্য স্বীকার করেন বটে, কিন্তু অদ্বৈতবাদকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নাই। সে কারণে নিম্বার্কের মতকে **দ্বৈতাদ্বৈতবাদ** বলা হয়।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় যদি এক বস্তু পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়া অপর বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় তবে তাহার নাম **বিবর্ত্ত** বা ভ্রম। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বের কোনও অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মের মায়ানাম্নী মোহিনী শক্তির প্রভাবে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় জীব এই বিশ্বভ্রম দেখিতেছে। তাঁহাদের মতে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়ারই খেলা, ইহা জীবের চোখে দেখার ভুল। মায়ার প্রভাবেই জীব 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মকে জাগতিক বহু আকারে দেখিয়া থাকে। ব্রহ্মে জগৎভ্রমই শঙ্করাচার্য্যের **বিবর্ত্তবাদ।**

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—এই বিশ্ব প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে। ইহার অস্তিত্ব আছে, তবে ইহা বিনাশশীল। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি উপনিষদ বাক্যে (৩০ পৃষ্ঠা দেখ), বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা আছে। বিশ্বের অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় থাকিতে পারে না। দেহাদিতে বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত উপনিষদে

বিবর্ত্তবাদের উল্লেখ দেখা যায়। আত্মজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানান্ধ জীব নশ্বর দেহকেই অবিনশ্বর আত্মা বলিয়া মনে করে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অনাত্মদেহে এই যে আত্মবুদ্ধি, ইহাই উপনিষদের **বিবর্ত্তবাদ**।

শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করেন না। তিনি মায়াদাস জীবকে মায়াকর্ত্তা ব্রহ্মের সহিত অভেদ মনে করেন। তাঁহার মতে মায়া অন্তর্হিত হইলে জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ থাকিবে না। **বৈষ্ণবাচার্য্যগণ** বলেন—মায়ামুক্ত জীবের পক্ষে, অগ্নি-সংযোগে লৌহের অগ্নিময় হওয়ার ন্যায়, তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু জীব কখনও ব্রহ্ম বা মায়ার অধীশ্বর হইতে পারিবে না। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। মুক্তাবস্থায় ঈশ্বরের সহিত জীবের সেব্য-সেবক-ভাব বিদ্যমান থাকে। সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়া জীব ভগবৎ-বিগ্রহে প্রবেশ করিলেও, জীব তাঁহার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায় না। তখনও জীব জীবই থাকে। ঈশ্বর অগ্নিস্থানীয়, আর জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গস্থানীয়, ঈশ্বর বিভু-চৈতন্য আর জীব অণু-চৈতন্য, ঈশ্বর মায়াধীশ আর জীব মায়াধীন। সুতরাং বিন্দু যেমন কখনও সিন্ধু হইতে পারে না, তদ্রূপ জীব মায়ামুক্ত হইলেও তাহার পৃথক সত্ত্বা বিদ্যমান থাকিবে। ঈশ্বরের ন্যায় সে কখনও মায়ার অধীশ্বর বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা হইতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"জীব আমারই সনাতন অংশ।" (গীতা ১৫।৭)। জীবকে ঈশ্বরের তটস্থা-শক্তি বলা হয়। সূর্য্যকিরণকে যেমন সূর্য্য বলা যায় না, অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে যেমন অগ্নি বলা যায় না, সমুদ্র-তরঙ্গকে যেমন সমুদ্র বলা যায় না,—জীবকেও তেমনি ব্রহ্ম বলা যায় না। জীব ও ব্রহ্মে অভেদ করিয়া জীবকে ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্ম-মহিমার হানি হয়।

বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম **পরিণাম**—যেমন মৃত্তিকার পরিণাম কুম্ভ বা ঘট ও সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল। মৃত্তিকা যেমন কুম্ভে পরিণত

হয়, ব্রহ্মও তেমনি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের পরিণতি—ইহার নাম **পরিণামবাদ**। পরিণামবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্ম বা ভগবানই স্ব-ইচ্ছায় বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং এই বিশ্ব প্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না। স্যমন্তক-মণি যেমন প্রত্যহ স্বর্ণভার প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে, সেইরূপ পরিণামী শ্রীভগবান্ স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, সর্ব্বাবস্থায় তিনি অবিকৃত থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক **শ্রীমন্মহাপ্রভু** মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিয়া **অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ** প্রচার করেন। অনন্ত কোটি জীব শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু জীবে ও ভগবানে কোনও ভেদ নাই। আবার শ্রীভগবান বিভুচৈতন্য ও জীব অণুচৈতন্য—সুতরাং শক্তিবিকাশের বিভিন্নতা হেতু জীবে ও ভগবানে ভেদও আছে। সূর্য্যের সহিত সূর্য্য-কিরণের অথবা অগ্নির সহিত অগ্নি-কণার যেরূপ ভেদাভেদ, ইহাও তদ্রূপ। অগ্নির আংশিক প্রকাশরূপ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বা অগ্নিকণা যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি নহে, আবার অগ্নি-অংশে তাহা হইতে ভিন্নও নহে,—সেইরূপ জীবের সহিত শ্রীভগবানের শক্তি-অংশে ভেদও আছে, আবার চৈতন্য-অংশে অভেদও আছে। জীব প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের ভেদাভেদ প্রকাশ—অভেদের মধ্যেই ভেদের প্রতিষ্ঠা, আবার ভেদের মধ্যেই অভেদের প্রতিষ্ঠা। এই ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান থাকা চিন্তার অতীত বলিয়া ইহাকে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ বলা হয়। এইরূপে মহাপ্রভু দ্বৈতবাদের ও অদ্বৈতবাদের মহা-সমন্বয় করিয়াছেন।

৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়—

শ্রুতি যাঁহাকে **'রসো বৈ সঃ'** বলিয়াছেন, সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মই হইলেন দ্বিভুজ মুরলীধর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই আবার গৌরলীলায়

রসরাজ-মহাভাব-মিলিত তনু শচীনন্দন গৌরহরি। প্রেমরসের মূর্ত্তবিগ্রহ শচীসুত গৌরহরিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ের মতে, গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরই স্বয়ং ভগবান্, আর লক্ষ্মীপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি। রসিক-শেখর শ্যামসুন্দর শুধু রসস্বরূপ নহেন, তিনি আবার আনন্দঘনবিগ্রহ। পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে জীব পরমানন্দ ভোগ করিতে পারে। চির প্রেমময়, চির রসময়, চির আনন্দময় স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সকল ভোগের ভিতর দিয়া উপভোগ করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরম সম্ভোগ। এই রস-ভোগের যে পথ প্রেমিক কবি জয়দেব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনগণ তাহারই পুষ্টি সাধন করেন। ইহাঁরাই প্রকৃতপক্ষে প্রেমভক্তিধর্ম্মের অগ্রদূত। ইঁহারা কিন্তু এই প্রেমসুধা পান করিয়া কেবল নিজেরাই পরিতৃপ্ত ও ধন্য হইয়াছিলেন। প্রেমাবতার মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে চিরমধুর এই প্রেমের ধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তিনি নিজে আচরিয়া জীবকে শিখাইলেন—সকল ভোগের ভিতর দিয়া সেই নিখিল রসময় বিগ্রহ মুরলীবদন শ্যামসুন্দরের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় এবং কঠিন তপস্যালভ্য সেই দূরের দেবতাকে প্রেমভিখারীরূপে, নিকট আত্মীয়রূপে, ব্যথার ব্যথী চিরসাথীরূপে পাইয়া গার্হস্থ্য-জীবনকে মধুময় ও ধন্য করা যায়।

মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীকে প্রেমভক্তি ধর্ম্মের আদি-প্রচারক বলা হয়। তাঁহারই কৃপায় এবং অদ্বৈতপ্রমুখ তদীয় বহু শিষ্যগণের যত্নে একটী ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের পসরা মাথায় লইয়া নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রেমভক্তিরসে সমগ্র ভারত প্লাবিত করিয়া স্বীয় জন্মভূমিকে গৌরব-মণ্ডিত এবং ভারত ভূমিকে পবিত্র করিলেন। প্রেমাবতার গৌরহরি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

পর্য্যন্ত সকল জাতির মধ্যে তাঁহার প্রেমের ধর্ম্ম ও শ্রীনামের মহিমা সমভাবে প্রচার করিয়া আচণ্ডাল নরনারীকে প্রেম ও ভক্তিপথে আনয়ন করেন। অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহকারী। ক্রমে ক্রমে বহু শিষ্যপ্রশিষ্যগণের যত্নে মহাপ্রভুর এই প্রেমের ধর্ম্ম সর্ব্বদেশ-ব্যাপী হইয়া পড়ে।

মহাপ্রভুর মতে গোপীজনবল্লভ শ্যামসুন্দরই একমাত্র আরাধ্য, কল্পবৃক্ষাদি শোভিত শ্রীবৃন্দাবনই তাঁহার প্রিয় ধাম এবং ব্রজগোপীগণের আনুগত্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। মহাপ্রভুর মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ **গৌড়ীয়-বৈষ্ণব** নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব মহাপ্রভু নামে এবং অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ উভয়েই **প্রভু** নামে অভিহিত হন। এই সম্প্রদায় মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করেন। সমর্থপক্ষে, মহাপ্রভুর অভিন্ন স্বরূপ নিত্যানন্দপ্রভুর ও অদ্বৈতপ্রভুর পূজারও ব্যবস্থা আছে। অদ্বৈতপ্রভু হইলেন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞানাংশ এবং নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দাংশ। মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু—এই তিন প্রভুর সহিত গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে লইয়া **পঞ্চতত্ত্ব** হয়। পঞ্চতত্ত্ব মহাপ্রভুরই অভিন্ন স্বরূপ—তন্মধ্যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব মহাপ্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দই **প্রকাশ বা বিলাস তত্ত্ব,** মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য **অবতার তত্ত্ব,** মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গা শক্তি গদাধর পণ্ডিত **শক্তিতত্ত্ব** এবং প্রধান ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত **ভক্তিতত্ত্ব।** ভক্ত ভাবে মহাপ্রভুর সহিত অভিন্ন রূপে মিলিত যে তত্ত্ব তাহাই পঞ্চতত্ত্ব। বর্ত্তমান কলিযুগে এই পঞ্চতত্ত্ব ভক্তরূপাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। **ভক্তরূপে** স্বয়ং মহাপ্রভু, **ভক্তস্বরূপে** নিত্যানন্দ প্রভু, **ভক্তাবতাররূপে** অদ্বৈতপ্রভু, **ভক্তাখ্য** রূপে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এবং **ভক্তশক্তিক** রূপে গদাধর—এইরূপে

পঞ্চতত্ত্ব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া একত্রে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গ করিতেন। সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত অদ্বয়তত্ত্ববস্তুই পঞ্চতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুর ছিলেন শ্রীনাম-কীর্ত্তনের মূর্ত্তবিগ্রহ স্বরূপ আর শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপাল ভট্ট-দাস রঘুনাথ—এই ছয় গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা শ্রীনামমাহাত্ম্য, সনাতন গোস্বামীর দ্বারা ভক্তি বিষয়ক সুসিদ্ধান্ত এবং রূপ গোস্বামীর দ্বারা ব্রজের প্রেম ও লীলা মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন।

তৎকালে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাসভূমি শ্রীবৃন্দাবনের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র তখন বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং তীর্থস্থানের চিহ্নাদি বিলুপ্তপ্রায়। শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ভক্তবৎসল মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে বৃন্দাবনের জঙ্গলে পাঠাইয়া দেন। পরে তিনি স্বয়ং তথায় যাইয়া শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন। অতঃপর রূপ-সনাতন দুই ভাই মহাপ্রভুর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, মহাপ্রভুরই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহারা বহু বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং শাস্ত্র দৃষ্টে লুপ্ততীর্থ সকল প্রকট করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গিরি গোবর্দ্ধনের উপরিভাগে গোপালদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সনাতন গোস্বামী মথুরার চৌবেদ গৃহ হইতে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ আনিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করেন এবং রূপগোস্বামী স্বপ্নাদেশে গোবিন্দকুণ্ড হইতে শ্রীবজ্রনাভের স্থাপিত বৃন্দাবনের রাজা শ্রীগোবিন্দ দেবকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর গোপালভট্ট কর্ত্তৃক শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ এবং শ্রীজীবগোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীরাধা-দামোদর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য শ্রীবিগ্রহের মধ্যে শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীগোবিন্দ,

শ্রীসনাতনগোস্বামীর শ্রীমদনমোহন এবং শ্রীমধু পণ্ডিতের শ্রীগোপীনাথ সর্ব্বপ্রধান। এই তিন ঠাকুরই গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবের সেবা গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়াকেই সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্ম মহাপ্রভুর আদেশে প্রথমে কাশীবাসী তপনমিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, তৎপরে শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বেঙ্কটভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর তাঁহার বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব বৃন্দাবনে আসিলেন। এই ছয় গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধার করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন, শ্রীমন্দির গঠন ও বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রধান প্রধান ভক্তিগ্রন্থের মধ্যে শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃহৎ-ভাগবতামৃত, বৈষ্ণব-তোষণী টীকা ও হরিভক্তিবিলাসের টীকা; রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব প্রভৃতি এবং জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ, মাধব-মহোৎসব, ক্রমসন্দর্ভ টীকা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাক্তগণের যেমন রঘুনন্দনের স্মৃতি, হরিভক্তিবিলাসও তেমনি বৈষ্ণবগণের স্মৃতি, বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সদাচার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সনাতন গোস্বামীর নিকটে তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া শ্রীপাদ গোপালভট্ট এই বৈষ্ণবস্মৃতি প্রকাশ করেন।

ভক্তি বলিতে শ্রীভগবানে প্রগাঢ় অনুরাগ বুঝায়। এই ভক্তিবাদ লইয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ সীমা এবং জ্ঞানশূন্যা ভক্তি লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত রাজ্যের আরম্ভ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—শ্রীভগবান্‌কে প্রভু, সখা, সন্তান বা পতিরূপে ভাবনা করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। মধুর বা কান্তাভাবে সাধনাই শ্রীমদ্ভাগবতরাজ্যের শেষ সীমা। ইহার পর ত্রিজগতে অতুলনীয় **রাধাপ্রেম**—লজ্জা, মান, কুল, জাতি, সমাজ,

আত্মীয়, স্বজন, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ এবং সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়ের সম্যক তৃপ্তি সম্পাদন। মহাপ্রভু এই রাধাভাবের উপাসক ছিলেন। রাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি তাঁহার **গম্ভীরালীলায়** শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও অনুরাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। রাধাপ্রেম যে কি বস্তু, তাহাতে যে কি উন্মাদিনী শক্তি নিহিত আছে, মহাপ্রভু নিজে আচরিয়া তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ (মতান্তরে নরহরি সরকার ঠাকুর) গাহিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হৈত, কেমনে ধরিত দে। রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে ?"

পূর্ব্বে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে **বেদশাস্ত্র** প্রেমভক্তিধর্ম্মের বিরোধী। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও সর্ব্বজনপূজ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী উভয়েই সে কারণে মহাপ্রভুর নাচন-গায়ন পছন্দ করিতেন না। নীলাচল ধামে সার্ব্বভৌমের সহিত এবং বারাণসী ধামে প্রকাশানন্দের সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া মহাপ্রভু প্রমাণ করিলেন যে বেদ তাঁহার ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী নহেন, বরং পক্ষপাতী। তদবধি তাঁহারা দু'জনেই মহাপ্রভুকে স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তদবধি তাঁহারা মহাপ্রভুর শ্রীচরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইলেন।

প্রেমভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই এই প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন। ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলের অপেক্ষা করে না। এই সম্প্রদায়ের মতে, যবন হউক, বা চামার হউক, যে কেহ হরিভক্ত সেই পূজ্য। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ।" অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। নামকীর্ত্তনের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ হরিদাস ঠাকুর জাতিতে যবন হইয়াও সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি নশ্বর ভৌতিক দেহ ত্যাগ

করিলে, মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার শবদেহ কোলে তুলিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যবন ও ম্লেচ্ছজাতির অনেকে এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব-ভক্ত হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ে যোগ্য ব্যক্তিমাত্রই পূজ্য —"সেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয়।" নরোত্তম দাস ঠাকুর ছিলেন জাতিতে কায়স্থ এবং শ্যামানন্দ ঠাকুর ছিলেন সদ্‌গোপ। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ভুঁইমালি ঝড়ু ঠাকুরের প্রসাদ উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণবেরাও ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। রুইদাস মুচি, মুরারিদাস চামার, কানা হাড়ি, সজন কসাই প্রভৃতি অনেকে বৈষ্ণব হইয়া সকলের পূজ্য হইয়াছিলেন।

নীলাচলে কুলীনবাসিগণের প্রশ্নের উত্তরে পর পর তিন বৎসরে মহাপ্রভু বৈষ্ণব লক্ষণের ক্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিলেন— "যার মুখে একবার হয় কৃষ্ণনাম। সেই **বৈষ্ণব,** করি তারে পরম সম্মান॥" "কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই **বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ,** ভজ তাহার চরণে॥" "যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাহারে জানিহ তুমি **বৈষ্ণব-প্রধান॥"** (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ)। একবার কৃষ্ণনামে **বৈষ্ণব,** নিরন্তর কৃষ্ণনামে **বৈষ্ণবতর,** আর যাঁহাকে দেখিলেই মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তিনি **বৈষ্ণবতম**।

প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্তের স্বভাব এই যে তিনি সর্ব্বোত্তম হইয়া নিজকে নিতান্ত হীন বা অধম বলিয়া মনে করিবেন। যবন রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সনাতন গোস্বামী উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও দৈন্যবশতঃ নিজকে হীন অস্পৃশ্য যবনদাস বলিয়া মনে করিতেন। নীলাচলে অবস্থান কালে তিনি শ্রীমন্দিরের নিকটে যাইতেন না। দূর হইতেই তিনি শ্রীমন্দিরের চক্রদর্শন করিয়া প্রণাম করিতেন। তাঁহার এইরূপ দৈন্য ও মর্য্যাদাজ্ঞান দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন। তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব—মর্য্যাদা রক্ষণ। মর্যাদা-রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ॥"
(চৈঃ চঃ ৩।৪।১২৪-৫)। অলঙ্কারের দ্বারা যেমন দেহের শোভা বৃদ্ধি পায়, মর্য্যাদারক্ষণে তেমনি ভক্তের শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি পায়।

এই সম্প্রদায়ে স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ও কৃষ্ণ-দ্বেষীর সঙ্গ বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। মহাপ্রভু নিজে স্ত্রীলোকের ছায়াস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। প্রকৃতি সম্ভাষণ করার অপরাধে তিনি তাঁহার প্রিয় ভক্ত ছোট হরিদাসকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মহামুনির মন॥" (চৈঃ চঃ ৩।২।১১৬-১৭)। তাই বলিয়া মহাপ্রভু নারীজাতিকে ঘৃণা করিতেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে সংসার ত্যাগের বা প্রবৃত্তি ধ্বংসের প্রয়োজন নাই। বৃত্তিগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের সদ্ব্যবহার করা এবং অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করা বৈষ্ণব ধর্ম্মের **সার উদ্দেশ্য**। অদ্বৈত প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি মহাপ্রভুর মর্ম্মী ভক্তগণ সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেন। প্রিয় ভক্ত ভগবান আচার্য্যকে মহাপ্রভু একবার পত্নী সকাশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রিয় ভক্ত গোবিন্দ ঘোষকে তিনি বিবাহ করাইলেন, এমন কি আজন্ম উদাসীন নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনি সংসারী হইতে আদেশ করিলেন। অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু নিজে গৃহস্থ-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া জগৎকে দেখাইলেন যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী নহে। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। খড়দহের গোস্বামীগণ তাঁহার সন্তান এবং বলাগড়ের গোস্বামীগণ তাঁহার দৌহিত্রসন্তান—কন্যা গঙ্গা মাতুরাণীর বংশধর।

বিষয়ে আসক্তি বা বাসনার নামই সংসার। সাংসারিক কর্ম্ম জীবের বন্ধনের কারণ নহে। বিষয়-বাসনাই সংসার-বন্ধনের ও সকল দুঃখের মূল কারণ। এই বাসনা হইতে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি এবং মন দ্বারা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। সন্ন্যাস বলিতে প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ত্যাগই বুঝায়। এই ত্যাগ গৃহে থাকিয়াও হইতে পারে। বস্তুতঃ অনাসক্ত পুরুষের গৃহ তপোবনতুল্য; আসক্ত পুরুষের গৃহত্যাগ বা সন্ন্যাস-গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। সংসারে কিছুমাত্র আসক্তি থাকা পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া যথাসম্ভব অনাসক্ত ভাবে গৃহীর কর্ম্ম পালন করাই উপদিষ্ট হইয়াছে। চিত্তে বিষয় বাসনা থাকিতে সংসার ত্যাগ করা উচিত নহে। এ সংসার তাঁরই --এই বিশ্বাসে সকল কার্য্যের ফল মন দ্বারা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করাই উচিত। এইরূপ করিতে করিতে চিত্তে বন্ধন-জনিত যন্ত্রণা বোধ হয়। জীব তখন সংসার বন্ধন মোচনের জন্য আকুল হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে তখনই চিত্তে প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মে, ভগবৎকৃপায় তখনই শ্রীভগবানে অনুরাগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সংসার অসার, সংসারে প্রকৃত সুখ নাই। আপাত রমণীয় কামিনী-কাঞ্চনময় সংসারসুখ পরিণামে দুঃখরূপে পরিণত হয়। বৈরাগ্য দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া এবং সকল বাসনাই ভগবৎ-মুখী করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসার ধর্ম্ম পালন করাই উচিত। আজন্ম উদাসীন বালক রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর নিকটে সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥" (চৈঃ চঃ ২।১৬.২৩৬)। যাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মহাপ্রভু সর্ব্ববিধ ভোগ ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন। শাক পত্র ফল মূলে

উদর ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" (চৈঃ চঃ ৩।৬।২২৪-২৫)।

রাগ বলিতে প্রিয় বস্তুতে আসক্তি এবং **দ্বেষ** বলিতে অপ্রিয় বস্তুতে বিরক্তি বুঝায়। অনাদিকাল হইতে জীবের হৃদয় রাগ ও দ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই সংসার ক্ষেত্র রাগ-দ্বেষেরই বিলাসভূমি। জীবের এই যে আবশ্যক-অনাবশ্যক-বোধ, লাভ-ক্ষতির ধারণা, সুবিধা-অসুবিধার বিচার ইহাদের সকলের মূলে থাকে রাগ ও দ্বেষ। রাগ-দ্বেষ দূর করিবার সহজ উপায় হইল **শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন**। শ্রীনামের প্রভাবে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, আর বিশুদ্ধ চিত্তে রাগ-দ্বেষ স্থান পায় না। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সাধন।

যাঁহারা সংসারে অনুরক্ত তাঁহাদের জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বহিরঙ্গ সাধন, আর সংসার-বিরক্তের জন্য **অন্তরঙ্গ সাধন** সম্বন্ধে মহাপ্রভু সর্ব্বত্যাগী রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—"গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" (চৈঃ চঃ ৩।৬।২৩৪-৫)। ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত আর সমস্তই গ্রাম্য কথা। গ্রাম্য কথায় চিত্ত ভগবৎ বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে এবং ভাল খাদ্য ও পরিচ্ছদে মন দৈহিক সুখের দিকেই ধাবিত হয়। তাই মহাপ্রভু এই সকল বিষয়ে সাবধান হইতে বলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রাকৃত লোকগণ ও অপরের **মুখাপেক্ষা** ত্যাগ করাই উপদিষ্ট হইয়াছে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥" (চৈঃ চঃ ৩।৩।২০) তিনি আরও বলিয়াছেন—"বৈরাগী হৈয়া যেবা করে মুখাপেক্ষা। কার্য্য সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥" (চৈঃ চঃ ৩।৬।২২২)। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের

উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চনের বেশ ধারণ করিয়াছেন, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে অর্থাৎ যে কোনও বিষয়ে অপরের উপর নির্ভর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। না চাহিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসিয়াছেন, আশ্রিত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সকল অভাব দূর করিয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"অনন্যচিত্ত ও নিত্যযুক্ত উপাসকের যোগ-ক্ষেমের ভার আমি বহন করি।" (গীতা ৯।২২)। যোগ অর্থে উপার্জ্জন এবং ক্ষেম অর্থে রক্ষণ। ভক্তের যোগক্ষেমের ভার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেন। যাঁহার শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা নাই, নিজ ভরণপোষণের জন্য যিনি অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। সেরূপ সাধকের পক্ষে ভজন-সাধন পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। তাঁহার সংসার ত্যাগ করা বিড়ম্বনামাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ **বিষয়ীর অন্ন** গ্রহণ করিতে মহাপ্রভু নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ (চৈঃ চঃ ৩।৬।২৭৩)। দম্ভঅহঙ্কারাদি-পূর্ণ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মন নানাবিধ দুর্ব্বাসনায় মলিন হইয়া থাকে। তাঁহাদের মনের সেই দূষিত ভাব সমূহ তাহাদের দ্রব্যে সংক্রামিত হইয়া সেই দ্রব্যকেও দূষিত করিয়া ফেলে। দাতার দূষিত ভাবসমূহ তৎপ্রদত্ত দ্রব্যে সঞ্চারিত হয় বলিয়া, সেই দূষিত দ্রব্য যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার চিত্তও মলিন হইয়া যায়। তখন সেই মলিন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি স্ফুরিত হইতে পারে না।

৪। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-লীলাদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত বা গীত হইলে তাহাকে **কীর্ত্তন** আর সেই কীর্ত্তন বহুজনকর্ত্তৃক গীত হইলে তাহাকে সঙ্কীর্ত্তন বলা হয়। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ভগবদুপাসনার কথা প্রাচীনতম ঋগ্বেদ সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে। "আস্য জানন্তো নামচিদ্বিবক্তন (১ মণ্ডল, ২১ অনুবাক, ১৫৬ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)—অর্থাৎ হে শ্রোতৃমণ্ডলি! অস্য (ইঁহার) নাম চিৎ জানন্তঃ (শ্রীবিষ্ণু এই নাম যে সর্ব্ব পুরুষার্থপ্রদ—ইহা জানিয়া) আ (সর্ব্বতোভাবে ! বিবক্তন (সঙ্কীর্ত্তন কর)। প্রকৃত পক্ষে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, ইহাই ভবসংসারপারের একমাত্র উপায়। কলিযুগ নানা দোষের আকর হইলেও তাহার একটা মহাগুণ এই যে কলিযুগে একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি ও পরমপদ লাভ হয়। সত্য যুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যার দ্বারা যেরূপ ফল লাভ হয় কলিযুগে একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তদধিক ফললাভ হইয়া থাকে। সেকারণে দেবতারাও কলির জীবের সৌভাগ্য কামনা করেন। কলিকালে অল্পপ্রাণ জীবের পক্ষে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের তুল্য আর কিছুই নাই। সঙ্কীর্ত্তনকালে শ্রীনাম জিহ্বায় নৃত্য করে এবং মনোমধ্যে বিহার করে। আবার সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কে কৃতার্থ করিয়া চিত্তবিক্ষেপ দূর করে এবং সেই সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দের এমন কি ইতর প্রাণীগণেরও মঙ্গল সাধন করে। কলিকালে ধ্যান-ধারণাদি সুসম্পন্ন হওয়া বড়ই কঠিন। নির্জ্জন না হইলে ধ্যান-ধারণাদি কদাপি সিদ্ধ হয় না, কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীনামের এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে সম্যক ফল প্রদান করিতে ইহা দীক্ষা বা পুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা করে না। (চৈঃ চঃ ২।১৫।১০৯.

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন —"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" যিনি নিখিল জীবের পাপ-তাপ হরণ করেন তিনিই **হরি**। প্রকৃত পক্ষে, যিনি যে দেবতার উপাসক, সেই দেবতাই তাঁহার পক্ষে 'হরি'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে শ্রীহরি বলিতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্বরূপকেই বুঝায়। হরি নামে পাতকী উদ্ধার হয়—ইহা বস্তুগুণ। শিশুর ন্যায় সরল চিত্তে ভক্তির সহিত হরিনাম করিলে জীবের সকল বিঘ্ন, সকল দুঃখ, সকল পাপ দূর হয়। কলিযুগে হরিনামই সার, কলিযুগে হরিনাম বিনা জীবের আর অন্য কোনও গতি নাই। পুরাণোক্ত শ্লোকটীতে ইহাই ঘন-গম্ভীর স্বরে ত্রিসত্য করিয়া ঘোষিত হইল। "কলিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম যত পাপ হরে। জীবের সাধ্য কি, তত পাপ করে ॥" কলিযুগে শ্রীনামই চিন্তামণি, শ্রীনামই সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ। শ্রীনামের অনন্ত মহিমা নানাভাবে কীর্ত্তন করিয়া প্রেমভক্তির সুবিমল প্রবাহে বৈষ্ণবসাহিত্য পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে।

দ্বিজ হরিদাস গাহিয়াছেন,—"নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার। অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥ শতভার সুবর্ণ-গোকোটি কন্যা দান। তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান ॥ যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥" (শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম)। শ্রীনাম দ্বারা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয়, তাঁহাকে **নামী** বলে। নাম ও নামী অভিন্ন, তাই নামের এত শক্তি, নামের এত মহিমা। শ্রীনামকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান করিয়া শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধনা। কলিক্লিষ্ট দুর্ব্বল অল্পায়ু জীবের পক্ষে চিন্তামণি-স্বরূপ শ্রীনামই একমাত্র অবলম্বন। বাহ্য বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া তন্ময়ভাবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের নিখিল বাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়।

"নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি। শ্রীভাগবতে তাঁহা অজামিল সাক্ষী॥" (চৈঃ চঃ ৩।৩।৬০)। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—পুত্রের উদ্দেশ্যে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়া মহাপাপী অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছিল। মায়িক বস্তুর উদ্দেশ্যে, কথাপ্রসঙ্গে, তিরস্কার-ছলে, অবজ্ঞার সহিত বা অন্য যে কোনও প্রকারে গৃহীত ভগবৎ-নামকে **নামাভাস** বলা হয়। নামাভাসেও জীব সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কালদেশ নিয়ম নাই, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" (চৈঃ চঃ ৩।২০।১৪)। শ্রীনাম গ্রহণ সম্বন্ধে দেশ, কাল বা পাত্রের বিচার নাই। হেলায় বা অশ্রদ্ধার সহিত শ্রীনাম গ্রহণ করিলে জীব সংসার-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রারব্ধের ক্ষয় হয় না বা তাহাতে প্রেমলাভ হয় না। ভক্তিপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে ভগবৎকৃপায় প্রারব্ধের ক্ষয় ও প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

দীনদয়াল মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের ভিতর দিয়া নামকীর্ত্তনের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুর ছিলেন নামকীর্ত্তনের মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ। তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ নামকীর্ত্তন করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস—স্থাবর হউক বা জঙ্গম হউক, যে কেহ সুধামাখা নাম শ্রবণ করিবে, সে-ই উদ্ধার হইয়া যাইবে। তিনি বলিতেন—একান্ত মনে নাম-কীর্ত্তন করিলে, শুধু যে পাপ ক্ষয় ও মোক্ষলাভ হয়, তাহা নহে—ইহা প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত আনিয়া দেয়। শ্রীনামের মুখ্য ফল হইল—শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি, পাপক্ষয় ও মোক্ষলাভ ইহার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র।

রসময় নামীর নামে রস সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু নাম করিতে করিতে বিষয়-চিন্তা করিলে নামে রসবোধ হয় না। পিত্তরোগী যেমন

মিছরির মিষ্টত্ব অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ বিষয়াসক্ত জীব নাম-কীর্ত্তনে আনন্দ পায় না। পুনঃ পুনঃ মিছরি সেবনে পিত্তরোগ উপশমিত হইলে মিছরির স্বাভাবিক মিষ্টত্ব যেমন অনুভব করা যায়, তেমনি অনুক্ষণ শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হইলে অমৃতস্বরূপ শ্রীনামের স্বাভাবিক রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া আনন্দলাভ করা যায়। নাম করিবার সময় নামের অর্থ জানিয়া নামীর স্বরূপ চিন্তা করিলে এবং নামীর সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশ্যে নাম করা হইতেছে—সাধকের মনে এইরূপ অনুভূতি থাকিলে, মন স্থির ও শান্ত হইয়া নামীতেই বাঁধা থাকিবে। তখন সাধকের মন আর চিত্তচাঞ্চল্যকর বিষয়ের দিকে যাইতে পারিবে না। পরম শান্ত যিনি, অশান্ত হইয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কিরূপে?

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ ৩।৪।৬৫-৬)। নিরপরাধে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীনামের প্রভাবে প্রেমোদয় হইলে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। তখন গদ্‌গদভাষা, নয়নে অশ্রুধারা, শরীরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি প্রেমের বহির্লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এইরূপ না হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রচুর অপরাধ থাকায় হৃদয়ে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে না। চিত্তের দ্রবত্বই প্রেমের লক্ষণ, কিন্তু অশ্রু-পুলকাদিকে সকল সময়ে চিত্ত-দ্রবের লক্ষণ বলা যায় না। রূপগোস্বামী বলেন—যাঁহারা পিচ্ছিল হৃদয় কিম্বা যাঁহারা অশ্রুপুলকাদির উদ্গম অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তদ্রব না হইলেও বাহিরে অশ্রু-পুলকাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। আবার যাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির ভক্ত, তাঁহাদের চিত্তদ্রব হইলেও বাহিরে অশ্রু-পুলকাদির উদ্গম দেখা যায় না।

সেবাপরাধ ও নামাপরাধ ভেদে অপরাধ প্রধানতঃ দুইপ্রকার। শ্রীভগবানের সেবা বিষয়ে নিষিদ্ধ আচারের অনুষ্ঠান করিলে সেবাপরাধ হয়। ভগবৎসেবা দ্বারাই সেবাপরাধ দূর হইতে পারে। ভক্তিবিঘ্নকারী নামাপরাধ বিশেষতঃ বৈষ্ণবাপরাধ বিষয়ে সাধকের সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত। পদ্মপুরাণে বর্ণিত দশবিধ নামাপরাধ—যথা,

(১) সাধুভক্তের নিন্দা (বৈষ্ণবাপরাধ ইহারই অন্তর্ভুক্ত),

(২) বিষ্ণু ও শিবে পৃথক বুদ্ধি করা অর্থাৎ তাঁহারা স্বতন্ত্র—এইরূপ মনে করা।

(৩) গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি করা বা তাঁহাকে অবজ্ঞা করা,

(৪) বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা করা,

(৫) হরিনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা অর্থাৎ শাস্ত্রবর্ণিত নাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস করা।

(৬) অথবা প্রকারান্তরে, নামে অর্থকল্পনা অর্থাৎ নামের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিয়া কাল্পনিক ব্যাখ্যা দ্বারা নামের কদর্থ করা, যথা-হরি অর্থাৎ হরণকারী চোর ইত্যাদি,

(৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ শ্রীনামের প্রভাবে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে,—এইরূপ বিবেচনা করিয়া পাপে প্রবৃত্ত হওয়া,

(৮) ব্রত-দান-হোমাদি শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদিকে সমান মনে করা,

(৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা,

(১০) নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রীতি করা বা নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব।

জীবমাত্রই সুখ চায়, কেহই দুঃখ চায় না। আনন্দই জীবের প্রিয় বস্তু, কিন্তু বহির্ম্মুখ জীব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারে না—আপাত সুখকর ভোগাদি বাসনা ত্যাগ করিয়া চিত্তকে ভগবন্মুখী করিতে পারিলেই অতুল আনন্দ লাভ করা যায়। ভোগবিলাস ত্যাগ ব্যতীত শ্রীভগবানে অনুরাগ হয় না, আর পরম সুখদ এই অনুরাগ ব্যতীত চিরশান্তি লাভ করা যায় না। মহাপুরুষেরা বলেন—'পেতে যদি চাও হও ত্যাগী।" মন হইতে যাহা ত্যাগ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ত্যাগ। প্রকৃত মনুষ্যত্ব এইরূপ ত্যাগে, ভোগে নহে। সুখস্বরূপ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিলে, অনিত্য বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও নিরবচ্ছিন্ন সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ("যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২৩)। যিনি পরমানন্দস্বরূপ ভূমা পুরুষ, যিনি অনন্ত, অসীম ও নিত্যপূর্ণ, কোনও কালে যাঁহার ক্ষয় ব্যয় নাই, একমাত্র তাঁহাকে পাইলেই পরম সুখ, অল্পে বা অনিত্য মায়িক বস্তুতে সুখ নাই।) ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ মায়িক বিষয় উপভোগে ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। অনিত্য বিষয়-সুখে আসক্ত হইলে পরিণামে দুঃখ পাইতেই হইবে।

নিজের আত্মাই দেহধারী নিখিল জীবের প্রিয়তম বস্তু, আত্ম সম্বন্ধ বা মমতা বুদ্ধি বশতঃ পুত্র বিত্তাদি চরাচর জগৎ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়; আত্মসুখের জন্য অর্থাৎ আত্মারই প্রীতি সম্পাদন করিয়া পুত্র বিত্তাদি প্রীতিকর হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অখিল

দেহীর আত্মা, তিনি আত্মার ও আত্মা তিনিই অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি জীবকে পরিত্যাগ করেন না। স্বভাবতঃ তিনি জীব মাত্রেরই প্রিয় ও হিতকারী। তাঁহার ন্যায় প্রিয় বা আপনার জন আর নাই, কেহ হইতেও পারে না। দুঃখের বিষয়, অজ্ঞানান্ধ জীব তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারে না।

("জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস"—সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই জীবের পরম পুরুষার্থ।) দেহে আত্মবুদ্ধি-বশতঃ জীবের এই জ্ঞান মায়ার প্রভাবে আচ্ছাদিত থাকে। (দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নির ধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি-সম্পাদন করাই তেমনি জীবের ধর্ম্ম।) সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবা করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। দাসের নিজের একটা স্বতন্ত্র আনন্দ থাকিতে পারে না। প্রভুর আনন্দেই দাসের আনন্দ। দাসের সুখ প্রভুর সুখেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অনাদি বহির্ম্মুখ জীব শ্রীকৃষ্ণ সেবা ভুলিয়া মায়ার বন্ধনে ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতেছে। অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা করিয়া তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করা যায় এবং কোটি মোক্ষানন্দ-তুচ্ছকারী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বৈচিত্রী অনুভব করা যায়।

(শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূলে যে সব কার্য্য করা হয়, তাহার নাম **ভক্তি** এবং শ্রীকৃষ্ণে যে মমতা বা আপনজ্ঞান তাহার নাম **প্রেম**। ভক্তির মুখ্যফল এই প্রেম হ্লাদিনী শক্তিরই বৃত্তি-বিশেষ, সুতরাং স্বরূপতঃ ইহা আনন্দই।) বিশ্বের ঐকান্তিক কল্যাণের নিমিত্ত সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি এই প্রেম-মহাধনের প্রয়োজন। (এই প্রেমের দ্বারাই প্রেমিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। "ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়। প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হইতে নয়॥" (চৈঃ চঃ ২.৪।৫৭)। ভক্তি

বিনা প্রেমলাভ হয় না, আর প্রেম বিনা প্রেমিক চূড়ামণিকে ও পাওয়া যায় না।)

সকলেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ চায়, আনন্দই নিখিল জীবের একমাত্র লক্ষ্য। চিরানন্দময় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধতত্ত্ব, আর প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় বলিয়া প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলা হয়। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটীই তত্ত্ব বা যথার্থ বস্তু, ইহাদের জ্ঞানই হইল তত্ত্বজ্ঞান। এই তিন বস্তুই নিখিল বেদের বাচ্য বা আলোচ্য বিষয়, বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ হইতে এই তিন বস্তুই পাওয়া যায়। (আনন্দঘনমূর্তি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণই প্রাপ্য বা পাইবার একমাত্র বস্তু। বেদাদি শাস্ত্রে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই **সম্বন্ধ** বা মূল প্রতিপাদ্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বেদের সম্বন্ধতত্ত্ব, তাঁহার সহিতই জীবের নিত্য সম্বন্ধ, তিনিই জীবের একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ভক্তি-সাধনাই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, সে কারণে বেদাদি শাস্ত্র সাধন-ভক্তিকেই **অভিধেয়** বা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেই বিশুদ্ধ চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। (ভক্তির প্রভাবে নিখিল দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু ভক্তির মুখ্যফল যে প্রেম, সেই দেবদুর্লভ প্রেমই জীবের **প্রয়োজন** বা পুরুষার্থ-শিরোমণি। শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থের উল্লেখ আছে। পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেমের তুলনায় ধর্ম্মাদি চারিপুরুষার্থ অতি তুচ্ছ)

(শ্রীভগবানে পরানুরক্তি অর্থাৎ প্রগাঢ় তৃষ্ণা ও পরম আসক্তির **নাম ভক্তি**।) ভক্তি বলিতে ঐকান্তিক ভগবৎ-প্রীতি অর্থাৎ পরম

নিষ্ঠার সহিত ভগবৎ-সেবা এবং ভগবৎ-কথা-পূজাদিতে ঐকান্তিক অনুরাগ বুঝায়। চিত্তচাঞ্চল্যকর বহির্মুখী ভাবগুলিকে অন্তর্মুখী করাই অর্থাৎ ইহ-পরকালের চিন্তা ত্যাগ করিয়া অকপটভাবে শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করাই ভক্তিপথের সাধন বা ভজন, আর এই ভজনই ভক্তি। অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবৎচিন্তাই ভক্তিসাধনার অনুকূল। ভগবৎপ্রার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সাধকের চিত্ত যখন অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় শ্রীভগবানের প্রতি ধাবিত হয়, তখনই বুঝা যায় যে সাধকের চিত্তে শুদ্ধাভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। হৃদয় তখন প্রবল অনুরাগে ভরিয়া যায়।

ভক্তির ন্যায় সুলভ ও শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই। ভক্তি-সাধনে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, আচার, বিচার বা পূজোপকরণাদি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ইহাতে দৃঢ় সংযম বা অন্য কোনরূপ কঠোরতাও নাই। ভক্তি বিষয়ে কুল, শীল, জাতি বা অধিকারাদির কিছুমাত্র বিচার নাই। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগ সর্বাপেক্ষা সুগম ও সহজসাধ্য। ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে। কষ্টসাধ্য অন্যান্য সাধনায় যুগ-যুগান্তে যাহা লাভ করা যায় না, ভক্তিসাধনায় তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করা যায়। সকল সাধনই ভক্তি মুখাপেক্ষী, ভক্তি কিন্তু কাহারও অপেক্ষা রাখে না, জ্ঞান-যোগাদির ফলও ইহা অনায়াসে দিতে পারে। (সর্বসাধন-শ্রেষ্ঠা এই ভক্তি ব্যতিরেকে কর্ম, যোগ বা জ্ঞানমার্গের কোন সাধনাই সম্যক ফল দিতে পারে না, ভক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে কর্ম, যোগ বা জ্ঞানাদির কোনও সার্থকতা নাই। কবিরাজ বলেন—"ভক্তিবিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)।)

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৪) হইতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিতেছেন মঙ্গলের হেতুভূতা

ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না। শ্রীগীতায় (১২।৫) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—দেহাভিমানী জীবের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা নিতান্ত ক্লেশসাধ্য। প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে তিনি বলিলেন—{"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"} (শ্রীগীতা ১৮।৬৫) —তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চনা কর, আমায় বন্দনা কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এইরূপ করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। পূর্ব্বাপর বিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান। সুতরাং শ্রীগীতায় কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞান সম্বন্ধে বহু উপদেশ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশেষ উপদেশ এই ভক্তিমার্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান দীনের একমাত্র বন্ধু, তিনি পতিতপাবন, তিনি কাঙ্গালের সম্বিধন। আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলে, সরল বিশ্বাসে তাঁহার শরণাগত হইলে তাঁহারই কৃপাবলে সকল কার্য্য আপনা আপনিই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। শরণাগতের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীভগবানই দেবদুর্লভ ভক্তিরত্ন প্রদান করিয়া থাকেন। কোনরূপ চেষ্টা বা কৌশল দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না। সকল সাধনার সর্ব্বশেষে ভগবৎ-কৃপা হইলে, ভক্তিরূপ চরম ফল লাভ হইয়া থাকে। ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তেরই বশ —তিনি অনন্ত ও অসীম হইয়াও ভক্তের নিকটে সান্ত ও সসীম হইয়া ধরা দেন, ভক্তের ভক্তিতেই তিনি চিন্ময় সাকার হন।

{শ্রীমদ্ভাগবত নববিধা ভক্তি বা সাধন ভক্তির নয় প্রকার মুখ্য অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যথা—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"} শ্রদ্ধা সহ শ্রীভগবানের নাম-

গুণ-লীলাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, তাঁহার অর্চনা বা পূজা ও বন্দনা, আপনাকে তাঁহার দাস মনে করা, সুখে দুঃখে তিনিই একমাত্র বন্ধু এইরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁহার পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করা অর্থাৎ তাঁহার কর্ম ভিন্ন অন্য কিছুই না করা। সাধন ভক্তির বহু অঙ্গ থাকিলেও, সংক্ষেপে তাহাকে চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিভক্ত করা হইয়াছে (চৈঃ চঃ ২।২২।৬০-৭৪)। সাধনভক্তি বলিতে সাধারণতঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানই বুঝায়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তি দ্বারা জীবের ভববন্ধন ঘুচিয়া যায় এবং ভগবৎ-কৃপায় ভক্তি ও প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। ("ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি। কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ ৩।৪।৬৫-৬)।) শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সকল অঙ্গই প্রেমাবির্ভাবের পক্ষে সমান শক্তিসম্পন্ন হইলেও, ভক্তিমার্গে নামসঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বাধিক মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

এই নববিধ সাধনাঙ্গের যে কোন এক অঙ্গ দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত, পরম আবিষ্টতার সহিত সাধনা করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, ভগবৎ-কৃপায় সেই বিশুদ্ধ চিত্তে প্রথমে ভাবভক্তির ও পরিশেষে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। "এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥" (চৈঃ চৈঃ ২।২২।৭৬)) রাজা পরীক্ষিৎ শ্রবণে, শুকদেব গোস্বামী কীর্ত্তনে, ভক্ত প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মীদেবী পাদসেবনে, রাজা পৃথু পূজায়, অক্রূর অভিবন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জুন সখ্যে এবং বলিরাজা আত্মনিবেদনে শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা-লাভকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন (শ্রীকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তির অনুকূলে গৌউত্তমা শুদ্ধা

ভক্তি) তাহার লক্ষণ **ভক্তিরসামৃতসিন্ধু** নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—("অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥") শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলে তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির স্মরণ-কীর্ত্তনাদি রূপ যে অনুশীলন বা ভজন, তাহার নাম **ভক্তি**। আনুকূল্যময় এই অনুশীলন অন্যাভিলাষ শূন্য হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলে এবং তাহা জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত বা অমিশ্রিত হইলে অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়ক শুষ্কজ্ঞান ও সকাম কর্ম্মাদির সহিত তাহার কোনও রূপ সম্পর্ক না থাকিলে, তাহাকে উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তি বলা হয়। ("অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥" (চৈঃ চঃ ২।১৯।১৪৮)।) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই পয়ারের প্রথমাংশ শুদ্ধাভক্তির তটস্থ লক্ষণ এবং শেষাংশ তাহার স্বরূপ লক্ষণ। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগের ফল স্বরূপ ভুক্তি (স্বর্গাদি সুখ ভোগ), মুক্তি (সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি বা সিদ্ধি (অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি) বিষয়ে বাসনা বর্ত্তমান থাকিতে হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তির উদয় হয় না।

(**নারদ-পঞ্চরাত্র** বলেন—"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥") সর্ব্বোপাধি অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য বাসনা ত্যাগ করিয়া এবং সেবাপরায়ণত্ব হেতু নির্ম্মল হইয়া, হৃষীকের বা ইন্দ্রের দ্বারা হৃষীকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে **ভক্তি** বলে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত তুলনা করিলে, এই শ্লোকে তৎপরত্ব-শব্দে আনুকূল্য, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত-শব্দে অন্যাভিলাষিতা শূন্য; নির্ম্মল-শব্দে জ্ঞান কর্ম্মাদির আবরণ শূন্য এবং সেবন শব্দে অনুশীলন —এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যিনি যে ভাবেই কৃষ্ণানুশীলন বা শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করুন না কেন, তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কৃপাগুণে সেরূপ

ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শত্রু, মিত্র বা অন্য কোনও রূপ ভেদ থাকে না। কামে গোপী, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপাল, সম্বন্ধ দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মাগণ, স্নেহদ্বারা পাণ্ডবগণ এবং ভক্তিদ্বারা নারদাদি ভক্তগণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী কংস ও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে স্মরণ করিয়াও নিরন্তর স্মরণ ও প্রগাঢ় অভিনিবেশের ফলে, শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যোগিজনদুর্লভ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বা শ্রীকৃষ্ণ-লোক প্রাপ্ত হন নাই। আনুকূল্য বা সুখ-সাধনই ভক্তির জীবন, প্রতিকূল বা শত্রুভাবে ভক্তি লাভ হয় না। কংস ও শিশুপাল অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তির উপাসক বা ভক্ত বলা যায় না। সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে শত্রু-বুদ্ধি থাকায় তাঁহারা ভগবৎ-বহির্মুখ দৈত্য নামে অভিহিত হইয়া ইহ জীবনে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

(শ্রীকৃষ্ণ-চরণে একনিষ্ঠা নির্মলা ভক্তির নাম **শুদ্ধা ভক্তি**।) শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ সেবাব্যতীত আর কিছুই জানেন না, আর কিছুই চাহেন না। প্রকৃত ভক্তের নিকট এই সেবা এতই প্রিয় বস্তু যে সেবাজনিত প্রেমানন্দে বিভোর হইলে পাছে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বিঘ্ন জন্মে, এই ভয়ে তিনি সেবাবিঘ্নকারী প্রেমানন্দের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বীয় আনন্দের প্রতি তাঁহার মোটেই লক্ষ্য থাকে না। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ-সারথি দারুক একদিন শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে তাঁহার দেহে প্রেমানন্দ-জনিত স্তম্ভ-ভাবের উদয় হওয়াতে চামর-ব্যজনে বিঘ্ন জন্মিল। তিনি সেবাবিঘ্নকারী প্রেমানন্দকেও অভিনন্দন করিতে পারিলেন না।

(দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম মুক্তি বা মোক্ষ।) মোক্ষ-সুখ বলিতে তমোময়ী সুষুপ্তিদশায় যেরূপ সুখ, তাহাই বুঝায়। অবিদ্যার বন্ধন

বা সংসার-তাপ হইতে মুক্তি-লাভের নিমিত্ত জ্ঞানী ভক্ত মোক্ষকেই বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের শুষ্ক হৃদয় ভক্তিরস আস্বাদনে বিমুখ হওয়ায় তাঁহারা কোটি মোক্ষানন্দতুচ্ছকারী অতুল ভক্তি সুখের ও সেবানন্দের সুমধুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ফল-স্বরূপ এই মোক্ষে সুখ নাই। শুধু ভগবৎ-নামাভাসেই অর্থাৎ পরিহাস ও অবহেলা পূর্ব্বক ভগবৎ-নাম উচ্চারণ করিলেও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃত ভক্ত মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হন। প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া কোটিমোক্ষানন্দতুচ্ছকারী অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস আস্বাদন করেন এবং প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য-গীত-হাস্য-ক্রন্দনাদি করিয়া থাকেন। মায়িক সুখ দুঃখ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন, (ভাঃ ১১।১৪।২৪)—মৎকথাশ্রবণে যাঁহার বাক্য গদ্গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, যিনি কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন বা গান ও নৃত্য করেন—এইরূপ ভক্ত ত্রিজগৎ পবিত্র করেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা শুধু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। (মোক্ষ বা মুক্তিতে সেবানন্দ নাই, সে কারণে মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না—"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।") (শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩)। মুক্তিকে তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিলেও, মুক্তি কিন্তু তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। মুক্তশিরোমণি বলিতে প্রকৃতপক্ষে এইরূপ শুদ্ধভক্তকেই বুঝায়। শুদ্ধভক্ত নিষ্কাম, ভক্তিমাত্রকাম। যে ভাগ্যবান্ জীব দেহাদির চিন্তা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসিয়াছেন, তাঁহার আর কোনও অভাব থাকে না, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে আর চিন্তা করিতে হয় না। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সকল অভাব দূর করিয়া দেন।

ভক্তিমার্গে অভিমানের মত আর শত্রু নাই। অভিমান বা অহঙ্কার হইতেই ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি, আমি-আমার জ্ঞানটী পর্য্যন্ত এই অভিমান হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে অভিমানই জীবের দুর্গতির কারণ। স্বাভাবিক দৈন্যই সাধকের সর্ব্বস্ব। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥" (চৈঃ চঃ ২।২৩।১৪-১৫)। নিজে উত্তম হইয়া এবং দম্ভ ও অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া দীন হীন কাঙ্গাল না হইলে কাঙ্গালের ঠাকুর দীননাথ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করা যায় না। তাঁহার কৃপা হইলে বহুসাধনলভ্য শুদ্ধা ভক্তি আপনা-আপনি উদিত হইয়া থাকে।

ভক্তি-সাধনার পথে ইন্দ্রিয়লালসা অতিপ্রধান অন্তরায়। ইন্দ্রিয়-সুখভোগে আসক্তি থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি শিথিল হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্যই বন্ধন। ইন্দ্রিয়-লালসাকে সহজে ত্যাগ করা যায় না। চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণকে এবং সর্ব্বানর্থের মূল কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে, তাহারা মনোমত কার্য্য পাইয়া আপনা-আপনি বশীভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ ও কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ তখন আর রিপু থাকে না, ভক্তিপথের সহায় হইয়া তাহারা তখন প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করে। নরোত্তমদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—
"কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।" সম্মানী ব্যক্তিকে সম্মান না দিলে ভক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। সর্ব্বঘটে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং কোনও জীবকে কোনও রূপে উদ্বেগ দেওয়া উচিত নহে। প্রকৃত বৈষ্ণবের নিকটে জীবমাত্রই সম্মানের পাত্র।

সর্ব্বজীবে সম্মান দিতে না পারিলে উত্তম ভাগবত হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে জীবসেবাই শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা। এইরূপ জ্ঞানই বৈষ্ণব-সাধনার প্রাণস্বরূপ, ইহার অভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের অধিকারী হওয়া যায় না। যিনি প্রাণিমাত্রকে কোনও প্রকারে উদ্বেগ না দিয়া সকরুণ পিতার ন্যায় পালন করেন, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আশু প্রসন্ন হয়েন। ঈশোপনিষৎ বলেন,—যিনি সমুদয় বস্তুতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মাতে সমুদয় বস্তু দেখেন, তিনি কখনও কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। শ্রীগীতায় (৬।৩০) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, সে কখনও আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। অপরে ঠিক আমাদের মত উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার নিন্দা করা বা তাহার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। তাহাকে সাহায্য করিতে না পারিলে, মঙ্গল কামনা করিয়া তাহাকে তাহার পথে চলিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

পুরুষ বা শক্তিমান বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, আর সকলেই তাঁহার প্রকৃতির বা শক্তির অন্তর্ভুক্ত। জীবমাত্রই তাঁহার শক্তিবিশেষ। সুতরাং জীবের নিজস্ব কিছুই নাই, জীবের পুরুষাভিমান বা কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতেই পারে না। এই সংসারের যাবতীয় কার্য্য ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পরিচালিত হইতেছে। সাধক গাহিয়াছেন—"তোমার কায তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।" অহঙ্কার-বশতঃ জীব মনে করে—"আমিই কর্ত্তা, আমিই স্ব-ইচ্ছায় সমস্ত কর্ম্ম করিতেছি।" (শ্রীগীতা ৩।২৭) প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই জীবের হৃদয়ে থাকিয়া স্বীয় প্রকৃতি বা মায়াদ্বারা সমস্তই করাইতেছেন (শ্রীগীতা ১৮।৬১)। প্রকৃতি বা মায়াই সমস্ত কার্য্য করিতেছে, আত্মা অকর্ত্তা—এইরূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনিই সম্যগ্দর্শী

(শ্রীগীতা ১৩।২৯)। প্রকৃতির চালক বা কর্ত্তারূপে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত করাইতেছেন, সুতরাং কোন কার্য্যে জীবের সুখ্যাতিও নাই, নিন্দাও নাই। মায়ামুগ্ধ জীব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না যে সবেই তিনি, সবেই তাঁর কৃপা। দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি সব যে তাঁরই। চৈতন্যরূপে তিনিই সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। জীবনীশক্তি বা চৈতন্যরূপে যতক্ষণ তিনি স্থূলদেহের মধ্যে আছেন, ততক্ষণই সেই দেহের আদর—চৈতন্যশূন্য প্রাণহীন দেহের কে আদর করে? কর্ম্মকর্ত্তা একমাত্র তিনিই। তিনিই সব হইয়াছেন, তিনিই সব করাইতেছেন। তাঁরই শক্তি দিয়া জীব তাঁরই কার্য্য করিতেছে, প্রতি কর্ম্মে তাঁরই সেবা হইতেছে—ইহার উপলব্ধি হইল—সাধনার প্রথম কথা।

শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দেহাভিমানী জীবের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মলাভ করা নিতান্ত ক্লেশসাধ্য। অতঃপর তিনি ১৩-১৯ সংখ্যক শ্লোকে ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—{"যো ন হৃষ্যতি, ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥" (শ্রীগীতা ১২।১৭)—}অর্থাৎ, যিনি প্রিয়বস্তুসমাগমে হর্ষযুক্ত হন না ও অপ্রিয়সমাগমে দ্বেষযুক্ত হন না, যিনি প্রিয়বিরহে শোকে কাতর হন না ও ইষ্টবস্তুলাভার্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তিমান্ লোকই আমার প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—প্রকৃত ভক্ত সকলের প্রতি প্রেম ও স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন, সকলকেই তিনি আপনার বলিয়া মনে করেন। তিনি নিরীহ, সরল ও কৃপালু, সামর্থ্যসত্ত্বেও তিনি ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন। তিনি কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হন না এবং সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। দেহাদিতে তাঁহার অহং-বুদ্ধি নাই এবং প্রাকৃত

বস্তুতে তাঁহার মমতা-বুদ্ধি নাই। শত্রু-মিত্রের প্রতি, মান-অপমানের প্রতি, সুখ-দুঃখের প্রতি, নিন্দা-স্তুতির প্রতি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সমভাব—কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না। এইরূপ ভক্তই নিজেকে এবং অপরকে পবিত্র করিয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে বাস করেন। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।" শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্রাম-মন্দিরে পাপের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, শুদ্ধা ভক্তিও তেমনি ভক্তের সমুদয় পাপরাশি, এমন কি হৃদয়স্থ পাপবীজকে পর্য্যন্ত নাশ করিয়া থাকে। শুদ্ধাভক্তিদ্বারা প্রারব্ধ পর্য্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধভক্ত প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, তাহাই পবিত্র হইয়া যায়। এই শুদ্ধাভক্তি হইতেই প্রেমলাভ হইয়া থাকে। প্রেমসুখই ভক্তির মুখ্য ফল, দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তি তাহার আনুষঙ্গিক ফল।

সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিরাশ্রয় জীবের একমাত্র আশ্রয়। তিনি শুধু কার্য্যাকার্য্যের কর্ত্তা নহেন। তিনি আবার জীবের ব্যথার ব্যথী, চিরসাথী, অচ্যুত সখা। সকল সম্ভোগের ভিতর দিয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় রসমাধুর্য্য আস্বাদন করাই জীবের চরম সম্ভোগ। তিনি ব্যতীত জীবের যথার্থ আপনার জন আর কেহই নাই। সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তিনি জীবের সহিত নিত্য প্রেম ও রসলীলা করিতেছেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্যলীলা ভাগ্যবান্ জীবের নিকটেই প্রকাশ পায়। পীযূষপূরিত এই প্রেমরসের বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারিলে জীব চিরতরে তৃপ্ত ও ধন্য হইয়া যায়।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপনার জন ও প্রিয়বস্তু করাই বৈষ্ণব সাধনার উদ্দেশ্য। শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হইলে,

সেই বিশুদ্ধ চিত্তে **শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদয়** হয়। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এমন মমতা জন্মে যে, তখন সাধকের মন-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেরূপ অবস্থায় সাধকের হৃদয়ে **রতি** বা ভাবের উদয় হয়। রতির ঘনীভূত অবস্থার নাম **প্রেম**। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করিব—ইহাই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেমভক্তিতেই প্রীতিলাভ করেন। কথিত আছে, দাসীপুত্র দরিদ্র বিদুরের সাধ্বী পত্নী শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাকা কলার পরিবর্তে তাহার খোসা খাইতে দিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহা পরম পরিতোষপূর্বক ভোজন করিলেন। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু প্রেমভক্তিরই বশ। গৌরববুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে তিনি যেরূপ সুখী হন, সরল প্রীতিময় ব্যবহারে তাঁহার কোটিগুণ অধিক সুখ হইয়া থাকে। অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদ-সেবা করেন, তাঁহার আবার অভাব কিসের? তিনি শুধু প্রেমেরই কাঙ্গাল।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।৪১)। আত্মসুখেচ্ছাই **কাম** আর শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করিবার ইচ্ছার নাম **প্রেম**। কামের মর্ম হইল শুধু নিজের সুখভোগ, আর প্রেমের মর্ম হইল শুধু শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা। স্বাভাবিক সেবা-প্রীতি হইতে উদ্ভূত এই প্রেম বিশ্ববিজয়ী। চিত্তে প্রেমের উদয় হইলে স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সাতিশয় মমতা জন্মে। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্-বুদ্ধি অর্থাৎ তিনি যে ভগবান্ এই বুদ্ধি বা জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। প্রেমের স্বভাবে ঐশ্বর্যজ্ঞান শিথিল হইয়া যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণকে আর ভগবান বলিয়াই মনে হয় না। এই প্রেম ব্রজের গোপগোপীগণের মধ্যে সাতিশয় উৎকর্ষ লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতিরিক্ত কোন সুখই তাঁহারা কামনা করেন না। তাঁহাদের হৃদয়

সদাই মাধুর্য্যরসে পরিপূর্ণ থাকে। (তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। প্রেম-মাধুর্য্যময়ী ব্রজগোপীগণের প্রেমে তৃপ্তি নাই। ঘনিষ্ঠতার আধিক্য হেতু তাঁহাদের প্রেম-তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মহাভাবে পরিণত হয়।) তাঁহারা নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কোনও রূপ বিচার না করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা করেন এবং সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও আস্বাদন করান।

("মীরা কহে, বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দ-লালা।" নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ প্রেম।) শুধু স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বা ফল-মূল-তৃণাদি ভোজন করিয়া বা প্রস্তরাদির পূজা করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না। প্রেমভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। মায়ের সন্তানের উপর, সতীর পতির উপর এবং বিষয়ীর বিষয়ের উপর যেরূপ স্বাভাবিক টান বা আকর্ষণ,—প্রাণের আকর্ষণগুলি সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণ-মুখী হইবে, সেইভাবে তাঁহাকে 'চাহিলে', প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করা যায়। তখনই প্রকৃতপক্ষে সকল 'চাওয়ার' ও সকল 'পাওয়ার' অবসান হয়। যিনি সর্ব্ব-সম্পদের আকর-স্বরূপ, যাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া যায়, তিনি প্রসন্ন হইলে জীবের আর কোন্ বস্তু অপ্রাপ্য থাকিতে পারে? যে ভাগ্যবান্ জীব নিজের সকল বাসনা ও সকল ভাবনা তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহাকেই স্মরণ করিতে পারেন, তাঁহার আর সংসারভয় থাকে না, তখন তাঁহার নিখিল বাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়।

ভগবৎ-প্রেমবিকাশের বিবিধ প্রকার ক্রম আছে। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থে, সাধকের প্রথম অবস্থা হইতে প্রেমের আবির্ভাব পর্য্যন্ত যে যে অবস্থার বিকাশ হয়, তাহার একটা ক্রম

দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন,—প্রথমেই শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান, তারপর অনর্থ-নিবৃত্তি বা পাপবীজের নাশ। পাপবীজ নাশ প্রাপ্ত হইলে ভজনাঙ্গে নিষ্ঠা বা দৃঢ়তা জন্মে। নিষ্ঠার পর রুচি বা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আনন্দ-বোধ। রুচির পর আসক্তি বা প্রগাঢ় অভিনিবেশ। অতঃপর ভাব ও তাহার ঘনীভূত অবস্থা প্রেম। দুগ্ধ ও ঘনীভূত দুগ্ধ বা ক্ষীর যেমন স্বরূপতঃ একই বস্তু, সেইরূপ ভাব ও প্রেম স্বরূপতঃ একই বস্তু। উভয়েই হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি বিশেষ হইলেও প্রেমে চিত্ত-স্নিগ্ধতা ও মমতাবুদ্ধি অধিকতর হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে, সাধুমুখে শাস্ত্র-কথা শ্রবণ করিলে শ্রদ্ধা জন্মে। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।" (চৈঃ চঃ ২।২২।৩৮)। সাধন-ভজন করিতে হইলে প্রথমেই চাই **শ্রদ্ধা** অর্থাৎ গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে এবং ভগবৎ-লীলাদিতে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস। প্রকৃত পক্ষে সরল ও উদার হইতে না পারিলে এরূপ বিশ্বাস হয় না। যুক্তি-প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া প্রথমেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে সর্ব্বনিয়ন্তারূপে সর্ব্বশক্তিমান্ একজন আছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে জীবের সকল অভাব দূর করিয়া দিতে পারেন। আরও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তিনি দয়াময়, ভক্তবৎসল ও বাঞ্ছাকল্পতরু—কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি সাড়া দেন এবং সকল অমঙ্গল দূর করিয়া দেন। এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকাই সকল ধর্ম্মের ও সকল সাধনার মূল। ইহার অভাবে সকল সাধনাই প্রাণ-হীন অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। এই শ্রদ্ধা হইতেই একাগ্রতা ও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়, এই শ্রদ্ধাই জীবকে শান্তিময় আনন্দধামে লইয়া যায়। শ্রদ্ধাবিহীন জপ, তপ, পূজা, উপাসনা, সমস্তই বৃথা। এই শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না।

প্রকৃতপক্ষে সাধু-সঙ্গ হইতেই শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। (শ্রীভাঃ ৩।২৫।২৫)। সৎসঙ্গগুণে যাঁহার শ্রীকৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কর্ম্মীর ন্যায় যিনি বিষয়কর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত নহেন এবং শুষ্কজ্ঞানীর ন্যায় যিনি সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, তিনিই ভক্তিবিষয়ে অধিকারী, তাঁহারই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ (শ্রীভাঃ ১১।২০.৮)। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯) হইতে আরও জানা যায়—যাবৎ ভগবৎ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা না জন্মায়, তাবৎ বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। ভক্তিসাধন সিদ্ধ হইলে কর্ম্মনিষ্ঠা আপনাআপনি শিথিল হইয়া যায়।

সংসারের অধিকাংশ ব্যক্তিই ভোগসুখ চাহেন এবং ভোগবাসনা পূরণের জন্য শ্রীভগবানের আরাধনা করেন। এইরূপ প্রবৃত্তিমূলক **সকাম সাধনা** প্রকৃতপক্ষে বণিগ্‌বৃত্তি বা দেনাপাওনার ব্যাপার হইলেও, অন্তরের সহিত এইরূপ করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় অভীষ্টবস্তু লাভ হইলে শ্রীভগবানের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব আসিয়া পড়ে। সেই কৃতজ্ঞতা হইতেই ক্রমশঃ ভালবাসার বা ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে। তখন ভোগের বস্তু অপেক্ষা শ্রীভগবান্‌কেই অধিক ভাল লাগে। সেরূপ অবস্থায় সাধকের পক্ষে ভোগবাসনা দূর করা দুঃসাধ্য হয় না। প্রকৃত-পক্ষে, সকল সাধকের অন্তরে এরূপ একটা দৃঢ়বিশ্বাস থাকে যে তিনি যাঁহার আরাধনা করিতেছেন, সেই আরাধ্য দেবতা নিজ শক্তিবলে সাধকের অভীষ্ট পূরণ করিয়া দিতে পারেন। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দীপনা থাকায় এই সকামভাব শ্রদ্ধাসঞ্চারের অনুকূল হইয়া থাকে। এইরূপ সকাম সাধনা হইতে যে শ্রদ্ধা জন্মায়, তাহা বিশুদ্ধ না হইলেও তাহা হইতে ক্রমশঃ ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে। সকামভাবযুক্ত হইলেও এই ভক্তি এক অমূল্যবস্তু। এই সকামভক্তি হইতেই নিষ্কাম সাধনায় অধিকার ও প্রবৃত্তি জন্মে। সকাম ভক্তগণ বিষয়ভোগাদি করিতে করিতে ভক্তির

অপ্রতিহত প্রভাবে কালক্রমে নিষ্কাম হইয়া যথাযোগ্য ফল লাভ করেন। অনধিকারীর পক্ষে নিষ্কাম সাধনা সম্ভবপর হয় না।

বহুজন্মের সুকৃতির ফলে জীবের **সাধুসঙ্গ** লাভ হয়। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" (চৈঃ চঃ ২।২২।৩৩)। ভক্তিপথে সৎ বা সাধুসঙ্গ প্রধান সহায়। সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। শ্রদ্ধা জন্মিলে সাধুসঙ্গ করিবার ইচ্ছা হয়। তখন আবার সাধুসঙ্গ করিলে ভজনে প্রবৃত্তি আইসে। সাধুস্থানে সর্ব্বদা সৎকথা ও সদালাপ হয়। সে কারণে তথায় যাইলে অধর্ম্মভাব বিদূরিত হইয়া ধর্ম্মভাবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" বৈকুণ্ঠে অথবা যোগিগণের হৃদয়ে তিনি বাস করেন না—তাঁহার ভক্তগণ যেখানে তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন করেন, সেই স্থানেই তিনি অবস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে, সর্ব্বফলপ্রদ নামসঙ্কীর্ত্তন হইতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। সাধুসঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত আনিয়া দেয়। সকল সাধনেরই উদ্দেশ্য ভগবৎ-কৃপালাভ। সাধুভক্তের অনুগ্রহভাজন হইতে পারিলে শ্রীভগবানের কৃপা হয়, তাহার ফলে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥" সংসার জয় করিবার প্রধান উপায়—ভক্তিভাবে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ ও কৃষ্ণকথার আলাপন। কাকোচ্ছিষ্ট বটবীজেই যেমন বটবৃক্ষ জন্মায়, তেমনি সাধুভক্তমুখে কৃষ্ণকথা শুনিলে হৃদয়ে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়। সাধুকৃপাই ভক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যাহারা আমার ভক্তের পূজা ও সেবা করে, তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত। "ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত

শেষ, এই তিন সাধনের বল॥" (চৈঃ চঃ ৩।১৬।৫৫)। প্রকৃতপক্ষে সাধুভক্তের কৃপাব্যতীত ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয় না।

(শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলে ভগবৎ-কৃপায় **সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি** হয়) অর্থাৎ চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তিবাসনাদি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়। (তখন ভজনে **নিষ্ঠার** বা দৃঢ়তার উদয় হয়।) নিষ্ঠার উদয়ে পরম আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ ভজন করিবার প্রবৃত্তি আইসে। নিষ্ঠা ব্যতীত চিত্ত স্থির হয় না, আর অস্থির চিত্তে ভক্তির বিকাশ হয় না। নিষ্ঠাই বস্তুপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। (নিষ্ঠার সহিত অর্থাৎ সরলতা ও দৃঢ়তার সহিত ভজন করিতে করিতে ভজনে ও ভগবৎ-গুণ-লীলাদি-শ্রবণে **রুচি** বা আনন্দানুভব হইয়া থাকে। রুচি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে **আসক্তি** জন্মে।) তখন সাধক ভজন ও কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া অন্য কোনও বিষয়ে লিপ্ত হইতে চাহেন না। আসক্তি-অবস্থায়, প্রাণের স্বাভাবিক টানে ভজনে প্রবৃত্তি আইসে। তখন ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। (এই আসক্তি ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে **রতি** জন্মে।) রতির উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি-চিন্তনে আবেশ হয়। তখন সাধক সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। (রতি বা ভাবের ঘনীভূত অবস্থার নাম **প্রেম**।) প্রেমের আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে হয়। তীব্র অনুরাগের সহিত মন-প্রাণ যখন অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে স্থির থাকে, তখনই বুঝা যায় যে হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইয়াছে। প্রেমিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ যাচিয়াই এইরূপ প্রেমের ফাঁদে ধরা দেন।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অভিলাষদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক যে ভক্তি বিশেষ, তাহার নাম রতি বা ভাব। এই রতি বা ভাব প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণতুল্য—ইহা প্রেমেরই পূর্ব্বাবস্থা। নানাবিধ বিঘ্নদ্বারা ভাবের হ্রাস

না হওয়াই প্রেমের চিহ্ন। (ধ্বংসের কারণসত্ত্বেও যে ভাব-বন্ধনের ধ্বংস হয় না, তাহার নাম **প্রেম**। "অনেক বিপদে মন কিঞ্চিৎ না টলে। প্রেমের লক্ষণ সেই, সাধুশাস্ত্রে বলে॥" (ভক্তমাল) ।) প্রেমের চরম লক্ষ্য হইল প্রেমসেবা দ্বারা প্রেমাস্পদের সুখ-সম্পাদন। প্রকৃত প্রেমিক প্রেমাস্পদের প্রতি কোনও কারণে রাগ বা অভিমান করেন না। প্রকৃত প্রেমে প্রতিদান বা প্রাপ্তির আশা থাকে না, তাহাতে দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্রও নাই। ("নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" (চৈঃ চঃ ২।২২।৫৭); কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক।) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় প্রেমলাভ হইয়া থাকে। ভগবৎ-কৃপা-ব্যতিরেকে কেহ নিজ চেষ্টায় প্রেমলাভ করিতে পারে না। সাধকদেহে এই প্রেম পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইতে পারে।

(ভক্তি প্রধানতঃ তিনপ্রকার—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা সাধনীয় ভক্তির নাম **সাধনভক্তি**। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইলে সেই বিশুদ্ধ চিত্তে প্রথমে **ভাবভক্তির,** পরিশেষে **প্রেমভক্তির** উদয় হইয়া থাকে।) প্রেমভক্তির উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতে মমতা বা আপন-জ্ঞান থাকে না। যে জন্য সাধন করা হয় তাহাই সাধ্য। (**সাধ্যভক্তি** বলিতে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি উভয়কেই বুঝায়।) বিনা সাধনে সাধ্যবস্তুর লাভ হয় না। সাধনাবস্থার ভক্তি হইল সাধনভক্তি, আর সিদ্ধাবস্থার ভক্তি হইল প্রেমভক্তি। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির পূর্ব্বাবস্থামাত্র।

(বৈধী ও রাগানুগা ভেদে **সাধনভক্তি** দুইপ্রকার। বিধিমার্গের ভক্তির নাম **বৈধীভক্তি** এবং রাগমার্গের ভক্তির নাম রাগানুগা বা **রাগভক্তি**।) শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিবিহীন জনের শাস্ত্রবিধি-অনুসারে ও শাস্ত্রশাসন-

ভয়ে যে ভজন তাহাই বৈধীভক্তি। ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য বৈধী ভক্তির ভজন। বিধিমার্গে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবান্ রূপে প্রকাশিত হন। "বিধি ভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥" (চৈঃ চঃ ২।২৪।৬২) শাস্ত্রশাসন-প্রবর্ত্তিত বিধি-মার্গের সাধনে সাধক পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন। বৈধীভজনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপন-জ্ঞান বা প্রাণের টান থাকে না বলিয়া বিধি-মার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। বৈধীভক্তি রাগ-ভক্তির সাধন মাত্র। বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগী সাধুজনের সঙ্গ হইলে এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত লোভ জন্মিলে, সেই লোভপ্রযুক্ত যে ভজন, তাহার নাম রাগানুগা বা রাগভক্তি। এই রাগ বা অনুরাগ শাস্ত্র-বিধির বা কোন যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। "রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবান্ পায়।" (চৈঃ চঃ ২।২৪।৬১) লোভপ্রবর্ত্তিত রাগমার্গের ভজনে ব্রজবাসে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বৈধী-ভক্তির ও রাগ-ভক্তির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না, পার্থক্য থাকে শুধু সাধকের মনের ভাবে। নিজ-সুখ-প্রাপ্তির আশায় এবং শাস্ত্র-শাসনের বা নরকের ভয়ে বৈধী-ভক্তির সাধনা, আর শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তির লোভে এবং প্রাণের স্বাভাবিক টানে রাগ-ভক্তির সাধনা। মলিন দর্পণে যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয় না, তেমনি অশুদ্ধচিত্তে নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয় না। বৈধী-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত ক্রমশঃ সংযত ও বিশুদ্ধ হইয়া যায়। তখন সাধক রাগ-দ্বেষাদি-রহিত হইয়া রাগানুগা-ভক্তি-ধারণের ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মধুর-লীলা-স্মরণের উপযুক্ত হন। স্মরণে সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তগুলি শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে পারা যায় বলিয়া রাগমার্গে স্মরণই মুখ্য সাধন।

(শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। অনুরাগের তারতম্যানুসারে সাধকের প্রথম অবস্থাকে **প্রবর্ত্তক-অবস্থা** বলা হয়। অতঃপর **সাধক-অবস্থা** এবং পরিণামে **সিদ্ধ-অবস্থা**।) সিদ্ধাবস্থায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ভক্তের দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময় হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—এরূপ ভাব আর তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্তি পায় না। এইরূপে ভজনসিদ্ধ হইলে দেহান্তে সিদ্ধদেহে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ হইয়া থাকে।

মহাভাগবত রায়-রামানন্দের মধ্যে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক মহাপ্রভু তাঁহার মুখে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাতে যেরূপ সাধন-ক্রম দেখাইয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)। তদনুসারে—

(১) বৈধী-ভক্তির প্রথম পর্ব্ব—**স্বধর্ম্মাচরণ** বা শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন। স্বধর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মই বুঝায়। ইহাই সকল ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ, ইহা পালন না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯) বলেন—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।") শাস্ত্রে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ থাকিলেও, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়শিষ্য উদ্ধবকে বলিলেন—যতদিন পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদি বিষয়ে নির্ব্বেদ বা বিরক্তি এবং আমার কথাপ্রসঙ্গাদি-বিষয়ে শ্রদ্ধা না জন্মায়, ততদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। সাধুসঙ্গের প্রভাবে কর্ম্মে নির্ব্বেদ ও ভগবৎ-কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মিলে ভক্তিযোগের অধিকারী হওয়া যায় না। যাঁহার ভগবৎ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা নাই, যাঁহার ভগবৎসেবায় নিষ্ঠা নাই সেইরূপ বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। ভক্তিযোগ সাধনার সময় কর্ম্মযোগী হইতে হয়। কর্ম্ম-অবলম্বন ব্যতীত সাধন হয় না। ভক্তির অপরিপক্বাবস্থায় নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মত্যাগ করিলে ভক্তি

প্রবলা হইতে পারে না। ভক্তি পরিপক হইলে কর্ম্মত্যাগ আপনা আপনি হইয়া যায়। তখন আর কর্ম্মযোগের প্রয়োজন হয় না।

(স্বরূপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও আরোপসিদ্ধা ভেদে ভক্তি তিন প্রকার।) শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে স্বরূপসিদ্ধা-ভক্তি বলা হয়। স্বরূপতঃ ইহা ভক্তিই, কিন্তু অপর দুইটি তাহা নহে। বৈরাগ্য-দানাদি সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি পরিকর-রূপে ভক্তির সঙ্গে থাকে এবং আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয় মাত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরূপতঃ ভক্তি নহে। স্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও ইহাতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয় বলিয়া ইহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, তাহার ফলে সুখভোগাদি মাত্র লাভ হয়। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না বলিয়া ইহাকে শুদ্ধাভক্তির একটা অঙ্গ বলা যায়না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সাধুভক্তের কৃপায় শুদ্ধাভক্তি লাভ হইতে পারে। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নির্ম্মলচিত্ত শুদ্ধভক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি আচরণ করিয়া থাকেন। বিষয়বাসনা-বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ চিত্ত ভিন্ন ভক্তিরস পান করিবার সামর্থ্য জন্মে না। আত্মসুখের কামনাই জীবের বন্ধনের কারণ হয় বলিয়া সকাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনে কর্ম্ম-বন্ধনের আশঙ্কা থাকে। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য-ময়ী সেবাই হইল তাহার স্বধর্ম্ম। যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা-রূপ প্রেম নাই, যাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা নাই, যাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বাহ্য বা বাহিরের বস্তু।

(২) বৈধী ভক্তির দ্বিতীয় পর্ব্ব—**শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মার্পণ,** অর্থাৎ ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ।) ইহাকে কর্ম্ম-মিশ্রাভক্তি বা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচরণ বলা যায়। নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান

করিলে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করা যায় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম এবং তাহারই ফল পরমোত্তম। ভগবদ্দাস্যবোধে তাঁহার কর্ম্ম তাঁহার দাসরূপে তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা এবং কর্ম্মফল তাঁহাতেই অর্পণ করা ভক্তিযোগের অনুকূল। অহংবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে তাহা প্রকৃত-পক্ষে শুদ্ধভক্তিযোগের অঙ্গ হইবে না।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ করিলে এবং আচরিত কর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলে শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। সেকারণে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সকাম স্বধর্ম্মাচরণ হইতে শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র-বিহিত বা ব্যবহারিক সমস্ত কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—("যৎ করোষি, যদশ্নাসি যজ্জুহোষি, দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥") (শ্রীগীতা ৯।২৭)—অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! কর্ম্ম, ভোজন, হোম, দান, তপস্যা, যাহা কিছু তুমি করিয়া থাক, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা না থাকিলে তাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করা যায় না। ভগবদর্পিত কর্ম্মে কর্ম্মবন্ধনের আশঙ্কা না থাকিলেও, ইহাতে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। যাহাতে নিজসুখের জন্য ভাবনা থাকে, স্বসুখবাসনা-পরি-তৃপ্তির জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বাহ্য বা বাহিরের বস্তু।

(৩) বৈধীভক্তির তৃতীয় পর্ব্ব—**স্বধর্ম্মত্যাগ ও ভগবচ্ছরণাগতি।**) নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মাচরণ করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, তখনই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শরণাগতির ব্যবস্থা। তদবস্থায় সাধক, "তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, সর্ব্বাবস্থায় তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা,"—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন এবং দেহাদি সমস্তই তাঁহাতে

অর্পণ করিয়া "আমি তোমার হইলাম"—এইভাবে আত্মনিবেদন করেন। ভক্তিশাস্ত্রে ইহার নাম **শরণাপত্তি**। এইরূপ অবস্থায় সাধকের দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই নিরন্তর শ্রীভগবানের স্মরণে ও তাঁহার প্রীতির অনুকূল কার্য্যে নিয়োজিত থাকে। শ্রীভগবান্‌ও তখন সাধকের সকল ভারই গ্রহণ করেন। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে, "তিনি যাহা হয় করুন" —এইভাবে আত্মসমর্পণ করা হইলে, বিক্রীত পশুর ন্যায় নিজ ভরণ-পোষণাদির জন্য আর কোনরূপ চিন্তা বা চেষ্টা থাকিবে না। প্রকৃত শরণাগত ব্যক্তির নিজের কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকে না। সর্ব্বতোভাবে তিনি প্রভুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া থাকেন। আত্মনিবেদনে আত্মবিসর্জ্জন আছে বটে, কিন্তু ইহাতে আত্মবিস্মরণ বা প্রেমে আত্মহারা-ভাব নাই।

স্বয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ॥" (শ্রীগীতা ১৮।৬৬)।—অর্থাৎ "তুমি সকলপ্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। স্বধর্ম্মত্যাগজনিত পাপের ভয় তুমি করিও না।" আত্মনিবেদনে পাপের ভয় না থাকিলেও, তাহাতে সাধকের নিজ দুঃখনিবারণের জন্য একটা অভিপ্রায় থাকে, নচেৎ পাপ হইতে মুক্ত করার কথাই উঠিত না। আত্মনিবেদনে নিজদুঃখ-নিবারণের অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকায়, ইহা অন্যাভিলাষশূন্যা শুদ্ধা ভক্তিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাও বাহ্য বা বাহিরের বস্তু।

(৪) বৈধীভক্তির চতুর্থ পর্ব্ব – **জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি**। ইহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান, ইহাই শ্রীগীতার পরা ভক্তি, ইহাই গীতারাজ্যের শেষ সীমা। বহুজন্মের সাধনার ফলে এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করা যায়। এই-রূপ জ্ঞানিভক্তকে, "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এইরূপ

বলিতে হয় না। শ্রীভগবান্‌কে সংসারের সার বলিয়া জানিয়া তিনি আপনা-আপনিই শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন।

শ্রীগীতায় (১৮।৫৪) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥" ব্রহ্মে অবস্থিত জ্ঞানিভক্ত সর্ব্বভূতে শ্রীভগবান্‌কেই দর্শন করেন এবং দেহাভিমান না থাকায় তিনি শোক ও আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া সদাই প্রসন্ন থাকেন। ভক্তসঙ্গের প্রভাবে এইরূপ ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা সাধকের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান তিরোহিত হইলে, তিনি মোক্ষকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ভগবৎ-কৃপায় অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। (শ্রীভাঃ ১।৭।১০)। শ্রীগীতায় জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিকে পরাভক্তি বলা হইলেও জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর রাগবিহীন আচরণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে অনুরাগ বা প্রাণের টান নাই, সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না, আর প্রেম বিনা প্রেমিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। আবার, মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানী ভক্ত দুঃখের অভাবরূপ মুক্তির আনুকূল্য করিয়া থাকেন বলিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে আত্মসুখানুসন্ধান বা আমিত্বের পরিণামচিন্তা অতিসূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। আপনাকে ভুলিতে না পারিলে প্রেম হয় না, চিত্তে ভুক্তি-মুক্তির বাসনা থাকিতে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারা যায় না। যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা রূপ প্রেম নাই, নিজ কল্যাণের নিমিত্তই যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বাহ্য বা বাহিরের বস্তু।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাযুজ্য মুক্তির সাধনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য বা বিধিমার্গের ভক্তগণ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি কদাচিৎ গ্রহণ করিলেও ইষ্টে লয়-প্রাপ্তিরূপ সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তিকে তাঁহারা নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করেন। সাধকপ্রবর ভক্ত রাম-প্রসাদ গাহিয়াছেন —

"নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল। চিনি হওয়া ভাল নয় মন! চিনি খেতে ভালবাসি॥" পরা মুক্তি বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা প্রাপ্তিই বুঝায়। "কৃষ্ণ প্রেম যার—সেই মুক্ত-শিরোমণি।" (চৈঃ চঃ ২।৮।২০৭)। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিদ্যমান, তিনিই মুক্ত-শিরোমণি।

(৫) বৈধী ভক্তির পঞ্চম পর্ব—**জ্ঞানশূন্যা ভক্তি** অর্থাৎ শ্রীভগবানের জন্যই শ্রীভগবানে ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তিনিই যে সংসারের সার—এরূপ জ্ঞান ইহাতে নাই। ইহাতে আমিত্বের বা আত্মসুখানুসন্ধানের লেশমাত্রও থাকে না। ইহাই প্রকৃত ভগবদ্ভজন। ইহাতে ঐশ্বর্য জ্ঞান বা ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহাদি না থাকায় ইহাকে প্রকৃত সাধন ভক্তি বলা যায়।

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বৈধী ভক্তির শেষ সীমা। এই পর্যায়ে সাধকের **"আমি তোমার"**—এই ভাব বিদ্যমান থাকে। এখনও সাধকের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি ও তাঁহার সেবা নিমিত্ত লোভ জন্মায় নাই। সুতরাং জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বৈকুণ্ঠধাম-প্রাপ্তির সাধন হইলেও, ইহা দ্বারা ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। ইহার পর রাগানুগা ভক্তির বা প্রেমের রাজ্য—প্রেম লইয়া খেলা এবং **"তুমি আমার"**—এরূপ ঘনিষ্ঠতার ভাব। প্রেমময়ী ব্রজগোপীগণ রসিক-শেখর শ্যামনাগরকে বলিতেছেন—"তুমি আমাদের হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইলে বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি।" এরূপ দম্ভোক্তির দ্বারা তাঁহারা 'তুমি আমার'—এই ভাবেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণে অকপট অনুরাগ না জন্মিলে, তাঁহার সহিত প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ না থাকিলে, এরূপ ঘনিষ্ঠতার ভাব আসিতে পারে না। বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সাধকের

চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয়। তখন সাধকের রাগানুগার প্রবৃত্তি আইসে।

জীব মাত্রই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার ভাবের অধীন। এই পাঁচ ভাবেই মায়ামুগ্ধ জীব অনন্ত সংসারে আবদ্ধ থাকে। এই বহির্মুখী ভাবগুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অর্পণ করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া, প্রভু-সখা-পুত্র বা পতি ভাবে নিখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলারস আস্বাদন করাই শ্রেষ্ঠ ভজন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—ব্রজের এই চারিভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করা যায়। ব্রজে শান্ত রসের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস"—এই জ্ঞানে দাস্যভাবের ভজন, "তিনি আমার সখা"—এই জ্ঞানে সখ্য ভাবের ভজন, "তিনি আমার পুত্র"—এই জ্ঞানে বাৎসল্য ভাবের ভজন এবং "তিনি আমার পতি"—এই জ্ঞানে মধুর ভাবের ভজন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম-অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥" চৈঃ চঃ (১।৪।১২৭) নিত্য নব-নবায়মান প্রেম শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন।

"ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।১৭৯)। রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজন করা হয়, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে সেই ভাবেই পাওয়া যায়। দাস্য ভাবের সাধক শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুরূপে, সখ্যভাবের সাধক তাঁহাকে সখারূপে, বাৎসল্যভাবের সাধক তাঁহাকে পুত্ররূপে এবং মধুর ভাবের সাধক তাঁহাকে পতিরূপে পাইয়া কোটি মোক্ষানন্দ-তুচ্ছকারী অতুল আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

(১) রাগভক্তির প্রথম পর্ব্ব—**শান্তভাব** অর্থাৎ শান্ত ভক্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা ও পরমাত্মা জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবার পর ভক্তসঙ্গে চিত্ত ভগবন্মুখী হইলে হৃদয়ে মমতা-গন্ধহীন জ্ঞান-ভক্তিময় শান্ত রসের বিকাশ হয়। তখন প্রেমের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। ইহাই প্রেমভক্তির সর্ব্বনিম্ন স্তর। ইহার পর প্রকৃত প্রেমের রাজ্য, প্রেম লইয়া খেলা। (শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০) বলেন—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"—) অর্থাৎ শ্রীহরির চিত্তাকর্ষকগুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মায় বা ব্রহ্মে যাঁহারা রমণ করেন, তাঁহাদিগকে আত্মারাম বা ব্রহ্মনিষ্ঠ বলা হয়। কবি, হবি ইত্যাদি নবযোগেন্দ্র, সনকাদি চতুঃসন প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্ত ভক্তগণ পূর্ব্বে শুষ্ক জ্ঞান মার্গের জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। পরে, ভক্ত-সঙ্গে ভক্তিরসের আস্বাদন পাইয়া জ্ঞানিচর ভক্ত নামে অভিহিত হন। কথিত আছে—দেবর্ষি নারদের হরিগুণগান শ্রবণ করিয়া সনক ঋষির দেহে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে প্রেমের ক্ষীণধারা প্রবাহিত হয়। জীবন্মুক্ত শান্ত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল পরমানন্দ-মূর্ত্তি রূপে অনুভব করেন। চন্দ্রে মমতা বুদ্ধি না থাকিলেও চন্দ্র-দর্শনে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি শান্তভক্তগণ ভগবদ্দর্শনে আনন্দলাভ করেন। তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্ণা ত্যাগ থাকিলেও, ঈশ্বরবুদ্ধি বশতঃ মমতাময়ী প্রীতির ও সেবার অভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে নিতান্ত আপনার জন—এরূপ জ্ঞান তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। মমতা-রহিত হইলেও জ্ঞানভক্তিময় শান্তভাব আনুকূল্য-বর্জ্জিত নহে।

(২) রাগভক্তির দ্বিতীয় পর্ব্ব—**দাস্যভাব।** দাস্যভাবের সাধক দাস-অভিমানে শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইবার জন্য এবং দাসোচিত সেবা দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধান করিবার জন্য ব্যাকুল হন। নারদ, হনুমান, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ দাস্যভাবের আদর্শ। দাস্যেই প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বা প্রেমের প্রথম বিকাশ, দাস্যেই প্রকৃতপক্ষে প্রেমভজনের আরম্ভ। "তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস, আমি সেবা না করিলে তোমার সেবাই হয় না"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাধকের এই যে ভাব তাহাই দাস্যপ্রেম। বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় রক্তক-পত্রকাদি ব্রজপরিকরগণ দাস্য প্রেমের উপাসক ছিলেন। দাস্যপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা ও দাস্যের সেবা উভয়ই আছে। দাস্যে গৌরব বুদ্ধি, সম্ভ্রমজ্ঞান ও সঙ্কোচ ভাব থাকে বলিয়া ইচ্ছানুরূপ সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা যায় না। দাস্যভাবের উপাসক আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক বলিয়া মনে করেন। দাস্যভাবকে প্রকৃতপক্ষে দাস্যভক্তি বা ভগদ্ভক্তি বলা যায়।

(৩) রাগভক্তির তৃতীয় পর্ব্ব **সখ্যভাব।** প্রেমের স্বভাববশতঃ দাস্যের গৌরব, সম্ভ্রম ও সঙ্কোচ-বোধ সঙ্কুচিত হইতে থাকিলে ক্রমশঃ বিশ্বাসের ভাব আসিয়া পড়ে। তখন হয় সখ্যপ্রেম। সখ্যপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ও সখ্যের বিশ্বাস—তিনটাই আছে। সুবল মধুমঙ্গলাদি ব্রজবালকগণ সখ্যপ্রেমের আদর্শ। স্বভাবসিদ্ধ সখ্য-অভিমানে এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইবেন—এইরূপ বিশ্বাসে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন, ভোজন ও খেলা করেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে চড়ান, আবার তাঁহার কাঁধেও চড়েন, মিষ্ট লাগিলে মুখের উচ্ছিষ্ট ফলও তাঁহাকে খাইতে দেন। মমতা-বুদ্ধির আধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের সমান সমান ব্যবহার। সঙ্কোচ ভাব না থাকায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের সমানই মনে করেন, কিন্তু শান্ত ও দাস্য ভাবের ভক্ত আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা হীন মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥"—"আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন। সর্ব্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।১৭ ও ২০)।

(৪) রাগভক্তির চতুর্থপর্ব্ব—**বাৎসল্যভাব**। সখ্যপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সমান বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু অনুগ্রহময়ী বাৎসল্য-প্রেমে মমতাবুদ্ধি এত অধিক হইয়া থাকে যে স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হীন ও ও পাল্য মনে করিয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য হিতোপদেশ দান, এমন কি তাড়ন-ভর্ৎসনাদি পর্য্যন্ত করা হয়। সখ্যপ্রেমে সখার সেরূপ অধিকার নাই। পিতা নন্দ মহারাজ ও মাতা যশোদা এই বাৎসল্য প্রেমের আদর্শ। পালক-জ্ঞানে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাণাধিক পুত্রের ঐশ্বর্য্য ভাব দেখিয়াও দেখেন না, আবার দেখিলেও তাহা মানেন না। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমে বশীভূত থাকিয়া পিতা নন্দের পাদুকা পর্য্যন্ত মস্তকে বহন করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-প্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস—সকলই আছে, অধিকন্তু ইহাতে লালন-পালন ও অনুগ্রহভাব বিদ্যমান।

(৫) রাগভক্তির পঞ্চমপর্ব্ব—সর্ব্বসাধ্যসার **মধুরভাব** বা কান্তাপ্রেম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য অন্তর মধ্যে তীব্র উৎকণ্ঠা ও প্রগাঢ় অনুরাগ এবং শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত নিজাঙ্গ দিয়া ও তাঁহার প্রেমসেবা। কান্তাপ্রেম বলিতে শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগ-তৃষ্ণা বুঝায়। ইহাই প্রেমের সর্ব্বোত্তমভাব, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা পাওয়া যায়। ব্রজাঙ্গনাগণ এই মধুর ভাবের আদর্শ। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তি স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রসমাধুর্য্যের অপূর্ব্ব আস্বাদন লাভ করিয়া থাকেন। মধুর ভাবে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস এবং বাৎসল্যের লালন সকলই আছে, অধিকন্তু ইহাতে নিজাঙ্গ দিয়া প্রেম সেবাও আছে। মধুর ভাবে মমতা বুদ্ধি, মানিতা ও রসবোধ

সর্বাধিক হয় বলিয়া প্রেমাধিক্যে, গুণাধিক্যে ও স্বাদাধিক্যে মধুর বা কান্তা-ভাবই সর্বোৎকৃষ্ট। ("পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে ॥") (চৈঃ চঃ ২।৮।৬৯) ব্রজগোপী-গণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ চিরকালের জন্য ঋণী হইয়া আছেন। (ভাঃ ১০।৩২।২২)। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—("প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥ (চৈঃ চঃ ১।৪।২৩)।")

সাধারণতঃ কান্তাপ্রেম বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তা ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমই বুঝায়। ("ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।৭৫)। যত প্রকার সাধ্য বস্তু আছে, সর্বশ্রেষ্ঠা গোপী **শ্রীরাধার প্রেমই** তাহাদের মুকুটমণি সদৃশ) শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তগণের পূজা শ্রেষ্ঠ।" তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। সমতা বুদ্ধির ও ঘনিষ্ঠতার আধিক্য হেতু ভক্তরাজ প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। মমতাতিশয় নিবন্ধন কতিপয় যাদব আবার পাণ্ডবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমস্ত যাদবগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, শিষ্য ও পরম প্রিয় উদ্ধব মহাশয় শ্রেষ্ঠ। যাদব-শ্রেষ্ঠ সেই উদ্ধব মহাশয় ব্রজরামাগণের অপূর্ব প্রেম ও সৌভাগ্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের পদরেণু-সেবিত গুল্মলতাদি জন্ম প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন। (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)। সুতরাং উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজরামাগণ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ব্রজরামাগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধিকাই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয়তমা। প্রেমময়ী শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহই প্রেমিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পিপাসা সর্বতোভাবে মিটাইতে সক্ষম নহেন। শ্রীরাধা-প্রেমই সাধ্য-শিরোমণি। ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের তুলনা নাই।

জগতে যিনি যেরূপ কর্ম করেন, মৃত্যুর পর তিনি সেইরূপ গতিলাভ করিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ সাধনা, তাঁহার সেইরূপ **ফলপ্রাপ্তি।**

যিনি কর্ম্মফলে অনাসক্ত, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করেন না। তিনি কর্ম্মী হইলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী বা যোগী বলা হয় (গীতা ৬।১)। সংসারের অধিকাংশই সকাম অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে আসক্ত। অতি অল্প লোকই নিষ্কাম ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। সকামভাবে ধর্ম্মাচরণ করিলে পার্থিব বা স্বর্গাদি সুখ ভোগ হইয়া থাকে। ভোগ-বাসনার পরিবর্ত্তে যাঁহারা মোক্ষ-বাসনাযুক্ত, তাঁহাদিগকে সকাম না বলিয়া নিষ্কাম বলা হয়। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কর্ম্মী, কেহ যোগী, কেহ বা জ্ঞানী, আবার কেহ বা ভক্ত। তন্মধ্যে অতি অল্প লোকই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মযোগের ফল স্বর্গাদি সুখভোগরূপ ভুক্তি ও চিত্তশুদ্ধি, যোগমার্গের ফল অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানমার্গের ফল সদ্যোমুক্তি ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি। (মুক্তি পঞ্চবিধ—যথা, সালোক্য (ইষ্টের সহিত একলোকে বাস), সামীপ্য (ইষ্টের সমীপে বাস), সার্ষ্টি (ইষ্টের সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি), সারূপ্য (ইষ্টের সমান রূপপ্রাপ্তি) ও সাযুজ্য (ইষ্টে যোগ বা লয়প্রাপ্তি)) সাযুজ্য মুক্তিতে সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ভক্তগণ ইহাকে বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অপর চারিপ্রকার মুক্তি সাধকের রুচি বা অভিপ্রায় অনুসারে সেবাযুক্তা বা সেবাশূন্যা হইতে পারে। ভক্তগণ সেবাশূন্যা মুক্তি কদাচ কামনা করেন না—"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।" (ভাঃ ৩।২৯।১৩)। তাঁহারা শুধু প্রেমসেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে যে সুখ, ভগবৎ-সেবা দ্বারা তদপেক্ষা কোটি গুণ অধিক সুখ লাভ হইয়া থাকে।

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন সকাম লোক পুণ্যবান গৃহীর ভোগস্থান এবং তদূর্দ্ধে যথাক্রমে অবস্থিত মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চারি লোক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর ভোগস্থান। যাঁহারা সকামভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন করেন, দেহাবসানে তাঁহারা স্বকৃত সুকৃতি অনুসারে স্বর্গ-ভোগাদি করিয়া

পুণ্যক্ষয়ে পুনঃ পুনঃ ধরায় জন্মগ্রহণ করেন। (গীতা ৯।২১)। আর যাঁহারা নিষ্কাম ভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরণ করেন, দেহান্তে তাঁহারা অনাসক্তভাবে মহরাদি লোক সকল ভোগ করিতে করিতে পরিশেষে মহাপ্রলয়ে মুক্ত হইয়া যান। তাঁহাদের আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। স্বধর্ম্মাচরণরূপ বাহ্যভক্তির ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, আত্মারামত্ব লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রেমলাভ হয় না। এই প্রেম এমনই এক অপূর্ব্ব বস্তু যে ইহাতে তৃপ্তিবোধ নাই, এই প্রেম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। আত্মাতে রমণ করিয়া আত্মারামগণের তৃপ্তির অভাব বোধ হয় না বলিয়া আত্মারামত্ব প্রেমের বাধক। ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলের মধ্যে আত্মারামত্ব ও মোক্ষ ভক্তগণের নিকট অতি হেয়। সুখস্বরূপ শ্রীভগবানের সেবা-সুখই সুখের পরাকাষ্ঠা। ব্রহ্মানুভবী আত্মারাম মুনিগণও ভগবৎকৃপায় ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। (ভাঃ ১।৭।১০)।

আসন্ন মুক্ত্যধিকারী মহর্ষিগণ **মহর্লোকে** বাস করেন। সহস্রযুগ পরিমিত এক ব্রাহ্ম দিনের অবসানে ভূরাদি সকাম ত্রিলোকের যখন ধ্বংস বা প্রলয় হয়, তখন এই মহর্লোক বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইলে, সেই তাপে মহর্লোক পর্য্যন্ত তাপিত হয়। তখন ভৃগু-আদি মহর্ষিগণ ঊর্দ্ধতন **জনলোকে** প্রস্থান করেন। জনলোক মহর্লোকের প্রায়ই সমান, জনলোকে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে মাত্র। জনলোকের ঊর্দ্ধে **তপোলোক**। তথায় পরমনৈষ্ঠিক চতুঃসনাদি শান্ত ভক্তগণ বাস করেন। বৈকুণ্ঠ পারিষদের ন্যায় তাঁহারা সর্ব্বত্র, এমন কি মুক্ত পুরুষগণেরও দুর্লভ বৈকুণ্ঠধামে পরিভ্রমণ করিয়া ভক্ত-সংসর্গে ভক্তিরস পান করিয়া থাকেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বলে তপোলোকে গমন করিয়া সাধক অন্তরে ভগবদ্দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার উপরে **সত্য লোক**। শেষশয্যাশায়ী লক্ষ্মীপতি

নারায়ণের সহিত লোক পিতামহ ব্রহ্মা তথায় অবস্থান করেন। সত্যলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমা। তাহার উপরে সচ্চিদানন্দঘন **বৈকুণ্ঠ লোক**।

গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীগণ স্বকৃত পুণ্যানুসারে মহরাদি লোকের যে কোন লোকেই গমন করুন না কেন, যদি তাঁহারা সকাম সাধক হন, তাহা হইলে ভোগান্তে তাঁহাদিগের মর্ত্ত্যলোকে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। তবে যদি কোন ভাগ্যবান পুরুষ পূর্ব্ব পুণ্যফলে মহরাদি লোক ভোগ করিতে করিতে ভোগে বিতৃষ্ণ হন, তবে তাঁহাদিগের কর্ম্মজনিত বন্ধন বা পুনরাবৃত্তি ঘটে না। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠাতার জ্ঞানোদয়ে সদ্যোমুক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত জ্ঞানীর স্থান বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্যধামের বহির্ভাগে বলয়াকারে অবস্থিত নির্ব্বিশেষ **সিদ্ধ লোক**।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্তে আমাকে ভজনা করিয়া বিশুদ্ধ চিত্ত ও ধর্ম্মাত্মা হয়েন এবং নিত্য শান্তি ভোগ করেন। (গীতা ৯।৩০,৩১)। কোটি মুক্ত পুরুষগণের মধ্যে একজন প্রকৃত ভক্ত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ভক্তিব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব অনুভূত হয় না। ভক্তিব্যতিরেকেও মুক্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠলোকের সুখপ্রাপ্তি ঘটে না। বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে দৃষ্ট হয়েন এবং পার্ষদগণ তাঁহার অনির্ব্বচনীয় লীলামাধুর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন। (ভক্তিলাভ বা সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন হইলে—"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডক-উপনিষদ)—অর্থাৎ হৃদয়গ্রন্থি বা রাগ-দ্বেষাদি বন্ধন বিনষ্ট হয়, সর্ব্বসন্দেহ বিদূরিত হয় এবং সমুদয় কর্ম্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।)

যাঁহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, তাঁহাদের অধিকাংশই ভোগবাসনাযুক্ত সকাম। সকাম ভক্তগণ বিষয়াদি ভোগ করিতে করিতে ভক্তির অচিন্ত্য

শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ বাসনাশূন্য হইয়া কালক্রমে ভগবৎ-পদ প্রাপ্ত হয়েন। নিষ্কাম ভক্তগণ দেহান্তে ভগবৎ-পদ সত্বই লাভ করিয়া থাকেন। নিষ্কাম ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা ঐশ্বর্যজ্ঞানে বা ভগবদ্‌বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভক্তিব্যতীত আর কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া মুক্তপুরুষগণেরও দুর্লভ বৈকুণ্ঠধাম সত্বই প্রাপ্ত হয়েন এবং শ্রীভগবানের সেবা করিয়া কোটি মোক্ষানন্দ-তুচ্ছকারী অতুল আনন্দ বৈচিত্রী উপভোগ করেন। ব্রহ্ম-ঐক্য হেতু তাঁহারা সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না।

শ্রীনারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহ প্রভৃতি অনন্ত স্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন। যিনি যে স্বরূপের উপাসক, বৈকুণ্ঠে তিনি সেই স্বরূপের ধাম প্রাপ্ত হয়েন। ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকিতে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। সমগ্র ভগবৎ-স্বরূপের নিখিল মাহাত্ম্য একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেতেই বিরাজিত। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরগণের সহিত স্বয়ংরূপে নিত্যলীলা বিলাস করিয়া থাকেন। ব্রজে বিশুদ্ধ মাধুর্যময় ভাবের পূর্ণতম বিকাশ। বিচারে বিঘ্ন হইবে বলিয়া স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন না। শ্রীকৃষ্ণে ভগবৎবুদ্ধি থাকিলে, পরমেশ্বর-জ্ঞানে তাঁহার ঐশ্বর্য অনুভব করিলে, ভয় গৌরবের সঞ্চার হয়। তাহার ফলে বিশুদ্ধ প্রেমের হানি হয়। সেরূপ অবস্থায়, ব্রজধামে স্বয়ং-ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না।

(যে ভক্তির রাগই আত্মা, রাগময়ী সেই ভক্তির নাম **রাগাত্মিকা-ভক্তি।**) রাগ বলিতে প্রেমময়ী প্রগাঢ় তৃষ্ণা ও স্বাভাবিকী পরম আবিষ্টতা বুঝায়। শৃঙ্গাররসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যের মধুর আকর্ষণে ব্রজপরিকরগণের চিত্ত নিত্য রাগময়ী। তাঁহাদের যাবতীয় আচরণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সুখের নিমিত্ত। নিজ নিজ সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই। নিত্যই তাঁহাদের নব নব আকাঙ্ক্ষা,

নিত্যই তাঁহাদের নব নব আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিয়াও তাঁহাদের সাধ মিটে না, শ্রীকৃষ্ণের নিমেষমাত্র অদর্শনও তাঁহাদের নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। পুত্রদর্শন মাত্রই পিতা নন্দের নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা বর্ষিত হইয়া থাকে। পুত্র স্মরণমাত্রই পুত্রপ্রাণা মা যশোদার স্তনযুগল হইতে ক্ষীর-ধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে। নন্দ-দুলালের অধরামৃত স্মরণমাত্রই গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রজের এইরূপ রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। স্বাতন্ত্র্যময়ী এই রাগাত্মিকা ভক্তিতে মলিন জীবের অধিকার নাই। ব্রজবাসীগণে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা এই রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজের নিজস্ব সম্পত্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না।

রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধ—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। যে ভক্তি সম্ভোগ তৃষ্ণাকে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত করে তাহাই কামরূপা, আর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্র-সখা প্রভৃতি যে ভাব তাহাই সম্বন্ধরূপা। "আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা বা মাতা বা বন্ধু"—এইরূপ অভিমানই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। ব্রজাঙ্গনাগণ কামরূপার উদাহরণ। তাঁহাদের প্রিয়সুখনিষ্ঠ অকৈতব প্রেম কামক্রীড়ার অনুরূপ বলিয়া ইহাকে 'কাম' নামে অভিহিত করা হয়। এই 'কাম'-শব্দ দ্বারা রাগময় বিশুদ্ধ প্রেমবিশেষই বুঝায়। ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্তে ইতর জনোচিত প্রাকৃত কামের গন্ধমাত্রও নাই, নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছারূপ কাম তাঁহাদের চিত্তে স্থানও পায় না। উদ্ধবাদি শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ গোপীগণের এই বিশুদ্ধ প্রেম ও তাঁহাদের চরণ রেণু প্রার্থনা করিয়া থাকেন। (ভাঃ ১০।৪৭।৬১।)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" (গীতা ৪।১১)—যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইভাবেই ভজনা করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু ব্রজগোপীগণের নিকট তিনি তাহা

রক্ষা করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে ব্রজধামে শারদীয় রাসে—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং" ইত্যাদি শ্লোকে (ভাঃ ১০।৩২।২২)—প্রেমপরবশ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভজনানুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে গোপীগণকে বলিয়াছিলেন—"হে সুন্দরীগণ! তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহবন্ধন ছেদন করিয়া, তোমরা সর্ববিধ সুখ সম্যক্‌ভাবে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল আমার সুখের জন্য আমার সঙ্গ করিয়াছ। আমি কিন্তু তোমাদিগের ন্যায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তোমাদের এই সুনির্মল প্রীতির প্রতিদান করিতে পারিলাম না। আর কোনও কালে যে তাহা করিতে পারিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই। অতএব আমি তোমাদের প্রেমে ঋণী হইয়াই থাকিলাম।" অবশ্য পরবর্তী কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধা-ভাব-দ্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ত্রিজগতে গোপীপ্রেমের ও শ্রীরাধা-মহিমার তুলনা নাই।

ব্রজবাসীগণে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বা লোভ জন্মিলে, যে ভক্তি তাহার অনুসরণ করে তাহার নাম **রাগানুগা ভক্তি।** আনুগত্যময়ী এই রাগানুগা বা রাগ-ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণ মাত্র। শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া ব্রজবাসীগণের ভাব-প্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহার প্রগাঢ় লোভ জন্মিয়াছে, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। এইরূপে প্রকৃত অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করাই উচিত। ব্রজপরিকরগণের আনুগত্যময়ী এই রাগানুগা ভক্তির সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভে সাধনায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা ব্যতীত আর কিছুই তাঁহারা বাঞ্ছা করেন না, শাস্ত্র শাসনের ভয়ও তাঁহাদের থাকে না।

বাহ্য ও অন্তর ভেদে রাগানুগার ভজন দ্বিবিধ—বাহ্যে সাধক দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান এবং অন্তরে নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনা করিয়া নিজ ভাবানুকূল কোন শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরের আনুগত্যে দিবানিশি ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-চিন্তা ও সেবা-রস-আস্বাদন। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৫।৩৮) হইতে জানা যায় যে ভগবান কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—"আমি সকলের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রসম স্নেহভাজন, সখা-তুল্য বিশ্বাসের পাত্র, গুরুবৎ উপদেষ্টা, সুহৃৎসম হিতকারী ও ইষ্টদেব-তুল্য পূজনীয়। যাহারা এইরূপে আমার ভজনা করে, মদীয় কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।" ব্রজধামে ব্রজপরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতি-পুত্র-প্রভু-সখাদির ভাব পোষণ করিয়া সেই সেই ভাবের অনুকূল সেবা করিয়া থাকেন। ব্রজ-পরিকরগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করা এবং দর্শক ভাবে ধ্যানে ব্রজরস আস্বাদন করা রাগানুগা ভজনের উদ্দেশ্য। মা যশোদার বাৎসল্য সেবার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ধ্যানে তাহা দর্শন করিবার অভ্যাস করিলে ব্রজের বাৎসল্য রস আস্বাদন করা যায়। সেইরূপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ধ্যানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনের ও সেবার আনুকূল্য করিলে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রসমাধুর্য্য আস্বাদন করা যায়। রাগমার্গে অন্তর সাধন বা লীলা-স্মরণই মুখ্য ভজনাঙ্গ, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বাহ্য সাধন দ্বারা ইহা পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। সাধনের পরিপক্কাবস্থায় লীলা-স্মরণ মুখ্যরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—ব্রজের এই চারি ভাবের কোনও একটী লইয়া রাগ-মার্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে দেহান্তে ভাবযোগ্য দেহ লাভ করিয়া ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায়। দাস্য ভাবের সাধক রক্তক-পত্রকাদির আনুগত্যে, সখ্য ভাবের সাধক সুবল-মধুমঙ্গলাদির আনুগত্যে, বাৎসল্য ভাবের সাধক নন্দ-যশোদাদির আনুগত্যে এবং মধুর-

ভাবের সাধক শ্রীরাধিকার কোনও সখী বা মঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা চিন্তা করেন। ব্রজের এই চারি ভাবের মধ্যে দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে ঘনিষ্ঠাধিক্য ও স্বাদাধিক্য থাকায় সেবা-মাহাত্ম্যে মধুর ভাবের উপাসনা বা সেবাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সাধ্য-শিরোমণি। [মধুর ভাবই সর্বোত্তম ভাব,—ব্রজের গোপীগণই ইহার আদর্শ। "নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥ সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয়॥"] (চৈঃ চঃ ২।৮।১৭৬-৭।) স্বসুখবাসনাহীন বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় গোপীপ্রেম লাভ করিবার জন্য যথার্থই যাঁহার লোভ জন্মিয়াছে, তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী প্রেমসেবাপ্রাপ্তির জন্য মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। শ্রুতিচরী গোপীগণই তাহার প্রমাণ। শ্রুতিগণ ব্রজ-গোপীগণের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক রাগমার্গে ভজন করিয়া ভাবযোগ্য গোপীদেহে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। ["তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদশ্রুতিগণ। রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।১৮০)।] বিধিমার্গের ভজনে বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণাদি স্বরূপকে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে না।

রাগমার্গের ভজন বলিতে প্রধানতঃ মধুর ভাবের ভজনই বুঝায়। ভাবনা দ্বারা ভাবরাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধা কোন সখী বা মঞ্জরীর আনুগত্যে গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মিলনের ও সেবার আনুকূল্য করিয়া গোপীপ্রেম আস্বাদন করাই এইরূপ ভজনের উদ্দেশ্য। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে হইলে মধুর ভাবের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মধুর ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ সুখলভ্য। মধুর ভজনে দ্বাদশ-বর্ষীয়া গোপ-কিশোরীরূপে স্বীয় গুরুরূপা মঞ্জরীর বামপার্শ্বে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা

করিয়া নিকুঞ্জ-বিলাসী যুগলকিশোরের লীলাদি স্মরণ ও সেবাচিন্তা করিতে হয়। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন—"সখার ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে, তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে।" গোপী অনুগত হইলে সাধক দেহে গোপীভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মধুর ভাবের সাধক গুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্যে সেবাপরা মঞ্জরীগণের মুখ্যা শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণাশ্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীরূপমঞ্জরীই কৃপা করিয়া তাঁহাকে ললিতাদি কোন সখীর আনুগত্য দিয়া যুগলকিশোরের সেবায় নিযুক্ত করেন। ব্রজের নিকুঞ্জসেবা লাভের জন্য সাধকের হৃদয়ে প্রবল অনুরাগ জন্মিলে সিদ্ধদেহ স্বয়ংই স্ফুর্তি পায়। শ্রীরাধার অষ্ট সখীর মধ্যে ললিতার তাম্বূল সেবা, বিশাখার চন্দন-কর্পূর সেবা, চিত্রার বস্ত্র-অলঙ্কার সেবা, চম্পকলতার চামর সেবা, তুঙ্গবিদ্যার গীত-বাদ্য সেবা, ইন্দুলেখার নৃত্য সেবা, রঙ্গদেবীর অলক্তক সেবা এবং সুদেবীর জলসেবাই প্রসিদ্ধ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভই জীবের সাধ্য এবং তাঁহাদের মধুর লীলা স্মরণই তাহার সাধন। গোপীভাবে লীলা স্মরণ ব্যতীত যুগল কিশোরের নিকুঞ্জ সেবালাভ হয় না। বিষয়াসক্ত মলিন জীবের হৃদয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্ময় রসলীলার স্ফূর্তি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিত-বিগ্রহ শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপাসাপেক্ষ। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন —"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি। গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী॥" শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তি না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের রসলীলা হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত যুগল-কিশোরের সুমধুর লীলারসের আস্বাদ লাভ করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারসে নিমগ্ন হইতে পারিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর ব্রজলীলা স্বতঃই স্ফুরিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীগৌরলীলার নিত্য সম্বন্ধ। শ্রীগৌরাঙ্গকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলেও শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন

হয়। শ্রীসনাতনগোস্বামীপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গৌরলীলা স্মরণ করিয়া ব্রজভাবের আবেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিতেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলেন—"রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥" (চৈঃ চঃ ১।১০।৯৮)।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের কান্তা। কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে কুব্জাদিতে সাধারণীরতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা রতি এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণে সমর্থারতি দৃষ্ট হয়। **সাধারণী রতির** মুখ্য কারণ হইল সম্ভোগেচ্ছা বা আত্মসুখেচ্ছা—শ্রীকৃষ্ণসুখেচ্ছা তাহার সহিত গৌণভাবে জড়িত থাকে। গাঢ়তার অভাব হেতু সাধারণী রতির উন্মেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণদর্শনের অপেক্ষা থাকে। সম্ভোগেচ্ছার নিদানস্বরূপ এই সাধারণী রতিতে সম্ভোগেচ্ছার হ্রাস হইলে এই রতিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

সমঞ্জসা রতির মুখ্য কারণ হইল পত্নীত্বাভিমান ও শ্রীকৃষ্ণসুখেচ্ছা—সম্ভোগেচ্ছা তাহার সহিত গৌণভাবে জড়িত থাকে। কখনও কখন এই রতি সম্ভোগের তৃষ্ণা জন্মাইয়া থাকে। এই সম্ভোগ তৃষ্ণা হইতে শৃঙ্গাররসাত্মক যে হাব-ভাবাদি প্রকাশ পায়, তাদ্দ্বারা রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ বশ করা দুঃসাধ্য হয়। সমঞ্জসা রতি স্বাভাবিকী হইলেও, ইহার উন্মেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণের অপেক্ষা থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ-সুখই **সমর্থা রতির** একমাত্র লক্ষ্য। ইহাতে সম্ভোগেচ্ছা বা আত্মসুখানুসন্ধানের লেশমাত্রও থাকে না। ইহার উন্মেষের জন্য রূপাদির দর্শন বা গুণাদি শ্রবণের অপেক্ষাও নাই। অনন্যসাপেক্ষ এই সমর্থা রতি আপনা আপনিই আবির্ভূত হয়। ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াও কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকার অন্তরাত্মা দ্রবীভূত হইয়া যায়। শ্রীরাধাপ্রমুখ ব্রজাঙ্গনাগণের সমর্থারতি স্বভাবসিদ্ধা, তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা সতত কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী। তাঁহাদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি শ্রীকৃষ্ণ

প্রীতির অনুকূল কার্য্যে নিয়ত নিয়োজিত থাকে। "গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখে অবসান।" লজ্জা, মান, কুল, শীল, ধর্ম্ম সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, দুস্ত্যজ স্বজন ও আত্মসুখচিন্তা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরামাগণ নিজাঙ্গ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সুখ বাঞ্ছা করেন। তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রেম কান্তের দোষগুণের অপেক্ষা করে না। রাসোৎসবে ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)। ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া পরম ভাগবত উদ্ধব মহাশয় তাঁহাদিগের চরণ রেণু বার বার বন্দনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"আমি যেন শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণের চরণরেণু দ্বারা অভিষিক্ত গুল্ম লতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ করি। (ভাঃ ১০।৪৭।৬১) মুনিগণও ব্রজ গোপীগণের মানসিক বিকার ও পরম প্রেমভাব নিত্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮) ত্রিজগতে গোপীপ্রেমের তুলনা নাই।

ব্রজধামে কেবলা বা শুদ্ধারতি এবং পুরদ্বয়ে অর্থাৎ মথুরায় ও দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্রা রতি দৃষ্ট হয়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শান্ত ও দাস্যভাবের উদ্দীপক বা পোষক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাবে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্য দর্শনে শঙ্কা ত্রাসাদি উৎপন্ন হইলে প্রীতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সখ্যভাবের উপাসক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট নিজ ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন গীতা (১১।৪২)। পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ঈশ্বর বুদ্ধিতে পুত্রের স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৩।২৩)। প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বাক্য শুনিয়া ত্যাগভয়ে ভীতা হইয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৬০।২২)। ইঁহারা সব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্রা

রতির উদাহরণ। মাধুর্য্য-জ্ঞানময়ী শুদ্ধারতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবৃতি করিয়া রাখে বলিয়া ইহাতে প্রীতি বা ভালবাসা সকল সময়ে সমানভাবে থাকে। শিশুপুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াও মা যশোদার বাৎসল্যভাব অপনীত হয় নাই, বাৎসল্যপ্রেমের প্রভাবে তিনি পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীতা হইলেন। (ভাঃ ১০।৮।৩৭-৯)। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইলেও মা যশোদার বাৎসল্যভাব বা ব্রজদেবীগণের মধুরভাব বিচলিত হয় না, বরং দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের বিশুদ্ধ প্রেমের নিকট ঐশ্বর্য্য-প্রকটনের কোনও গৌরব থাকে না। মমতাবুদ্ধির সর্ব্বাকর্ষী টানে তাঁহারা ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও দেখেন না, আর দেখিলেও তাহা মানেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বাশ্রয়—এইরূপ জ্ঞান তাঁহাদের ছিল বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ এত প্রবল যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়াই মনে করেন না। তাঁহারা কখনও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন নাই। তাঁহাদের হৃদয় সদাই বিশুদ্ধ মাধুর্য্যরসে পূর্ণ থাকে।

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সেই বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবৎ-কৃপায় **রতি** বা ভাবের উদয় হয়। রতি বা ভাব প্রতিকূল অবস্থা দ্বারা বিচলিত না হইলে তাহার নাম হয় **প্রেম**। "শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করিব"—ইহাই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। প্রেমের উদয়ে প্রিয়তমের দোষকে গুণ বলিয়া প্রতীতি হয়, প্রিয়তম শত শত দুঃখ দিলেও তাহা অমৃততুল্য বোধ হয়, তখন প্রিয়তমের বিন্দুমাত্র দুঃখও সহ্য করিতে পারা যায় না। পুরুষার্থ-শিরোমণি এই প্রেম মহাধন গাঢ়তা অনুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়"॥ (চৈঃ চঃ ২।২৩। ৪২)। ইক্ষুরসের ন্যায় প্রেমও ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকিলে, তাহা উত্তরোত্তর স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও পরিশেষে মহাভাবে পরিণত হইয়া উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা ও স্বাদাধিক্য লাভ করে।

।৫প্রেম গাঢ় হইতে থাকিলে, তাহার প্রথম অবস্থার নাম **স্নেহ**। ।৬চিত্ত দ্রবত্বই স্নেহের লক্ষণ। স্নেহের উদয় হইলে দর্শনে, শ্রবণে বা স্মরণে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুবারি বিগলিত হইতে থাকে। তখন প্রিয়জনকে দেখিয়াও সাধ মিটে না। তাঁহার ক্ষণিক বিরহও তখন অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ ভেদে স্নেহ দ্বিবিধ। "তুমি আমারই" —এইরূপ মদীয়তাময় স্নেহের নাম **মধুস্নেহ** এবং "আমি তোমারই" এইরূপ তদীয়তাময় স্নেহের নাম **ঘৃতস্নেহ**।৭ শ্রীরাধার মধ্যে মদীয়তাময় মধুস্নেহ এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যে তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহ প্রকাশ পায়। মধুর ন্যায় মধুস্নেহ সদাই দ্রব থাকে, কিন্তু ঘৃতস্নেহ ঘৃতের ন্যায় জমিয়া যায়। মধু যেমন স্বয়ং স্বাদু, সেইরূপ মধুস্নেহের মাধুর্য্য আপনা হইতেই প্রকটিত হয়। ঘৃত আপনা আপনিই মধুর হয় না, লবণাদির সংযোগে তাহা আস্বাদ্য হইয়া থাকে। সেইরূপ ঘৃতস্নেহ ভাবান্তরের সহিত মিলিত হইলে স্বাদুতা প্রাপ্ত হয়। তদীয়তাময় এই ঘৃতস্নেহে সম্ভ্রম বা গৌরব জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। কথিত আছে—রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ঘৃতস্নেহবতী চন্দ্রাবলীর বামহস্তখানি নিজ স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন। গৌরববুদ্ধি বশতঃ চন্দ্রাবলী তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া বামহস্তের পরিবর্ত্তে দক্ষিণ হস্তখানি অর্পণ করিলেন এবং পাছে নিজ পাদদ্বয় শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ করে, এই ভয়ে পাদদ্বয় সঙ্কোচ করতঃ অন্যদিকে নিক্ষেপ করিলেন।

।।প্রেমের গাঢ়তর অবস্থায় মনের ভাব সঙ্গোপন করিবার জন্য এবং অভিনব রস মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য প্রেমের গতি কুটিলতাময় ভাব বৈচিত্রী ধারণ করিলে, তখনকার প্রেমকে **মান** বলা হয়।৮ সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতি স্বভাবতঃ কুটিল। সে কারণে সামান্য কারণে বা বিনা কারণেও মানের উদয় হইয়া থাকে। মানে বাহ্যিক উপেক্ষা থাকিলেও, অন্তরে অনুরাগ সমান ভাবেই বিদ্যমান থাকে। মানাবস্থায়

সেবা-সঙ্কোচ থাকিলেও এবং আকাঙ্ক্ষিত আলিঙ্গন-চুম্বনাদির অভাব হইলেও, এই মান রসের নিধান, প্রেমমাধুর্যে ভরা।

॥ মান যখন গৌরব-রহিত হইয়া বিশ্রম্ভ বা বিশ্বাসভাব ধারণ করে অর্থাৎ প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদবুদ্ধি জন্মায়, তখন তাহার নাম হয় **প্রণয়**।॥ তদবস্থায় পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। এবং অভেদবুদ্ধি বশতঃ দেহ-মন পরিচ্ছদাদির ঐক্য ভাবনা হইয়া থাকে। কথিত আছে—একদা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় গ্রীবা ন্যস্ত করিয়া মনের সুখে কুঞ্জমধ্যে বসিয়া আছেন। প্রেমোদাশ্রুধারায় তাঁহার মুখ মণ্ডল ধৌত হইতে লাগিল। সেই সময়ে শ্রীমতী ঐক্যভাবনাহেতু বিন্দু-মাত্র সঙ্কোচ বোধ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পীত-বসনদ্বারা নিজ অশ্রুসিক্ত মুখ-মণ্ডল মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহাই সম্ভ্রমশূন্য ঐক্যতা নিবন্ধন প্রণয়ের উদাহরণ।

সাধারণতঃ স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া সেই মান প্রণয়ে পরিণত হয়। আবার কোনও স্থানে স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া সেই প্রণয় মানে পরিণত হয়। এইরূপে মান ও প্রণয় এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে। যেখানে মান, সেখানেই প্রণয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরববুদ্ধি না থাকায় বিশ্রম্ভাত্মক প্রণয়ই শ্রীরাধিকাদি গোপিকাগণের মানের ভিত্তিস্বরূপ। শ্রীরাধিকার মানে সঙ্কোচ বা গৌরব বুদ্ধির লেশ মাত্রও থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ মানবতী শ্রীমতীর চরণ ধরিয়া সাধিলেও শ্রীমতী বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়েন না।

গৌরববুদ্ধি থাকায় মহিষী সত্যভামার মানে বিশ্রম্ভাত্মক প্রণয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রীসনাতনগোস্বামীপ্রণীত বৃহৎভাগবতামৃত নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে রৈবতক প্রদেশে বিশ্বকর্ম্মা-রচিত নববৃন্দাবনে ব্রজভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের আচরণ ও ব্রজভাগ্য-বৈভব সহ্য করিতে না পারিয়া দেবী সত্যভামা ঈর্ষাবশতঃ মান করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে

শ্রীকৃষ্ণ রোষভরে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণে গৌরববুদ্ধি থাকায় দেবী সত্যভামা তখন সভয়ে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পতিত হয়েন। অন্য এক সময়ে দেবী সত্যভামা পারিজাত-বিষয়ে রুক্মিণী দেবীর সৌভাগ্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঈর্ষাবশতঃ মান করিয়াছিলেন। ঈর্ষাই সত্যভামার মানের হেতু, কিন্তু রাধারাণীর মানের মূলে থাকে কান্তের অসুখাশঙ্কা ও সুখানুসন্ধান। যাহাতে দুঃখের সম্ভাবনা আছে, শ্রীকৃষ্ণকে তাহা করিতে দেখিলে শ্রীরাধা মানবতী হইয়া কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মানবতী শ্রীমতীর তৎকালীন ভ্রূকুটিসমন্বিত বদনমণ্ডল ও কম্পিত অধরাদি নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের অপার আনন্দ হইয়া থাকে। শ্রীমতী মান করেন শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত আবার মান ছাড়িয়াও দেন শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত। যতটুকু মান করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হইতে পারে, শ্রীরাধা ততটুকুই মান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-বাসনা হইতেই শ্রীরাধার প্রণয়-রোষের বা মানের উৎপত্তি। নিতান্ত আপনার জন না হইলে কেহই এইরূপ প্রণয়রোষ দেখাইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার গাঢ় প্রণয় মানের আকারে প্রকাশিত হইয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পূজ্যা করায় এবং স্বয়ং প্রিয়রূপে অনুভূত হয়। শ্রীরাধার প্রেমের ও সৌভাগ্যের তুলনা নাই। স্বয়ং সত্যভামা দেবী শ্রীমতী রাধারাণীর সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছা করেন।

৭। প্রণয়ের ঘনীভূত অবস্থার নাম **রাগ**। তদবস্থায় মনে এরূপ প্রবল তৃষ্ণা জন্মে যে দর্শন বা সঙ্গাদি লাভের চেষ্টায় অথবা মিলনকালে দারুণ দুঃখ বোধ হইলেও সেই দুঃখকে পরমসুখ বলিয়া বোধ হয়, আবার বিরহ-কালে অত্যন্ত সুখকেও পরম দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে— জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত এবং খড়্গতুল্য তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট সূর্য্যকান্তমণি নামক প্রস্তর বিশেষের উপর তুলাসদৃশ স্বীয় কোমল পাদদ্বয়

স্থাপন করিয়া শ্রীরাধা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধাপান করিতেছিলেন। দর্শনানন্দে আত্মহারা হওয়ায় অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ গিরিকণ্টক-স্পর্শজনিত দারুণ দুঃখও তখন শ্রীরাধার নিকটে পরমসুখময় বোধ হইতে লাগিল। রাগাবস্থায় নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়াও প্রিয়জনের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আইসে।

রাগের প্রগাঢ় অবস্থার নাম **অনুরাগ**। অনুরাগ-অবস্থায় প্রিয়জনকে নিরত দর্শনাদি করিয়াও তাঁহাকে নিত্যই নবীন, নিত্যই নূতন বলিয়া বোধ হয়। তদবস্থায় তৃষ্ণার আধিক্য হেতু পূর্বজ্ঞান বিলুপ্ত হয় বলিয়া তখন মনে হয় যেন এই প্রথম দেখা, যেন এই প্রথম অনুভব। প্রিয়তমা সখী ললিতাকে শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"সখি! কৃষ্ণ এই অক্ষর দুইটী যাহার নাম, তিনি কে?" তাহা শুনিয়া ললিতা বলিলেন—"সে কি সখি? তুমি উৎকণ্ঠায় অন্ধ হইয়া একি বলিতেছ? তুমি কি তাহার পরিচয় জান না? এখনও যে তুমি আমা-কর্তৃক তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিলে! তুমি যে সততই তাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিয়া থাক।"

অনুরাগ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া আস্বাদের বিষয় হইলে, তখন তাহার নাম হয় **ভাব**। তাহার পর **মহাভাব**। এই মহাভাব একমাত্র ব্রজাঙ্গনাগণেই বিদ্যমান। দ্বারকার মহিষীগণও ইহার অধিকারিণী নহেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাব ও মহাভাবকে দুইটী স্বতন্ত্র স্তর-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী ভাব ও মহাভাবকে একার্থ-বাচক-রূপে ধরিয়া তাহার প্রথমাবস্থাকে রূঢ়ভাব এবং পরাবস্থারূপ অধিরূঢ় ভাবকে মহাভাব বলিয়াছেন। গোস্বামীপাদের মতে রূঢ়ভাবে সাত্ত্বিক-ভাব সকল উদ্দীপ্ত এবং অধিরূঢ় ভাবরূপ মহাভাবে সুদ্দীপ্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

রূঢ়ভাবের উদয়ে কতকগুলি অনুভাব লক্ষিত হয়—যথা (১) নিমিষের অসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ব্যাঘাত হয় বলিয়া চক্ষুর নিমিষ পতনের কালটুকু পর্যন্ত অসহ্য বলিয়া বোধ হওয়া, (২) কল্পক্ষণত্ব অর্থাৎ মিলনকালে অতিদীর্ঘ সময়ও নিমিষতুল্য বোধ হওয়া, (৩) ক্ষণকল্পত্ব অর্থাৎ বিরহকালে ক্ষণ পরিমাণ কালও কল্পতুল্য বোধ হওয়া, এবং (৪) আর্তি শঙ্কায় খিন্নতা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে থাকিলেও, তাঁহাতে অত্যধিক প্রীতি ও মমতা বুদ্ধির আধিক্যবশতঃ বৃথাপীড়ার আরোপণে তাঁহার মরণ পর্যন্ত অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া খেদপ্রাপ্ত হওয়া। গাঢ় আসক্তি-বশতঃ মোহাদির অভাবেও তখন দেহাদিরও বিস্মরণ হইয়া যায়। প্রিয়সখা উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন (ভাঃ ১১।১২।১১)—"সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় মুনিগণ যেমন সমাধিকালে নামরূপাদি কিছুই অবগত থাকেন না, সেইরূপ আমাতে আসক্তি-বশতঃ গোপীগণ স্বীয় দেহ ও দূর-নিকট সম্বন্ধ কিছুই জানিতে পারিত না।" প্রেমের পূর্ণতম বিকাশাবস্থারূপ মহাভাবে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব গুলি ও সাত্ত্বিকভাব সকল কোন এক অনির্বচনীয় বিশিষ্টদশা প্রাপ্ত হয়। মহাভাবের উদয়ে দেহমন ইন্দ্রিয়াদি মহাভাবাত্মক হইয়া যায়, মহাভাব হইতে তখন আর তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। মিলন বা বিরহকালে মহাভাব হইতে যে সুখ বা দুঃখের উদয় হয় তাহা অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয়, তাহা কেবল অনুভববেদ্য। মহাভাবোত্থ সুখ বা দুঃখের এক কণার আভাস মাত্রও অন্য কোনও স্থানে দৃষ্ট হয় না।

"রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে। মহিষীগণের রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা-নিকরে॥" (চৈঃ চঃ ২।২৩।৩৭)। একমাত্র মধুরা রতিতেই রূঢ়ভাব ও অধিরূঢ় ভাবরূপ মহাভাব প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশত আট মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা ও মিত্রবিন্দা এই আটজন প্রধানা। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা রুক্মিণী দেবী ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠা এবং দেবী সত্যভামা

সৌভাগ্যে অধিকা। রুক্মিণী প্রভৃতি প্রিয়া মহিষীগণের প্রেমের গতি ভাবের প্রথমাবস্থা রূপ রূঢ় ভাব পর্য্যন্ত। তাঁহারাও ব্রজগোপীগণের ন্যায় অধিরূঢ়ভাবরূপ মহাভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন না। মহাভাবেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ।

শান্তরতি ও কুব্জাদির সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত, দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত, সখ্যরতি অনুরাগের পূর্ণ সীমা পর্য্যন্ত এবং বাৎসল্য রতি ও মহিষী-গণের সমঞ্জসারতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সুবলাদি প্রিয় নর্ম্ম সখাগণের সখ্যরতি ও রুক্মিণী প্রভৃতি প্রিয় মহিষীগণের রতি ভাবের প্রথমাবস্থা রূপ রূঢ়ভাব পর্য্যন্ত এবং ব্রজগোপীগণের সমর্থা রতি অধিরূঢ় ভাবরূপ মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৫ মোদন ও মাদন ভেদে মহাভাব দুইপ্রকার। মাদনাখ্য মহাভাবই প্রেমের চরম উৎকর্ষাবস্থা। ইহা একমাত্র শ্রীরাধিকার সম্পত্তি। শ্রীরাধা ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে, এমন কি স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও ইহার অভিব্যক্তি নাই। অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও কৃষ্ণগত-প্রাণা শ্রীরাধা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সুখ বাঞ্ছা করেন। প্রিয়তমের বিন্দুমাত্র দুঃখও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে মহামতি উদ্ধব ব্রজের সংবাদ লইবার জন্য মথুরা হইতে ব্রজে আসিয়া-ছিলেন। মথুরায় ফিরিয়া যাইবার সময় তিনি প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবি! তোমার প্রিয়তমকে আমি কি সংবাদ উপহার দিব?" তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"তাহাকে বলিও, তাঁহার সুখেই আমাদের সুখ। তিনি এখানে ফিরিয়া আসিলে আমাদের সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয়, তবে তিনি যেন কখনও এখানে না আসেন। আর যদি তিনি মথুরায় থাকিলে সুখী হয়েন, তাহাতে আমাদের যত দুঃখই হউক না কেন, তিনি যেন চিরকাল সেইখানেই থাকেন।" শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া

শ্রীরাধা নিজ মৃত্যু কামনা পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন—মৃত্যুর পর যেন আমার দেহের ক্ষিতি-অংশ শ্রীকৃষ্ণের যাতায়াত-পথে গিয়া মিশে, জলীয় অংশ শ্রীকৃষ্ণের কেলিসরোবরে গিয়া মিশে, ইত্যাদি। এইরূপে শ্রীরাধা মৃত্যু স্বীকার পূর্ব্বক পঞ্চভূতাত্মক নিজ দেহের পঞ্চভূত দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ কামনা করিতেন। বাধিকারমণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার যে চিন্ময় প্রেম, তাহার স্বরূপ মূকের রসাস্বাদনের ন্যায় অনির্ব্বচনীয়। শ্রীরাধার প্রেম এমন এক পদার্থ, যাহা বিবেচনার বিষয় হইলে অন্তর্ধান করে, আবার বিবেচনার বিষয় না হইলেও অন্তর্ধান করে। শ্রীরাধার প্রেম চক্ষু, অধর, ললাট, বক্ষঃস্থল প্রভৃতির লক্ষণে ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাহা মুখে ব্যক্ত হইলে লঘুতা প্রাপ্ত হয়। ইহা কেবল অনুভববেদ্য।

"প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সর্ব্বপ্রধানা গোপী শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণ-কান্তাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।" শ্রীরাধিকা হইতেই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ ও ব্রজের গোপীগণ—এই ত্রিবিধ কৃষ্ণ-কান্তাগণের বিস্তার হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমনোমোহিনী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণধ্যানে এতই বিভোরা হইয়া থাকেন যে তাঁহার—"যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥" শ্রীকৃষ্ণব্যতীত আর কিছুরই তিনি অনুসন্ধান রাখেন না। সকল সময়েই তিনি শ্রীকৃষ্ণভাবে পূর্ণ হইয়া থাকেন এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। সকল সময়েই তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ, কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতমাখা কণ্ঠস্বর ও বেণুধ্বনি, নাসিকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণমাতান অঙ্গসৌরভ, জিহ্বায় জগৎকর্ণরসায়ন শ্রীকৃষ্ণকথা ও তাঁহার অধর সুধার আস্বাদন এবং সর্ব্বাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোটীন্দুশীতল স্পর্শসুখ স্ফুরিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণসুখ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, আর কিছুই চাহেন না। শ্রীরাধা বলিতেছেন—"অন্য রমণীর সহিত বিলাসে আমার প্রিয়তম সুখ পান না, তখন তিনি আমার দুঃখ চিন্তা করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকেন।

অন্যের অনুরোধে তিনি আমার নিকটে আগমন করিতে না পারিলে তাঁহার দুঃখ চিন্তা করিয়া আমিও দুঃখিত হই। আমার বেশভূষণাদি তাঁহার সুখের কারণ হইল না,—এই ভাবিয়া আমি তখন ক্রন্দন ও মান করিয়া থাকি।"

নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে ব্রজগোপীগণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অনাদিকাল হইতে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ নিজাঙ্গ দিয়া কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সাধন-প্রভাবে গোপীত্ব লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধাগণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। ললিতা বিশাখাদি সখীগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধা—তাঁহাদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী। মঞ্জরীগণ শুধু যুগল-মিলনের ও সেবার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। কতিপয় মঞ্জরী নিত্যসিদ্ধা হইলেও তাঁহারা কেহই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগযোগ্যা বলিয়া মনে করেন না। কথিত আছে, বংশী অন্বেষণ ছলে শ্রীকৃষ্ণ তুলসীমঞ্জরীকে সম্ভোগ করিতে চাহিলে তুলসী মিনতি করিয়া বলিলেন—"আমি তব দাসী হই, স্পর্শযোগ্যা নহি।" ইহাঁরা শ্রীরাধার প্রিয়া দাসী ও অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারিণী। যুগলকিশোরের সুরতশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া ইহাঁরা ব্যজনাদি অনুকূল সেবা করিয়া থাকেন। স্বকীয় সুখেচ্ছাশূন্যা এই নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীগণের নিকট যুগলকিশোরের কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ হয় না। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধা ও সখীগণ অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা।

প্রেমবৈচিত্র্য সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীমতী রাধিকাই ললিতাদি সখী ও সেবাপরা মঞ্জরীরূপে নিজ কায়ব্যূহ প্রকটিত করিয়া সেই সেই রূপেও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। সাধারণ কায়ব্যূহে আকারের বা স্বভাবের ভেদ থাকে না বটে, কিন্তু রসলীলার বিস্তারের নিমিত্ত শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা গোপীগণের আকার ও স্বভাব বিভিন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন আকার ও স্বভাব-বিশিষ্ট হইলেও কৃষ্ণকান্তা ব্রজাঙ্গনাগণ সকলেই

শ্রীরাধিকারই শরীর-বিশেষ। শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করেন। তিনিই আবার নিজ কায়ব্যূহরূপা সখী-গণের সহিত সঙ্গম করাইয়া এবং সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া কোটিগুণ অধিক সুখ অনুভব করেন। "যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥ নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়। আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।১৭১-২)।

শ্রীরাধার পরম প্রেষ্ঠ সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই আট জন সর্ব্বগুণ-ভূষিতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তাঁহারা মহাভাবের অধিকারিণী হইয়াও শ্রীরাধিকার প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ বশতঃ "আমরা শ্রীরাধারই"—এইরূপ অভিমান পোষণ করেন। শ্রীরাধায়ও শ্রীকৃষ্ণে সমান প্রেম বহন করিয়াও তাঁহারা রাধা-সুখ-পোষণ হেতু শ্রীকৃষ্ণে এবং কৃষ্ণ-সুখ-পোষণ হেতু শ্রীরাধিকাতে অধিকপ্রীতি প্রদর্শন করেন। শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মানকালে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ দেখাইয়া শ্রীরাধিকাকে ভর্ৎসনাদি করেন। আবার শ্রীরাধার খণ্ডিতা-অবস্থায় তাঁহারা শ্রীরাধার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনাদি করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা রসের উপকরণ-স্বরূপ হইয়া যুগলকিশোরের সুখ-বৃদ্ধির সহায়তা করেন। তাঁহাদের ভর্ৎসনাদি যুগল কিশোরের সুখেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাঁহারা শ্রীরাধার প্রায় সমবয়স্কা, বেশাদিতে তাঁহার সদৃশা ও তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসের পাত্রী।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর রসলীলায় শুধু শ্রীরাধার সখীগণেরই অধিকার। তাঁহারাই লীলাদি বিস্তারপূর্ব্বক রসপুষ্টির সহায়তা করিয়া রসমাধুর্য্য আস্বাদন করেন। "সখী বিনু এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি। সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি ॥ রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা

সাধ সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥” ॥(চৈঃ চঃ ২।৮।১৬২-৩)। শ্রীরাধার কোন সখীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া যে সাধক রাত্রি দিন সিদ্ধ-দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর রসলীলা স্মরণপূর্বক মধুরভাবে ভজন করেন, তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জসেবা লাভ করিয়া থাকেন।” ॥“গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥” (চৈঃ চঃ ২।৮।১৮৫-৬) ॥ ব্রজগোপীগণের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া ঐশ্বর্যজ্ঞানে ভজনা করিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই তাহার দৃষ্টান্ত। শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতি শ্রীনারায়ণের প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীই সর্বপ্রধানা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ লাভ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।১৬।৩৬)। ব্রজসুন্দরী-গণের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ ও প্রেমসেবা লাভ করিতে পারেন নাই। (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)।

শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণের চিত্তে নিজেদের সুখ দুঃখের ভাবনা স্থান পায় না; ৎ“আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥” (চৈঃ চঃ ১।৪।১৪৯)। ৎ শ্রীকৃষ্ণসুখই গোপী-গণের একমাত্র লক্ষ্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই তাঁহাদের জীবনের মূল মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলেই তাঁহারা সুখী হন। শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত তাঁহারা অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেও প্রস্তুত। গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গাদি করেন কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য, তাঁহারা চাহেন শুধু শ্রীকৃষ্ণসুখ, তাঁহারা জানেন শুধু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা। শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য তাঁহারা বেদধর্ম, লোকধর্ম, সংসার-ধর্ম সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ রূপ, যৌবন, মন, প্রাণ

সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্যই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই তাঁহাদের দেহপ্রীতি। দেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি যাহা কিছু তাঁহারা করেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আপনার বলিতে তাঁহাদের আর কিছুই নাই। তাঁহাদের সুখ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। গোপীপ্রেমামৃত হইতে জানা যায় যে প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে পার্থ! গোপীগণ আমার সর্ব্বস্ব, তাহারা আমার সকল কার্য্যের সহায়। একাধারে তাহারা আমার গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী, প্রিয় শিষ্যা, সখী ও দাসী। একমাত্র তাহারাই আমার মনোগতভাব অবগত আছেন।" ব্রজগোপীগণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই।

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াই সুখী হন। তাঁহাদের মনে নিজ সুখবাঞ্ছা বা প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। স্বসুখবাসনা-বিহীন গোপী-প্রেমের মর্ম্ম জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। এই গোপীপ্রেমের এমনই অদ্ভুত স্বভাব যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাঁহাদের সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও কাম-দোষবিহীন প্রেমের স্বভাববশতঃ তাঁহাদের সুখ নিরন্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন, তখন তাঁহাদের সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও কোটিগুণ সুখ হইয়া থাকে। "গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥ গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।১৫৭-৮)॥ গোপী অনুরাগ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয়, তাহা দেখিয়া গোপীগণেরও সুখ হয়। গোপিকাগণের এই যে সুখ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের প্রভাবে স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ সুখ। গোপিকা-সুখে আবার শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধি। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সুখ ও গোপিকাগণের সুখ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। গোপ-

সুন্দরীগণের প্রেমপিপাসা কখনও মিটে না—তাঁহাদের প্রেম নিত্য নব-নবায়মান হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই বাড়িতে থাকে। তাঁহাদের প্রেমের এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে তাঁহারা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ও তিরস্কার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের তিরস্কারও রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির কারণ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।২৩)। ঐশ্বর্য্যগন্ধ-বিহীন বিশুদ্ধ-মাধুর্য্যময় এই গোপী প্রেম প্রাকৃত জীবে সম্ভবে না, সাধনাদ্বারা তাদৃশ কামগন্ধহীন সুনির্ম্মল প্রেমলাভ করা যায় না।

ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ—"গোপবেশ-বেণুকর-নবকিশোর-নটবর।" ত্রিভঙ্গিম শ্যাম নটবরের মনোহর গোপবেশ, পরিধানে পীতবসন, অধরে মোহন বেণু, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, গলদেশে গুঞ্জাবিভূষণ—এই প্রকার রূপই ব্রজরামাগণের একমাত্র প্রিয় বস্তু। গোপেন্দ্রনন্দন অন্য কোনও প্রকার রূপ ধারণ করিলে ব্রজসুন্দরীগণের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কথিত আছে—একদা বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরির উপত্যকায় শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ একাকিনী শ্রীরাধিকার সহিত নিভৃত বিহারের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাকে ইঙ্গিত করিয়া রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীরাধার আগমন-পথ চাহিয়া তিনি নিভৃত নিকুঞ্জমধ্যে লুকাইয়া আছেন, আর ব্রজসুন্দরী-গণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রজাঙ্গনাগণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধরা পড়িবার ভয়ে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছা হওয়ামাত্র তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাকে চতুর্ভুজ করিয়া দিলেন। ব্রজগোপীগণ নিকটে আসিয়া চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে গোপীগণের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইল।

তাঁহারা নারায়ণজ্ঞানে চতুর্ভুজ-মূর্তিকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণে চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে গোপীগণশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা সেখানে আসিয়া পড়িলেন। শ্রীরাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিবার নিমিত্ত চতুর্ভুজমূর্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, মাদনাখ্যমহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় প্রেমের অপ্রতিহত প্রভাবে প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি কিছুতেই চতুর্ভুজ-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। "রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব। যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব॥" (চৈঃ চঃ ১।১৭।২৮৪)। বলবতী ইচ্ছা ও প্রবল প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চতুর্ভুজ-মূর্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। শ্রীরাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাবে তাঁহার অতিরিক্ত দুই হস্ত অন্তর্হিত হইল। তিনি আবার দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দররূপে প্রকাশ পাইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে তদ্গতপ্রাণা ব্রজরামাগণ অনঙ্গশরাঘাতে খিন্নমনা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিরহকাতরা ব্রজদেবীগণ ভাবিতেছেন—"হায় হায় প্রাণবল্লভ! ব্যথা লাগিবার ভয়ে আমরা যে তোমার কুসুম-কোমল চরণ দুখানি অতি সন্তর্পণে আমাদের কঠিন স্তনযুগলের উপর ধারণ করিতাম, এক্ষণে তুমি সেই চরণে বনভ্রমণ করিতেছ। না জানি, কঙ্কর-কণ্টকাদি-দ্বারা সেই চরণে কত ব্যথা লাগিতেছে।" (ভাঃ ১০।৩১।১৯)। অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণপরিচিন্তনের ফলে তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণলীলার স্ফুরণ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়া ও তদাত্মিকা হইয়া এবং বিরহ-বৈবশ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাভাবের অচিন্তনীয়

শক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-স্বভাবের সহিত তাঁহাদের স্বভাবের ঐক্য হইয়া গিয়াছিল।

“স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে কৃষ্ণকান্তাগণ দ্বিবিধ। যাঁহারা শাস্ত্রবিধি-অনুসারে বিবাহিতা এবং পাতিব্রত্য হইতে অবিচলিতা, তাঁহারা **স্বকীয়া**।” আর যাঁহারা ইহপরকালের চিন্তা ত্যাগ করিয়া প্রবল অনুরাগবশতঃ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা বিবাহবিধি-অনুসারে গৃহীতা নহেন, তাঁহারাই **পরকীয়া**।” স্বকীয়া-ভাবই মূল কান্তাভাব, রসপোষক পরকীয়া-ভাব কান্তাভাবের একটা বৈচিত্রীমাত্র। দ্বারকাদি ধামে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি বিবাহিতা মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া এবং ব্রজধামে পরোঢ়া শ্রীরাধিকাদি ব্রজরামাগণ তাঁহার পরকীয়া।

পরকীয় নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ-নিবন্ধন কুলধর্ম্মাদি বিসর্জন দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েন। পরকীয়াভাবের মিলনে বহু বাধাবিঘ্ন থাকায় উৎকণ্ঠাতিশয্যের ও প্রেমরস-উদ্দীপনের যথেষ্ট অবকাশ ঘটে। তদবস্থায় শৃঙ্গাররসের পরমোৎকর্ষ সাধিত হয় এবং মিলনানন্দের চমৎকারিতাও বাড়িয়া যায়। পরকীয়া-ভাবই মধুরভাবের পরম উৎকর্ষাবস্থা। স্বকীয়াতে মিলনানন্দ আছে বটে, কিন্তু পরকীয়ার ন্যায় তাহাতে বিচিত্র লীলারস-আস্বাদনের আনন্দ-চমৎকারিতা নাই। কান্তাভাব বলিতে প্রকৃতপক্ষে স্বকীয়া-ভাবই বুঝায়, কিন্তু পরকীয়া-ভাবে কান্তারসের উল্লাস ও প্রেমের উচ্ছ্বাস অত্যধিক হয় বলিয়া অপূর্ব্বরসবৈচিত্রী-আস্বাদনের নিমিত্ত স্বকীয়া কান্তায় পরকীয়া-ভাবের আচ্ছাদন দেওয়া হয় মাত্র। {“পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥” }(চৈঃ চঃ ১।৪।৪২)। ব্রজধাম ব্যতীত অন্য কোনও ধামে পরকীয়া-লীলার অস্তিত্ব নাই। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন—পরস্ত্রীতে রস হয় না। ব্রজরামাগণ প্রকৃতপক্ষে পরস্ত্রী

নহেন, তাঁহারা স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তা। শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় তাঁহারই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষরূপ যোগমায়া অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহাদের পতি-পত্নীভাব আচ্ছাদিত হইয়াছে এবং স্বকীয়া কান্তায় পরকীয়া-ভাব পোষণ করা হইয়াছে। স্বকীয়ার ন্যায় এই পরকীয়া-লীলাও নিত্য।

প্রেমিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করাই পরকীয়া গোপীগণের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহাদের নিজ নিজ সুখে অনুরাগ বা দুঃখে বিরাগ নাই। শ্রীরাধার সহিত মিলনে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধিক প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। সে-কারণে ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা চাহেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধাকে লইয়া নিরন্তর বিহার করেন। শ্রীকৃষ্ণসুখ-সম্পাদনই তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। স্বসুখবাসনা না থাকায় তাঁহারা শ্রীরাধার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না। "সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥ কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।১৬৭-৮)। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বয়ং কেলি করিয়া এবং সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখ সম্পাদন করিয়া যে আনন্দলাভ করেন, শ্রীরাধা-দ্বারা কৃষ্ণ-সুখ-সম্পাদন করাইয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আনন্দ উপভোগ করেন। শ্রীরাধাও আবার নানাছলে শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইয়া এবং সখীগণের সহিত সঙ্গম করাইয়া নিজ কেলি হইতে কোটিগুণ অধিক সুখ অনুভব করেন। (চৈঃ চঃ ২।৮।১৭১-২ দেখ)। সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমে শ্রীরাধার আনন্দ, আবার শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমে সখীগণের আনন্দ—ইহাই স্বসুখবাসনাহীন বিশুদ্ধ **গোপীপ্রেম**। সুনির্ম্মল এই প্রেমরস-আস্বাদনের নিমিত্তই সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধরায় অবতরণ। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩৬) বলেন—জীবকল্যাণের

নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপীগণের সহিত বিবিধ রসলীলা করিলেন, যাহা শুনিয়া জীব তৎপর অর্থাৎ তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারিবে।

। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলাপুরুষোত্তম শ্যামসুন্দরের শৃঙ্গার-রসাত্মক সুমধুর লীলা দ্বিবিধ। প্রপঞ্চের গোচরীভূত লীলার নাম **প্রকটলীলা**। **অপ্রকটলীলা** প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয় না। ।প্রকট-লীলায় ব্রজদেবীগণ প্রকৃতপক্ষে স্বকীয়া হইলেও তাঁহারা ব্রজধামে পরকীয়া-রূপে প্রতীয়মানা। অপ্রকটলীলায় শ্রীজীবগোস্বামী স্বকীয়াত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং স্বকীয়াভাবাত্মক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া স্বকীয়া-ভাবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রসলীলার পুষ্টি দেখাইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর এই সিদ্ধান্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন—এই স্বকীয়াভাব গোস্বামীপাদের হার্দ্দ নহে। উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।" তাই তাঁহারা অনুমান করেন যে তৎকালীন দেশের ও সমাজের অবস্থা বুঝিয়া পরেচ্ছায় বা পরের অনুরোধেই তিনি স্বকীয়া ভাবাত্মক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই পরকীয়া ভাব অন্যের পক্ষে দূষণীয় হইলেও—যিনি স্বয়ং ভগবান, অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে যিনি সকলের আত্মাতেই রমণ করিতেছেন,—তাঁহার পক্ষে ইহা দোষাবহ নহে। বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, ব্রজসুন্দরী-গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাও তদ্রূপ। যে শক্তিদ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহার নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনীশক্তিই মূর্ত্তিমতী শ্রীরাধিকা, অন্য ব্রজরামাগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ-স্বরূপা। সুতরাং শ্রীরাধা-প্রমুখ ব্রজবামাগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু পরকীয়া ভাবে তাঁহাদের

মিলন ব্যভিচারদুষ্ট হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—"তেজীয়সাং ন দোষায়।" অগ্নি যেমন সমস্তই ভোজন করিয়া থাকেন, তেমনি ঈশ্বরের ন্যায় তেজস্বীগণের কোনও বিষয়ে দোষ-স্পর্শ সম্ভবে না। মঙ্গলময় শিব সৃষ্টির মঙ্গলের নিমিত্ত সমুদ্রোত্থিত বিষ পান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ তাহা করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি মূঢ়তা বশতঃ অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরকীয়া-লীলার অনুকরণ করিলে ঘোর নরকগামী হইবে।

"পরব্যোমের উপরে **কৃষ্ণলোক** অবস্থিত। কৃষ্ণলোকের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের নাম **ব্রজ** এবং বহিঃপ্রকোষ্ঠের নাম **গোলক**।" প্রকট ব্রজের ন্যায় অপ্রকট ব্রজে নিত্য পরকীয়া-লীলার স্থিতি এবং অপ্রকট গোলোকে নিত্য স্বকীয়ালীলার স্থিতি। প্রকট ও অপ্রকট ব্রজে ব্রজসুন্দরীগণ নিত্য পরকীয়া-ভাবাপন্ন হইয়া আছেন। অপ্রকটলীলার কান্তাভাবের স্বরূপসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সম্ভবতঃ অপ্রকট গোলোকের স্বকীয়া লীলা অনুভব করিয়া অপ্রকটে স্বকীয়াত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ সম্ভবতঃ অপ্রকট ব্রজের পরকীয়াভাব অনুভব করিয়া অপ্রকটে পরকীয়া ভাবের সমর্থন করিয়াছেন। নিত্যকিশোর হইলেও প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়সের অনুরূপ লীলা করিয়া থাকেন। অপ্রকটে জন্মাদি-লীলার অবকাশ না থাকায় তিনি অনাদি কাল হইতে নিত্যকিশোর। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদি গমন আছে [illegible] তিনি কোথাও গমন করেন না। অপ্রকটে সমস্ত সম্বন্ধই অনাদি ও নিত্য এবং অনাদি-সিদ্ধান্ত অভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্রজধামে পরোঢ়া ব্রজসুন্দরীগণ পরকীয়া-ভাবে প্রতীয়মান হইলেও, তাঁহারা কামদুষ্টা কুলটা রমণীর ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-

সঙ্গ করিতেন না। অন্য কোনও পরপুরুষের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। স্বসুখ-বাসনার লেশমাত্রও তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিতেন—শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার প্রাণবল্লভ, আর তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যা দাসী মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই পরকীয়া-লীলা ব্যভিচারদুষ্ট হইলে, আজন্ম ব্রহ্মচারী পরমধার্ম্মিক শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইহার গুণকীর্ত্তন করিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৯) তিনি বলিয়াছেন—"ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে হৃদ্গত কামরোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ হয়।" ব্রজরামাগণ অপরের বিবাহিতা পত্নী বলিয়া সুবিখ্যাত হইলেও তাঁহারা সকলেই সতী-শিরোমণি। স্বয়ং অরুন্ধতী দেবীও তাঁহাদের পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহায়কারিণী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিচ্ছক্তিরূপিণী ভগবতী যোগমায়ার অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রজলীলা করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দময়ী এই লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের ভাব বা ইচ্ছা অনুসারে লীলারস-পোষক উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দেন। দেবী পৌর্ণমাসী এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভগবতী যোগমায়ারই লীলামূর্ত্তি। তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রজবাসিগণ সকলে যেন নিদ্রাভিভূত হইয়া গোপনারীগণের বিবাহ-সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখিলেন, আর সেই স্বপ্নকেই তাঁহারা বাস্তব বলিয়া মনে করিলেন। কাহারও মতে গোপীগণের ছায়ামূর্ত্তির সহিত গোপগণের বিবাহ হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার গোপগণকর্ত্তৃক গোপিকাগণের বিবাহ বাস্তবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যাহাই হউক, বিবাহান্তে গোপসুন্দরীগণ আপন আপন পতিগৃহে গমন করিলেন বটে, কিন্তু ভগবতী যোগমায়ার অপূর্ব্ব কৌশলে পতি-অভিমানী গোপগণ নিজ নিজ পত্নীর অঙ্গ স্পর্শও

করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রজবধূগণ যখন গৃহ হইতে বহির্গতা হইতেন, তখন যোগমায়া-কল্পিত ছায়ামূর্ত্তি সকল গৃহে থাকিত। যোগমায়ার প্রভাবে পতিম্মন্য গোপগণ নিজ নিজ পত্নীকে নিজেদের নিকটেই (অবশ্য শয্যায় নহে) অবস্থিত মনে করিতেন। সে কারণে তাঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন অসূয়াভাব প্রদর্শন করেন নাই। যোগমায়ার কৌশলে তাঁহারা যোগমায়া-কল্পিত মূর্ত্তিকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাত্মক লীলায় পতিভুক্তা গোপীগণের স্থান নাই।

শ্রীকৃষ্ণকে পরম মধুর পরকীয়-প্রেমরসসার আস্বাদন করাইবার জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা গোপীগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যে উপপতিভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা গোপীগণ জানিতেন না, প্রেমাধীনতায় স্বয়ংভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণও তাহা জানিতেন না। "মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে। আমিহ না জানি, না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপ-গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।২৬-৭)। বিচিত্র লীলা-রস-আস্বাদনে সুবিধার নিমিত্ত ভগবতী যোগমায়া তাঁহাদের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিতেন বলিয়া আরোপিত এই উপপতি-ভাবকে তাঁহারা সকলেই বাস্তব বলিয়া মনে করিতেন এবং সেইভাবে পরস্পর পরস্পরের অভিনব মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন। ইহাই রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্যাম-নাগরের স্বরূপানন্দ-বিলাস, রসাস্বাদন-পরিপাটী বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে উপপতি-ভাবটী বাস্তব নহে—ইহা কল্পিত বা ভ্রমমাত্র।

ব্রজগোপীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শ্রীরাধিকাই রূপে, গুণে, প্রেমে ও সৌভাগ্যে সর্ব্বাধিকা। প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধিকাতেই প্রেমের সর্ব্বাধিক অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিনোদন-ক্রীড়াদির উপকরণ

গণের লীলা-বিশেষই শৃঙ্গার রসের পরম উৎকর্ষ। এই শৃঙ্গার রসকে আদিরস বা উজ্জ্বল রসও বলা হয়। বিভাবাদি চারিভাবের সংযোগে পরিপুষ্ট হইয়া এবং আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করিয়া মধুরা রতিই শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। নিখিল নায়িকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত লীলাময়বিগ্রহ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিশেষই শৃঙ্গাররসের পরম উৎকর্ষ। প্রাকৃত কামগন্ধ-বিহীন এই শৃঙ্গাররসে নায়ক বলিতে সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথ-স্বরূপ আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায় এবং নায়িকা বলিতে স্বরূপ শক্তির সারভূতা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণকেই বুঝায়। সকলের চিত্ত আকর্ষণ করাই শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণকেও যিনি স্বীয় রূপগুণাদি দ্বারা মুগ্ধ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীকৃষ্ণ-মনোমোহিনী শ্রীমতী রাধারাণীই ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং নিখিল নায়িকাগণের শিরোরত্ন-স্বরূপা। শ্রীরাধিকাপ্রমুখ ব্রজসুন্দরীগণ উত্তম বসন-ভূষণ-অনুলেপন-মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিতা হইয়া রসিক নাগর শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিবার নিমিত্ত নিভৃত নিকুঞ্জে তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। নারীজন-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণও নয়নকটাক্ষ, ভ্রূনর্ত্তন, বাহু-প্রসারণ, ভুজাকর্ষণ, আলিঙ্গন, চুম্বন, নখাগ্রপাত, উরু-স্তন-নীবি-স্পর্শনাদি দ্বারা প্রেমাত্মক কামভাব উদ্দীপিত করিয়া প্রধানতঃ শ্রীরাধার সহিত বিচিত্র প্রেম ও রসলীলা করিয়া থাকেন। বিভাবাদি চারিভাব নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) বিভাব—

রতি-বিষয়ক আস্বাদনের কারণকে **বিভাব** বলা হয়। যাহাতে (যথা আলম্বন) এবং যাহার দ্বারা (যথা উদ্দীপন) রতি-আদি ভাব আস্বাদনের যোগ্য হয়, তাহার নাম বিভাব। এইরূপে **আলম্বন** ও **উদ্দীপন** ভেদে বিভাব দুইপ্রকার এবং **বিষয়** ও **আশ্রয়** ভেদে আলম্বন

দুই প্রকার। ভক্তগণের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে রতি উৎপন্ন হয়। সে কারণে রতির বিষয়রূপে রসরাজমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয় বা আধাররূপে ভক্তগণকে আশ্রয়ালম্বন বলা হয়। পরমানন্দ-ঘনমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববিধ রসের বিষয়ালম্বন। সে কারণে শ্রীকৃষ্ণকে **সর্ব্বরসময় মূর্ত্তি** বলা হয়। ভক্তের রুচি ও অধিকার ভেদে একই শ্রীকৃষ্ণ কোথাও প্রভু, কোথাও সখা, কোথাও পুত্র, কোথাও বা প্রাণবল্লভরূপে প্রতিভাত হয়েন। মধুর বা উজ্জ্বল রসে শ্রীকৃষ্ণই **বিষয়ালম্বন** এবং শ্রীরাধা-প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাবর্গ **আশ্রয়ালম্বন।**

যদ্দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম **উদ্দীপন বিভাব।** আলম্বন বিভাবের নাম, রূপ, গুণ, চেষ্টাদি রতি বা ভাবের উদ্দীপন করিয়া থাকে। কান্তাশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণী বলিতেছেন—"সখি! এক পুরুষের 'কৃষ্ণ',-এই নামের একাক্ষর মাত্র আমার শ্রবণ পথে প্রবেশ করিয়া আমার বুদ্ধিকে বিলোপ করিতেছে। আর এক পুরুষের সুমধুর বংশীধ্বনি আমাকে উন্মাদদশা প্রাপ্ত করাইতেছে। চিত্রপটে দৃষ্ট অপর এক মেঘ-শ্যামল পুরুষ আমার হৃদয়ে লগ্ন হইয়া আছেন। হায় হায়! একে ত' পরপুরুষ, তাতে আবার তিনজন পুরুষে আমার রতি জন্মিল। ধিক্ আমাকে, এখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ।" শৃঙ্গাররসময়মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর নাম, তাঁহার অপরূপ রূপ, অসাধারণ গুণ, রাসলীলাদি চেষ্টা, ত্রিভঙ্গ সুন্দর-দেহ, চঞ্চল চারু নয়ন, বসনভূষণাদি প্রসাধন, সপ্রেমদৃষ্টি, বঙ্কিম নয়ন-কটাক্ষ, ভুবনমোহন হাস্য, বিচিত্র চরণ-চিহ্ন, অপূর্ব্ব অঙ্গসৌরভ, মদনোদ্ভবকারী বেণু-গীত, মনোহর নূপুর-ধ্বনি—এই সকল উদ্দীপকরূপে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগাইয়া রতি-আদি ভাবকে প্রকট করে। সে কারণে ইহাদিগকে শৃঙ্গাররসের **উদ্দীপন বিভাব** বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সুধামধুর নাম-শ্রবণেই শ্রীরাধিকাদি গোপিকাগণের চিত্তবিকার

উপস্থিত হয়। পীতবসনপরিহিত, শিখিপুচ্ছাদিশোভিত, বেণুবাদনরত শ্যামসুন্দরের বদনকমলে মৃদুমধুর হাস্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের আর অন্য কোনও ভূষণের প্রয়োজন হয় না—তাঁহার শ্রীঅঙ্গই ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে স্থান পাইয়া ভূষণেরই শোভা বাড়ে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সমস্তই অলৌকিক। শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুধ্বনি শুনিয়া গোপরামাগণ আত্মহারা হইয়া যান। তখন তাঁহাদের কেশবন্ধন ও নীবি বা কটিবন্ধন শিথিল হইয়া যায় এবং বসনভূষণাদি স্খলিত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে ময়ূরগণ সানন্দে নৃত্য করে, যমুনায় উজান বহে, পর্ব্বতসমূহ স্বেদযুক্ত হয়, বৃক্ষ সকলেরও পুলকোদ্গম হয় এবং যাবতীয় স্থাবরজঙ্গমাদি স্তম্ভিত হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে অনুভব করিবার শক্তি একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণেই বর্ত্তমান। ব্রজরামাগণের শ্রীকৃষ্ণে যে রতি তাহা স্বভাবসিদ্ধা। কথিত আছে, দূরদেশ হইতে নবপরিণীতা বধূ ব্রজপুরে আনীতা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্রজভূমিস্পর্শমাত্র নববধূর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতির উদয় হইল। একদিন নান্দীমুখী শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বলিলেন—"সখি! তুমি ত জান, তোমার শ্যাম-নাগর বহুবল্লভ শঠ। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও গুণশালী পুরুষে রতি বিধান করা তোমার কর্ত্তব্য।" তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"সখি! যাহার মস্তকে শিখিপুচ্ছ, বদনে মুরলী এবং অঙ্গে গৈরিকাদির তিলক নাই, তাহাকে আমি তৃণতুল্যও জ্ঞান করি না। শ্যামসুন্দর আমার সুন্দর হউন বা অসুন্দর হউন, গুণী হউন বা গুণহীন হউন, তিনি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন বা দ্বেষভাব প্রকাশ করুন, সকল অবস্থাতে তিনিই আমার একমাত্র গতি।" ছদ্মবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্রই কুঙ্কুমচর্চ্চিতা শ্রীরাধার অন্তরাত্মা দ্রবীভূত হইয়া যায়, দূর

হইতে তাঁহার অপরূপ অঙ্গসৌরভ অনুভব করিয়া শ্রীরাধা মধুরভাবে আবিষ্ট হয়েন। কথিত আছে, অভিসারিকা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমাশায় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা সখী ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি! এই নিবিড় বনমধ্যে এ কাহার অঙ্গসৌরভ আসিয়া আমাকে বিচলিত করিতেছে?" ও দিকে শ্রীকৃষ্ণও সুবল সখাকে বলিলেন—"সখা! অকস্মাৎ নবসৌরভ কোথা হইতে আসিল? ইহাতে যে আমার হৃদয় অতিশয় বিমোহিত হইতেছে।" এইরূপে উভয়ে উভয়ের উপস্থিতি দূর হইতেই অবগত হইতেন।

(২) অনুভাব—

যাহারা চিত্তস্থ ভাবকে প্রকাশ করিয়া বাহ্যে বিকারের ন্যায় দেখায় তাহাদিগকে **অনুভাব** বলা হয়। উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিক ভেদে অনুভাব দ্বিবিধ। "অনুভাব—স্মিত-নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক—অনুভাবের ভিতর॥" (চৈঃ চঃ ২।২৩।৩২)। চিত্তে রতির আবির্ভাব হইলে নৃত্য, গীত, হাস্য, বিলুণ্ঠন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাই) অঙ্গমোটন (গা-মোড়া), দীর্ঘশ্বাস, লালাস্রাব প্রভৃতি বাহ্যিক বিকারগুলি চিত্তস্থ ভাবের পরিচয় দেয়। এই জাতীয় বিকারগুলিকে **উদ্ভাস্বর অনুভাব** বলা হয়। এই সকল চিহ্ন দ্বারা চিত্তে রতির আবির্ভাব জানা যায়। বুদ্ধিমূলক এই নৃত্য-গীতাদি বিকারগুলি চেষ্টাসাধ্য—ভক্ত ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারেন। আর অশ্রু-কম্প-স্তম্ভাদি যে বিকারগুলি স্বাভাবিক অর্থাৎ যেগুলি চেষ্টা ব্যতীত আপনা আপনিই প্রকাশ পায় এবং চেষ্টা করিয়াও গোপন করা যায় না, তাহাদিগকে **সাত্ত্বিকভাব** বলা হয়। এই সাত্ত্বিক ভাব অনুভাবেরই প্রকাশবিশেষ হইলেও, রসশাস্ত্রে অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবকে পৃথক্‌রূপে গণনা করা হইয়াছে। উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিক এই উভয়বিধ অনুভাবই সত্ত্ব

হইতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহারা কৃষ্ণ-রতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-আস্বাদনের চমৎকারিতা জন্মায়। নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর-অনুভাবগুলি সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইলেও সাত্ত্বিক ভাবের ন্যায় ইহাদের প্রকাশ স্বাভাবিক নহে, ভাবুক বা ভাবপ্রবণ জনের দেহে ইহারা অধিক প্রকাশ পায়।

মধুররসে অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক ভেদে অনুভাব তিন প্রকার। নীবি-উত্তরীয়-ধম্মিল্ল (খোঁপা)-স্রংশন, নয়নান্তে নিরীক্ষণ, গাত্র-মোটন, জৃম্ভা, হাস্য প্রভৃতি **উদ্ভাস্বরের** কার্য। কথিত আছে, ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গে এমন আকুল হইয়া পড়িলেন যে তাঁহাদের মালা অলঙ্কারাদি বিস্রস্ত হইল এবং কেশবস্ত্রাদি শ্লথ হইয়া গেল। তাহাদিগকে যথাস্থানে ধারণ করিতে তাঁহারা আর সক্ষম হইলেন না। বাচিক অনুভাব বলিতে আলাপ-বিলাপাদি বুঝায়। বিংশতিপ্রকার অনুভাবাখ্য অলঙ্কার পরে বর্ণিত হইল (পৃঃ ১৬৯ দেখ)।

(৩) সাত্ত্বিক ভাব—

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে **সত্ত্ব** বলে। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবসমূহের নাম সাত্ত্বিক ভাব। চিত্ত যখন সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া আপনাকে প্রাণবায়ুতে সমর্পণ করে এবং প্রাণও যখন বিকারাপন্ন হইয়া অতিশয়রূপে দেহের ক্ষোভ উৎপাদন করে, তখনই ভক্তদেহে সাত্ত্বিক ভাবসকল উদিত হইয়া থাকে। **সাত্ত্বিকভাব** বলিতে অশ্রু (নাসিকা-স্রাব ইহার অন্তর্বিশেষ), কম্প (গাত্র-চাঞ্চল্য), পুলক (রোমাঞ্চ) স্বেদ (ঘর্মোদ্গম), বৈবর্ণ, (ভয়াদিহেতু বর্ণবিকার), স্বরভেদ (গদ্গদ বাক্য), স্তম্ভ (পুত্তলিকাপ্রায় জড়তা) ও প্রলয় (মরণবৎ নিশ্চেষ্টতা বা মূর্চ্ছা)—এই আটপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার বুঝায়।

প্রলয়ে বহিশ্চেষ্টা লোপ পায় বটে, কিন্তু মনোবৃত্তি তখন বিলুপ্ত হয় না। তখনও অন্তরে ভগবৎ-স্ফূর্তি বিদ্যমান থাকে। এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব অনুভাবেরই প্রকাশবিশেষ হইলেও চেষ্টা ব্যতীত স্বয়ংই উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের যে ভাব স্বয়ং বা দ্বিতীয় ভাবের সহিত মিলিত হইয়া ঈষৎ প্রকাশ পায় এবং যাহা গোপন করিতে পারা যায়, তাহার নাম **ধূমায়িত**। সাধারণী রতিতে এই ধূমায়িত ভাব প্রকাশ পায়। আর দুই বা তিন সাত্ত্বিক ভাব যদি এক সময়ে উদিত হয় এবং যদি তাহা কষ্টে গোপন করিতে পারা যায়, তাহাকে **জ্বলিত** বলা হয়। সমঞ্জসা রতিতে জ্বলিত ভাব প্রকাশ পায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন, চারি বা পাঁচ সাত্ত্বিক ভাব যদি এক সময়ে উদিত হয় এবং যদি তাহা দমন করা না যায়, তবে তাহাকে **দীপ্ত** বলে। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ—এই সকলে উত্তরোত্তর দীপ্ত ভাবের বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। আর যদি পাঁচ, ছয় বা সমস্ত ভাবগুলি এক কালে উদিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে, তবে তাহাকে **উদ্দীপ্ত** বলা হয়। রূঢ়ভাবরূপ মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবই অধিরূঢ়ভাবরূপ মহাভাবে পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া **সূদ্দীপ্ত** হইয়া থাকে।

শ্রীহরিনামগ্রহণের ফলে চিত্তে প্রেমোদয় হইলে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া থাকে। তখন অশ্রু-কম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ পায়। সাত্ত্বিক ভাব বা চিত্তের দ্রবতাই প্রেমোদয়ের মুখ্য লক্ষণ বটে, কিন্তু স্বভাব বা অভ্যাসবশতঃও অশ্রু-কম্পাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখন কখন দেখা যায় যে, স্বাভাবিক গম্ভীর হৃদয়ে প্রেমোদয় হইলেও এবং সে কারণে চিত্ত দ্রবীভূত হইলেও অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলি প্রকাশ পায় না। আবার, প্রকৃত

সাত্ত্বিক ভাব ব্যতিরেকেও ভাবপ্রবণ শিথিল বা পিচ্ছিল হৃদয়ে অথবা দীর্ঘ অভ্যাসবশতঃ অশ্রু-কম্পাদি বহির্বিকারগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং অশ্রু-কম্পাদি বহির্বিকার গুলি সকল সময়ে সাত্ত্বিক ভাবের বা চিত্তদ্রবতার লক্ষণ নহে। চিত্তের দ্রবতাই প্রেমের লক্ষণ, কেবল অশ্রু-কম্পাদি নহে।

(৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব—

বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ ও সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয় এবং যাহারা স্থায়িভাবের অভিমুখে বিশেষভাবে বিচরণ করে, তাহারাই **ব্যভিচারী**। তরঙ্গসদৃশ ব্যভিচারী ভাব রসোন্মুখ স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত বা চালিত করিয়া **সহকারী কারণ** রূপে পরিগণিত হয়। প্রেমময়ী শ্রীরাধা যখন না। মদনমদে অন্ধ হইয়া কখন ভ্রূযুগল কুটিল, কখন ভ্রমণ, কখন বদন-আচ্ছাদন, কখন রোদন-হাস্য বা প্রলাপ, কখন বা মুহুর্মুহুঃ সখীগণকে বন্দনা করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহাতে মদনাত্মক ব্যভিচারী ভাব প্রকাশিত হইল। ব্যভিচারী ভাবসকল সাগরস্বরূপ স্থায়িভাবের অভিমুখে বিশেষভাবে সঞ্চরণ করিয়া ও তাহার সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় তাহাকে বর্দ্ধিত করে এবং বিচিত্রতা প্রাপ্ত করাইয়া তাহার আনন্দ-চমৎকারিতা বিধান করে। ইহারা আবার স্থায়িভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে **সঞ্চারিভাবও** বলা হয়। এই ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাব নির্ব্বেদাদি ভেদে **ত্রয়স্ত্রিংশটী**—যথা (১) **নির্ব্বেদ** অর্থাৎ প্রণয়ভঙ্গে বা অন্য কোনও কারণে অনিষ্ট চিন্তা করিয়া আত্মনিন্দার ও স্বীয় অবমাননা জ্ঞান, (২) **বিষাদ** অর্থাৎ ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিতে বা অপরাধাদিহেতু অনুতাপ বা পশ্চাত্তাপ, (৩) **দৈন্য** অর্থাৎ অপরাধাদিবশতঃ নিজেকে হীন জ্ঞান করা, (৪) **গ্লানি** অর্থাৎ দেহের ক্ষয় জনিত দুর্ব্বলতা, (৫) **শ্রম** অর্থাৎ

নৃত্য-রমণাদি জনিত খেদ, (৬) **মদ** অর্থাৎ মধুপানাদিজনিত জ্ঞান-নাশক আহ্লাদ. (৭) **গর্ব্ব** অর্থাৎ ইষ্টবস্তুলাভে অন্যের অবজ্ঞা, (৮) **শঙ্কা** অর্থাৎ নিজের অনিষ্টচিন্তা বা দর্শন, (৯) **ত্রাস** অর্থাৎ ভয়প্রদ কারণবশতঃ চিত্তের ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য, (১০) **আবেগ** অর্থাৎ ভয়াদি-জনিত চিত্তের সম্ভ্রম বা ব্যস্ততাহেতু ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা, (১১) **উন্মাদ** বা চিত্তের বিভ্রম, (১২) **অপস্মার** অর্থাৎ দুঃখনিমিত্ত চিত্ত-বিপ্লব বা মনোলয়, (১৩) **ব্যাধি** অর্থাৎ সন্তাপজ্বরজনিত গাত্রোষ্ণতা, (১৪) **মোহ** অর্থাৎ হর্ষবিষাদাদিজনিত বোধশূন্যতা, (১৫) **মৃতি** বা মরণবৎ অবস্থা, (১৬) **আলস্য** অর্থাৎ সামর্থ্যসত্ত্বেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা (বিলাসে এই আলস্য কৃত্রিম), (১৭) **জাড্য** বা জড়নিস্পন্দাঙ্গতা, (১৮) **ব্রীড়া** বা লজ্জা, (১৯ **অবহিত্থা** অর্থাৎ হৃদয়ে অভিলাষের ও ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির সঙ্গোপন, (২০) **স্মৃতি** বা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্ফূর্ত্তি, (২১) **বিতর্ক** অর্থাৎ সংশয়াদিহেতু তর্ক বা বিচার, (২২) **চিন্তা** অর্থাৎ ভূমি-লিখন ও বিলাপাদি দ্বারা অধোমুখে, অভীষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের প্রাপ্তি-জনিত, ভাবনা, (২৩) **মতি** অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক ভ্রমের অপনয়ন ও অর্থ-নির্দ্ধারণ, (২৪) **ধৃতি** বা চিত্তের পূর্ণতা ও চাঞ্চল্যের অভাব, (২৫) **হর্ষ** বা চিত্তের প্রসন্নতা, (২৬) **ঔৎসুক্য** অর্থাৎ উৎকণ্ঠাজনিত কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা, (২৭) **ঔগ্র্য** বা হিংসাকর ক্রোধ. (২৮) **অমর্ষ** বা অপমানাদিজনিত অসহিষ্ণুতা. (২৯) **অসূয়া** বা পরসৌভাগ্যে বিদ্বেষ বা পরগুণে দোষারোপণ (৩০) **চাপল্য** অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিজনিত গাম্ভীর্য্যহীনতা, বা চিত্তের লঘুতা (৩১) **নিদ্রা** অর্থাৎ চিত্তের নিমীলন ও বাহ্যচেষ্টার অভাব, (৩২) **সুপ্তি** বা ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, (৩৩) **বোধ** অর্থাৎ নিদ্রাদির নিবৃত্তি ও জ্ঞানের আবির্ভাব। উল্লিখিত তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে ঔগ্র্য ও আলস্যের স্থান উজ্জ্বল রসে নাই।

অনুভাবাখ্য অলঙ্কার—

কান্তের প্রতি প্রগাঢ় অভিনিবেশবশতঃ তদ্ভাবাক্রান্ত চিত্ত হইতে সময়ে সময়ে **বিংশতি** প্রকার অলঙ্কার উদিত হইয়া থাকে। তাহারা প্রাকৃত অলঙ্কারের ন্যায় নায়িকার অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে। তদ্দর্শনে রসিকশেখর শ্যামসুন্দর আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন। বিংশতি প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে হাব, ভাব ও হেলা এই তিনটি **অঙ্গজ** এবং শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাতটি **অযত্নজ** অর্থাৎ শোভাবর্দ্ধনকারী বেশাদি যত্নের অভাবেও ইহারা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া দেহের শোভা বৃদ্ধি করে। অবশিষ্ট দশটি **স্বভাবজাত**, স্বভাবতঃই ইহারা ঘটিয়া থাকে।

(১) **ভাব**—শৃঙ্গাররসে নির্ব্বিকার চিত্তে রতি নামক স্থায়িভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে, লজ্জাদিবশতঃ প্রথমেই যে বিকার জন্মে, তাহার নাম ভাব—যেমন বীজের আদি বিকার অঙ্কুর, তদ্রূপ। যথা—"রতির প্রসঙ্গে অতি লজ্জাশীলমতি। নিকটে নায়িক যায়, সভয় প্রকৃতি॥ অঙ্গে হস্ত দিতে অঙ্গ-বসন কাঁপয়। সখীর অঞ্চল ধরে, ছাড়িয়া না দেয়॥" (ভক্তমাল)।

(২) **হাব**—গ্রীবা বাঁকাইয়া ও ভ্রূনেত্র ঘুরাইয়া শৃঙ্গাররসপ্রকটনের নাম হাব। "ভাব হৈতে হাব কিছু অধিক প্রকাশ। গ্রীবা বক্রে থাকে, কিন্তু নয়ন বিকাশ॥" (ভক্তমাল)

(৩) **হেলা**—হাব যখন স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তখন তাহার নাম হেলা। যথা—শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার কুচ-যুগল কম্পিত হইতে লাগিল, তির্য্যকনেত্রে ও পুলকিত গণ্ডে তাঁহার বদন শোভমান হইল এবং কটিদেশে নীবি শ্লথিত হইলেও, স্বেদজলে তাঁহার বসন আর্দ্র হইয়া অঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিল। এইরূপ সুস্পষ্ট সম্ভোগাভিলাসের নাম হেলা।

(৪) **শোভা**—রূপ ও ভোগাদির দ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ বা চারুতা, তাহার নাম শোভা। যথা—"সুবল-সখাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"সখে! অদ্য প্রাতে, রাত্রিজাগরণহেতু ঘূর্ণিতনয়না বিশাখাকে নীপশাখাগন্ধে লতামণ্ডপ হইতে নির্গতা হইতে দেখিলাম। তখন তাঁহার অর্দ্ধমুক্তা বেণী স্কন্ধদেশে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। তদবধি বিশাখা আমার হৃদয়ে লগ্না হইয়া আছেন।"

(৫) **কান্তি**—মদন-প্রভাবে শোভা উজ্জ্বলা হইলে তাহাকে কান্তি বলে। যথা—সুবলকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"সখে! প্রেমময়ী শ্রীরাধা স্বভাবতঃই মধুর মূর্ত্তি। তাহাতে আবার ইনি আলিঙ্গিতাঙ্গী হইয়া মদনবিহারে উদারা হইয়াছেন। ইনি আমার হৃদয় অবরোধ করিয়া রাখিলেন।"

(৬) **দীপ্তি**—বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা যে কান্তি উজ্জ্বল হইয়া অঙ্গে সমধিক বিস্তার লাভ করে, সেই বিস্তৃতি প্রাপ্ত কান্তিকে দীপ্তি বলে। যথা—গত নিশায় রাত্রি জাগরণ হেতু শ্রীরাধার নয়নযুগল নিমীলিত হইতেছে, স্খলিত অমল হারে তাঁহার কুচযুগল উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত কুঞ্জগৃহে তিনি স্বীয় অলসাঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া আছেন। এইভাবে কিশোরী শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে কন্দর্পকেই বিস্তার করিতেছেন।

(৭) **মাধুর্য্য**—সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা সকলের যে মাধুর্য্য বা মনোহারিত্ব, তাহাকে মাধুর্য্য বলে। যথা—"নানা রঙ্গভঙ্গি ধরে প্রিয় সনে করে। অঙ্গে হেলাহেলি করি কৌতুকে বিহরে॥ পরম মাধুর্য্য সেই সর্ব্বরস-সীমা। ভাব-অলঙ্কার মধ্যে পরম গরিমা॥" (ভক্তমাল)।

(৮) **প্রগল্‌ভতা**—সম্ভোগ বিষয়ে যে সঙ্কোচশূন্য ভাব, তাহার নাম প্রগল্‌ভতা। যথা—বদন চুম্বনকালে শ্রীরাধা রদারদি

ও হাতাহাতি করিয়া কৃষ্ণাঙ্গে দংশন ও নখাঘাত দ্বারা যে প্রতিকূল ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি অতুল আনন্দ উপভোগ করিলেন।

(৯) **ঔদার্য্য**—সর্ব্বাবস্থায় যে বিনয়-প্রদর্শন তাহার নাম ঔদার্য্য। যথা—প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি! শ্যামসুন্দর বিবেচক, দয়ালু ও বিনয়ী হইয়াও যে আমাদিগকে স্মরণ করিতেছেন না, ইহা আমারই পাপের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

(১০) **ধৈর্য্য**—চিত্ত-স্থিরতার অর্থাৎ সুখে দুঃখে সমান থাকার নাম ধৈর্য্য। যথা—"প্রিয়ের বিচ্ছেদে যদ্যপি হয় বহু দুখ। তথাপিহ প্রিয়সুখে মানে নিজ সুখ।" (ভক্তমাল)।

(১১) **লীলা**—রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ব্যক্তির যে অনুকরণ, তাহার নাম লীলা। যথা—ভাবাবেশে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণতুল্য বেশ-ভূষণ ধারণ করিয়া এবং মৃগমদে নিজ গৌর-অঙ্গ শ্যামবর্ণ করিয়া কৃষ্ণ-লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

(১২) **বিলাস**—প্রিয়দর্শনে প্রিয় সঙ্গহেতু নায়িকার গমনাদি ও মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গীতে যে বৈশিষ্ট্য জন্মে, তাহার নাম বিলাস। অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলে, লজ্জা-হর্ষ-অভিলাষ-সম্ভ্রম-বাম্য ও ভয়—এই সমুদয় ভাবের উদয়ে শ্রীরাধা এত চঞ্চল হইয়া পড়েন যে তখন তাঁহার গমন-মুখ-নেত্রাদি এক অপরূপ ভঙ্গী ধারণ করে। কথিত আছে, শ্রীরাধাকে অভিসার করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আনয়ন করা হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হরিণনয়না শ্রীরাধার গতি স্থগিত এবং স্থিতি কুটিল হইল। তখন তিনি গ্রীবা বক্র করিয়া নীলবসনে বদন আবৃত করিলেন এবং আঘূর্ণিত ও ঈষৎ বক্র নেত্রে কটাক্ষপাত করিতে করিতে বিলাস নামক ভাবভূষণে ভূষিত হইয়া কান্তকে একান্ত পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

(১৩) **বিচ্ছিত্তি**—যে বেশ রচনা অল্প পরিমিত হইলেও দেহ-কান্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে—যথা, লতা পল্লবাদি নির্মিত বিচিত্র অঙ্গ ভূষণ, তিলকাদি রচনা প্রভৃতি।

(১৪) **বিভ্রম**—মদনাবেগ-বশতঃ প্রবল মিলনাকাঙ্ক্ষায় হার-মাল্যাদির যে অযথাস্থানে ধৃতি বা ধারণ তাহার নাম বিভ্রম। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২৯।৭) হইতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণু-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রিয় সঙ্গম আশে ব্যস্ততা প্রযুক্ত বিরহসন্তপ্তা ব্রজসুন্দরীগণ কেশ-পাশে বক্ষের ভূষণ, চরণে করের ভূষণ, নেত্রে কস্তুরিকা-ধারণ, অঙ্গে অঞ্জনের চর্চ্চা—এইরূপে এক অঙ্গের ভূষণাদি অন্য অঙ্গে ধারণ করিয়া, মদনাবেশে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন।

(১৫) **কিলকিঞ্চিত**—"গর্ব্ব অভিলাষ ভয় ঈষত রোদন। কিঞ্চিত হাস্যের সহ অসূয়া কোপন॥ একত্র উদয় হয় হর্ষের সহিত। তবে সেই হয় কিলকিঞ্চিতের রীত॥" (উজ্জ্বল)। হর্ষ নামক সঞ্চারী-ভাব কিলকিঞ্চিতের মূল কারণ। হর্ষ ব্যতিরেকে ইহার উদয় হয় না। গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, ঈষৎ রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া (ঈর্ষা) ও ক্রোধ—এই সাতটী ভাব হর্ষের সহিত সহজে মিলিত হয় এবং এই অষ্টভাবের সম্মিলনে কিলকিঞ্চিত বা মহাভাবের উদয় হইয়া থাকে। কিলকিঞ্চিত-ভাবালঙ্কৃতা শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি সঙ্গম অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

কথিত আছে, রসিকশেখর একদিন সখীগণের সমক্ষে চাঁদবদনী রাধারাণীর মুখচুম্বন করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার কুচযুগোপরি হস্তার্পণ করিলেন। শ্রীমতী তখন সপুলকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া এবং তির্য্যক্‌ভাবে স্তব্ধ ও ঈষৎ পরাবৃত্ত (প্রত্যাবৃত্ত) হইয়া মৃদুমধুর হাস্যের সহিত রোদন করিতে

লাগিলেন। সেই সময়ে রসরঙ্গিণীর বদন-কমলের সাতিশয় শোভা হইয়াছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে, পুলক দ্বারা অভিলাষ, ভ্রূভঙ্গী দ্বারা অসূয়া ও ক্রোধ, তির্য্যক্‌ভাবে স্তব্ধ হওয়াতে গর্ব, ঈষৎ পরাবৃত্ত প্রযুক্ত ভয় এবং হাস্য ও রোদন—হর্ষ হেতু এই সাতটী ভাব এককালে প্রকটিত হওয়ায় কিলকিঞ্চিত অলঙ্কারের উদ্ভব হইল। এইরূপে বিনোদবদনী প্রাণকান্তের অতুল আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন।

শুধু যে অঙ্গস্পর্শাদিতে কিলকিঞ্চিত অলঙ্কারের উদয় হয়, এমন নহে। গমনে বা পুষ্পচয়নাদিতে বাধা দিলেও কিলকিঞ্চিত-ভাবের উদ্গম হইয়া থাকে। নয়নই মনের দর্পণ-স্বরূপ, নয়নেই এই ভাব অধিক প্রকাশ পায়। **দানলীলা** প্রসঙ্গে কথিত আছে—একদিন পদ্মলোচনা শ্রীরাধা যজ্ঞের ঘৃত লইয়া সখীগণের সহিত চলিয়াছেন, এমন সময়ে নারীলম্পট শ্যামসুন্দর দানী সাজিয়া কামকটাক্ষাদিদ্বারা ভাবময়ী শ্রীমতীকে মোহিত করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া শুল্কগ্রহণচ্ছলে তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হর্ষজনিত গূঢ় (অন্তর্গত) হাস্যে শ্রীরাধার নয়ন যুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শুষ্ক রোদনহেতু নেত্র-রোম অশ্রুকণায় ঈষৎ সিক্ত হইল, ক্রোধহেতু নয়নের প্রান্তভাগ ঈষৎ পাটল বা রক্তবর্ণ হইল, রসাস্বাদ অভিলাষ হেতু পুলকিত নয়নদ্বয় রসিকতায় উৎসিক্ত হইল, ভয়হেতু নয়নদ্বয় কুঞ্চিত ও চঞ্চল হইল, অসূয়া ও গর্ব্ব হেতু দুই নয়ন কুটিল ও রসোল্লাসময় হইল এবং নয়নের তারা ঊর্দ্ধদিকে উঠিল। এইরূপে কিলকিঞ্চিতভাবভূষণে বিভূষিত বদনকমল অবলোকন করিয়া রসিকশেখর অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিলেন।

(১৬) **মোট্টায়িত**—কান্তের স্মরণ বা তদীয় বার্ত্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়কভাবে বিভাবিত হইলে, হৃদয়মধ্যে যে মিলনাভিলাষ জন্মায় তাহাকে মোট্টায়িত বলে। কথিত আছে, সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা শ্রবণ

করিয়া পালী স্বীয় বদনে এরূপ পুলক বিস্তার করিলেন যে তদ্দ্বারা ফুল্লকদম্বও বিড়ম্বিত হইয়াছিল।

(১৭) **কুট্টমিত**—কান্ত-কর্ত্তৃক স্তন-অধরাদি স্পর্শনে হৃদয়ে আনন্দানুভব হইলেও, সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় বাহ্যে যে ক্রোধপ্রকাশ করা হয়, তাহার নাম কুট্টমিত। তদবস্থায় নায়িকা কান্তের কার্য্যে বাধা-প্রদান করিয়া বাহিরে বাম্যভাব প্রকাশ করিলেও অন্তরে আনন্দ অনুভব করেন এবং অন্তরের আনন্দ গোপন করিয়া মধুর হাস্যগর্ভ শুষ্ক রোদন করিতে করিতে কান্তকে তিরস্কারও করেন। শ্রীরাধার কুচযুগলে শ্রীকৃষ্ণ করার্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিজাঙ্গস্পর্শে বাঞ্ছা থাকিলেও রসরঙ্গিণী স্বীয় অন্তরের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে—"যাও যাও বলি, করে কর ঠেলি"—শ্রীকৃষ্ণের পাণিরোধ পূর্ব্বক মধুর হাস্যগর্ভ ভৎর্সন ও সুখসত্ত্বেও শুষ্ক রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রসিকশেখর আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

(১৮) **বিব্বোক**—মান ও গর্ব্ব হেতু কান্তের প্রতি বা কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর-প্রদর্শন, তাহার নাম বিব্বোক। মানময়ী শ্রীরাধার অবসর প্রতীক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বদনকমলে নয়ননিক্ষেপ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, আর শ্রীরাধা দুর্গমনেত্র দ্বারা হাস্য করিতে করিতে যেন নিবিষ্ট মনে বনফুলের মালা গ্রন্থন করিতেছেন। এইরূপে বিব্বোক অলঙ্কারের উদ্ভব হইলে, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি তদ্দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলেন।

(১৯) **ললিত**—যাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসভঙ্গী সুকুমার হয় এবং ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহার নাম ললিত। প্রেমোল্লসিত শ্রীরাধা যখন আড়ঘোমটা টানিয়া এবং ত্রিভঙ্গ (গ্রীবা, কটি ও জানু এই তিন অঙ্গ বক্র) ভঙ্গিম ঠামে ঈষৎ হাস্যের সহিত আড়নয়নে

প্রিয়মুখপানে তাকাইয়া তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত মুখে ও নেত্রে নানাভঙ্গী প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন কটিদেশের মনোহর ভঙ্গী, গ্রীবার বক্রতা ও ভ্রূনর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীরাধার দেহে ললিত নামক অনির্ব্বচনীয় শোভা-বিশেষের উদয় হয়। এইভাবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিয়া থাকেন।

(২০) **বিকৃতি**—লজ্জা, মান, ঈর্ষাদি বশতঃ যাহাতে বিবক্ষিত বিষয় বাক্যে প্রকাশিত না হইয়া শরীর-চেষ্টা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিকৃতি বলে। কথিত আছে, বস্ত্রহরণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অপহৃত বস্ত্র অর্পণ করিলে পর, গোপ কুমারীগণ স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান করিয়া সলজ্জ-নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা মুখে কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

মাধুর্য্যের পোষণ হেতু মৌগ্ধ্য ও চকিত—এই দুই অলঙ্কারেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রিয়তমের অগ্রে জ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভাণ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় যে জিজ্ঞাসা, তাহার নাম **মৌগ্ধ্য** এবং ভয়ের কারণ না থাকিলেও প্রিয়তমের অগ্রে যে ভীতি-ভাব-প্রদর্শন তাহার নাম **চকিত**। মৌগ্ধ্যের **উদাহরণ**—সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়তম! আমার কঙ্কনস্থ মুক্তাফলের ন্যায় যাহাদের ফল দেখিতেছি, ঐ সকল লতার নাম কি? কে উহা রোপণ করিয়াছে?" চকিতের **উদাহরণ**—একটী ভ্রমরকে নিকটে আসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিয়া উঠিলেন—"সখি! দেখ দেখ—এই ভয়ঙ্কর মধুকর আমার দিকে আসিতেছে। আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।" এইরূপ বলিয়াই তিনি মধুকরের ভয়ে ভীতা হইয়া পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিলেন।

নায়িকা ভেদ —

শৃঙ্গার রসে নায়ক বলিতে শৃঙ্গাররসরাজ মদনমোহন শ্যামসুন্দরকে এবং নায়িকা বলিতে সমর্থা-রতিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী ব্রজসুন্দরীগণকে বুঝায়। সতীশিরোমণি ব্রজসুন্দরীগণ বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, আত্মীয়-স্বজন, সমস্তই উপেক্ষা করিয়া এবং স্বসুখবাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব রসরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক নিত্য নব নটবর শ্যামসুন্দরকে মধুর রসের বৈচিত্রী-বিশেষ আস্বাদন করাইয়া সুখী করিবার জন্য আপনাদিগকে তাঁহার চরণে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রেম-সম্পত্তির কণাটুকু পর্য্যন্ত অন্যের পক্ষে সুদুর্ল্লভ।

স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থ-পক্ষাদি ভেদে ব্রজসুন্দরীগণ সকলেই অংশিনী শ্রীরাধিকারই অংশ। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকাই স্বপক্ষাদি ভেদে আত্মপ্রকাশ করিয়া লীলাদি বিস্তার করেন এবং সেইভাবে রসপুষ্টির সহায়তা করিয়া অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্যামনাগরকে পরিপূর্ণ সুখদান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই **নিত্যসিদ্ধা** এবং শ্রীকৃষ্ণের **নিত্যপ্রিয়া।** ইঁহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী —এই দুই জন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। এই দুই জনের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই সর্ব্বপ্রকারে অধিকা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"রাধে! তোমার কেশগুলি সুকুঞ্চিত, বদনকমল চঞ্চল অথচ দীর্ঘনেত্রে শোভমান, বক্ষঃস্থল কঠিন কুচদ্বয় সুদৃশ্য, মধ্যদেশ অতিশয় ক্ষীণ, স্কন্ধ দুইটী নিম্ন এবং মোহন করযুগল নখরত্ন দ্বারা বিভূষিত। তোমার তুল্য রূপবতী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীরাধার প্রেমাদি গুণসম্পদের একাংশও অন্যত্র নাই। এই সকল কারণে প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাকেই নায়িকা-শিরোমণি বলা হয়। ললিতাদি সখীগণ নিত্যসিদ্ধা ও নিত্যপ্রিয়া হইলেও এবং তাঁহারা যূথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও, শ্রীরাধার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও অনুরাগ বশতঃ তাঁহাদের

সখ্য-বিষয়ে রুচি হয়। তাঁহারা সখীভাব গ্রহণ করিয়া "আমরা শ্রীরাধারই"—এই বলিয়া অভিমান করেন। শ্রীরাধার নামান্তর গান্ধর্বা, চন্দ্রাবলীর নামান্তর সোমাভা ও ললিতার নামান্তর অনুরাধা।

শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশরূপে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ নিত্যপ্রিয়াগণের অংশ সকলেরও দেবকন্যারূপে দেবযোনিতে জন্ম হয়। নিত্যপ্রিয়াগণের অংশভূতা সেই দেবকন্যাগণ ব্রজধামে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া **দেবীচরী** গোপী নামে অভিহিতা হন। নিত্যপ্রিয়াগণের ন্যায় এই দেবকন্যাগণও নিত্যসিদ্ধা এবং নিত্যপ্রিয়াবর্গের প্রাণতুল্যা সহচরী। ইঁহারা কেহই মানুষী নহেন।

নিত্যসিদ্ধা ও **সাধনসিদ্ধা** ভেদে গোপীগণ দ্বিবিধা। যাঁহারা সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন তাঁহারা সাধনসিদ্ধা। এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণ প্রধানতঃ ঋষিচরী ও শ্রুতিচরী ভেদে দুইপ্রকার। এইরূপে ব্রজের কৃষ্ণবল্লভাগণ নিত্যসিদ্ধা গোপকন্যা ও দেবকন্যা এবং সাধনসিদ্ধা ঋষিচরী ও শ্রুতিচরী—এই চারি ভাগে বিভক্ত। কথিত আছে, ত্রেতায় দণ্ডকারণ্যবাসী গোপাল-উপাসক মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রের অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উপাস্য গোপালদেবের স্মরণবশতঃ পরমানন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিবার জন্য কামনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা কৃষ্ণাবতারে ব্রজগোপীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া **ঋষিচরী** গোপী নামে প্রসিদ্ধা হন। শ্রুতি বা বেদ দেবতারূপে শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করেন। তাঁহারা ব্রজগোপীগণের সৌভাগ্যলাভার্থ রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া ব্রজধামে গোপীগর্ভে জন্মগহন করেন এবং **শ্রুতিচরী** গোপী নামে অভিহিতা হন। ঋষিচরী ও শ্রুতিচরীগণ আপন আপন যূথ বা গণ সহ সাধনপরা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে **যৌথিকী** সাধনসিদ্ধা বলা হয়। **অযৌথিকী** সাধনসিদ্ধাগণ গোপীভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া স্বতন্ত্রভাবে সাধনে প্রবৃত্তা

হন এবং রাগমার্গের ভজনে তাঁহাদের গোপীভাব সিদ্ধ হইলে তাঁহারা ব্রজমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

পরোঢ়া ও কন্যকা ভেদে **পরকীয়া নায়িকা** দ্বিবিধা। শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা ব্রজগোপীগণ পরোঢ়া ছিলেন বটে, কিন্তু ভগবতী যোগমায়ার কৌশলে তাঁহাদের নিজ নিজ পতিগণের সহিত সঙ্গম হয় নাই। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গরূপ ভাগ্যের অভাবে যাঁহারা নিজ নিজ পতিকর্ত্তৃক ভুক্তা ও পুত্রবতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করিতে সমর্থা হয়েন নাই। শৃঙ্গার রসে তাঁহারা নিষিদ্ধা হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২২।৪) হইতে জানা যায়—ধন্যা প্রভৃতি কন্যকা বা অবিবাহিতা গোপকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য দেবী কাত্যায়ণীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পতিভাব বিদ্যমান থাকায় তাঁহাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণবল্লভা বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শাস্ত্রমত বিবাহ না হওযায় পরকীয়া নায়িকার ন্যায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে নিবারণাদি বিদ্যমান ছিল। বিবাহিতা পত্নীর ন্যায় তাঁহাদিগের অসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমের সুযোগ ঘটে নাই।

স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা দুইপ্রকার। **বয়স ভেদে** তাঁহাদের প্রত্যেকের আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা—এই তিন প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। ধন্যা প্রভৃতি অবিবাহিতা গোপকন্যাগণ সর্ব্বদাই মুগ্ধা। তাঁহাদের আর অবস্থান্তর নাই। সে কারণে, কন্যকা, স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে মুগ্ধা তিন প্রকার এবং স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে মধ্যা ও প্রগল্‌ভা প্রত্যেকে দুইপ্রকার।

মুগ্ধা নায়িকার নবীন বয়স, অল্পমাত্র কাম, রতি বিষয়ে বাম্য, সখী-গণের অধীনতা, রতি চেষ্টায় অতিশয় লজ্জা অথচ গোপনভাবে যত্নকারিতা এবং সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি সজল নয়নে অবলোকন। এইরূপ নায়িকা

প্রিয় ও অপ্রিয় বচনে অশক্তা এবং মানবিষয়ে সতত পরাঙ্মুখী। মধ্যা নায়িকার নব-যৌবন, লজ্জা ও কাম দুই সমান, ঈষৎ প্রগল্‌ভ বাক্য, মূর্চ্ছা পর্যন্ত সুরত বিষয়ে ক্ষমতা। মান বিষয়ে তিনি কখনও কোমলা কখনও বা কঠিনা। আর প্রগল্‌ভা নায়িকার পূর্ণ যৌবন, মদান্ধতা, বিপরীত সম্ভোগে ঔৎসুক্য, প্রচুর ভাবোদ্গমে অভিজ্ঞতা, রসদ্বারা বল্লভকে আক্রমণকারিতা এবং প্রৌঢ়-ভাবাপন্ন বচন ও চেষ্টা। এইরূপ নায়িকা নায়ককে স্বায়ত্ত বা আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া রাখিতে সতত আগ্রহান্বিতা ও মানবিষয়ে অতিশয় কঠিনা।

বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্টা গোপরামাগণের প্রেমের গতি বিভিন্ন হয় বলিয়া খণ্ডিতা অবস্থায় তাঁহাদের মানও বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মুগ্ধা নায়িকা মানবিষয়ে চতুরা নহেন, মানের বিদগ্ধতা (চতুরতা) ভেদ তিনি অবগত নহেন। মানবতী মুগ্ধা নায়িকা মুখ ঢাকিয়া কেবল রোদন করেন এবং কান্তের বিনয়বাক্যে প্রসন্না হইয়া মান পরিত্যাগ করেন। মানদশা প্রাপ্তা মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকাগণ মানের তারতম্যবশতঃ এবং নিজ নিজ স্বভাব ভেদে ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা—এই তিনপ্রকার ভেদ ধারণ করেন, যথা—ধীর মধ্যা, অধীর মধ্যা ও ধীরাধীর মধ্যা এবং ধীর প্রগল্‌ভা, অধীর প্রগল্‌ভা ও ধীরাধীর প্রগল্‌ভা।

(১) ধীর মধ্যা—অসূয়ার উদয়ে যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে ধীর মধ্যা বা সংক্ষেপে ধীরা বলা হয়। ধীরা নায়িকা ক্রোধ সত্ত্বেও ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ করেন না। কান্তকে দূরে আসিতে দেখিলে তিনি উঠিয়া কান্তের অভ্যর্থনা করেন, তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দেন, হৃদয়ে ক্রোধ থাকিলেও মুখে মিষ্ট কথা বলেন, কান্ত আলিঙ্গন করিলে তাঁহাকে ভদ্রতা সূচক আলিঙ্গনও করেন এবং মানের পোষণ হেতু কান্তের প্রতি কখন

সরণ ব্যবহার করেন, কখন বা সোল্লুণ্ঠ (পরিহাস) বাক্যে কান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন। একদা শ্রীমতী কান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া উৎকণ্ঠায় সারারাত্রি বসিয়া আছেন। নিশিশেষে রসিকশেখর স্বীয় অঙ্গে বিপক্ষ নায়িকা চন্দ্রাবলীর ভোগচিহ্নাদি ধারণ করিয়া অলস মন্থর গমনে শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিয়া দেখা দিলেন। তখন শ্রীরাধা খণ্ডিতা-দশা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—"আহা দেখি দেখি, এরূপ অপরূপ সাজে তোমাকে কে সাজালে? তোমাকে ত বেশ মানিয়েছে, কিন্তু তোমার সেই আদরিণীকে সঙ্গে আন নাই কেন? তাহা হইলে তোমার উপযুক্তই হইত।" এইরূপ বলিয়া তিনি বদন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(২) **অধীরা মধ্যা**—উগ্রভাবের উদয়ে যে নায়িকা ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় বল্লভকে নিষ্ঠুর বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাকে অধীরা মধ্যা বা সংক্ষেপে **অধীরা** বলা হয়। রোষময় নিষ্ঠুর বাক্যই অধীরার লক্ষণ কিন্তু ধীরার ক্রোধ ধৈর্য্যদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। অধীরা নায়িকা কর্ণোৎপল দ্বারা কান্তকে তাড়না করেন এবং মাল্যাদির দ্বারা বন্ধনও করেন। খণ্ডিতা শ্রীরাধা রোষভরে কান্তকে বলিতেছেন—"ছি ছি, এখানে আসিতে তোমার লজ্জা হইল না। যাও, যাও, তোমার আদরিণীর নিকটে ফিরিয়া যাও। আর তুমি এখানে থাকিও না, আর এখানে থাকা তোমার উপযুক্তও নয়।" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

(৩) **ধীরাধীরা মধ্যা**—যে নায়িকা অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে ধীরাধীরা মধ্যা বা সংক্ষেপে **ধীরাধীরা** বলা হয়। অশ্রুমোচন মুগ্ধা নায়িকার স্বভাব হইলেও ধীরাধীরার ন্যায় মুগ্ধা বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন না। ধীরাধীরা নায়িকা বক্রোক্তি দ্বারা কান্তকে উপহাস করেন, কখনও স্তুতি কখনও বা নিন্দা করেন, আবার কখনও উদাসভাব অবলম্বন করেন। খণ্ডিতা-

শ্রীরাধা সাশ্রুনয়নে বলিতেছেন—"ওহে গোপেন্দ্রনন্দন! আর আমাকে কাঁদাইও না। এতক্ষণ যেখানে ছিলে, সেইখানেই ফিরিয়া যাও। এখানে অধিক ক্ষণ থাকিলে তোমার প্রাণ-প্রেয়সী রাগ করিবেন। পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতির ফলে তোমার যে দর্শন পাইলাম, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" এইরূপ বলিয়া তিনি অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন—ধীরাদি তিনটীই শ্রীরাধার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মানের তারতম্য বশতঃ সময়ে সময়ে তিনটীরই উদয় হইয়া থাকে।

(৪) **ধীর প্রগল্‌ভা**—এইরূপ নায়িকা মানভরে সম্ভোগ বিষয়ে উদাসীনা। কুচ-ধারণ, আলিঙ্গন, চুম্বনাদি করিলেও তিনি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া অবিচলিত অবস্থায় থাকেন এবং স্বীয় মনোভাব সঙ্গোপন করিয়া মিষ্টবাক্যে প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান করেন।

(৫) **অধীর প্রগল্‌ভা**—এইরূপ নায়িকা ক্রোধবশতঃ মন ও বাক্য দ্বারা কান্তকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করেন।

(৬) **ধীরাধীর প্রগল্‌ভা**—এইরূপ নায়িকা ধীরাধীর মধ্যা নায়িকার অনুরূপ।

মধ্যা ও প্রগল্‌ভা প্রত্যেকে আবার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে দুই দুই প্রকার হয়েন—যথা, জ্যেষ্ঠ মধ্যা, কনিষ্ঠ মধ্যা, জ্যেষ্ঠ প্রগল্‌ভা ও কনিষ্ঠ প্রগল্‌ভা। যাঁহার প্রতি নায়ক প্রীতিমান, তাঁহাকে **জ্যেষ্ঠা** এবং তদপেক্ষা ন্যূন হইলে, **কনিষ্ঠা** বলা হয়। একদা উভয় প্রকার নায়িকা এক শয্যায় নিদ্রিতা আছেন। দৈবক্রমে নায়ক সেখানে উপস্থিত হইলেন। উভয়কে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি ব্যজন দ্বারা কনিষ্ঠার নিদ্রা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন এবং ধীরে ধীরে জ্যেষ্ঠার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহার সহিত বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন।

যূথেশ্বরীগণের সৌভাগ্যাদি ভেদে, নায়কের প্রেম ও আদরাদির আধিক্য, সমতা ও লঘুতা অনুসারে **অধিকা, সমা ও লঘ্বী**, এই তিন প্রকার

ভেদ হয়। নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে, ইহাঁদের প্রত্যেকের আবার প্রখরা মধ্যা ও মৃদ্বী—এই তিন প্রকার ভেদ হয়, যথা—অধিক প্রখরা, অধিক মধ্যা ও অধিক মৃদ্বী; সম প্রখরা, সম মধ্যা ও সম মৃদ্বী এবং লঘু প্রখরা লঘু মধ্যা ও লঘু মৃদ্বী। ইহাঁরা সকলেই নিজ নিজ ভাব-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন। **প্রখরা** নায়িকা দম্ভবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কেহই তাঁহার বাক্য খণ্ডন করিতে পারে না। ইহার ন্যূন বা অভাব হইলে **মৃদ্বী,** আর প্রখরতা ও মৃদুতা—এই দুইয়ের সমতা হইলে **সমা** বা মধ্যা। শ্রীরাধার যূথগণ মধ্যে ললিতাদিকে অধিক-প্রখরা, বিশাখা প্রভৃতিকে অধিক-মধ্যা এবং চিত্রা প্রভৃতিকে অধিক-মৃদ্বী বলা হয়। ললিতা বিশাখাদি সখীগণের সখীত্ব ও নায়িকাত্ব উভয়ই উপস্থিত হয়, কিন্তু মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখীগণ কখনও নায়িকাত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, নিত্যসখীগণ সেই সুখেই সুখী হয়েন। গোপীগণ যাহা কিছু করেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য—সে কারণে তাঁহাদের প্রখরতাদি স্বভাব শ্রীকৃষ্ণের বিরক্তির কারণ না হইয়া বরং তাঁহার সন্তোষের কারণই হইয়া থাকে।

বামা ও দক্ষিণা ভেদে নায়িকা আবার দুই শ্রেণীর। **বামা নায়িকা** মান গ্রহণে সতত উদ্যুক্তা এবং মানের শৈথিল্যে কোপবতী হইয়া থাকেন। নায়ক তাঁহাকে ভেদ বা বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না। নায়ক আমার সম্পূর্ণ অধীন—এইরূপ অভিমান বর্ত্তমান থাকায়, বামা নায়িকা নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনা হয়েন। বামা নায়িকা মনে করেন —শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁহারই, আর কাহারও নহেন। এই বামাস্বভাব হইতেই মানের উদয় হইয়া থাকে। **দক্ষিণা নায়িকা** মাননির্ব্বন্ধে বা মান গ্রহণে অসমর্থা। তিনি নায়কের প্রতি অনুকূল থাকিয়া যুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন এবং নায়কের প্রসন্ন বাক্যে শীঘ্রই প্রসন্না হয়েন। তাঁহার আচরণে কান্তের প্রতি নিজের অধীনতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বামা নায়িকার মদীয়তাময় মধুস্নেহ এবং দক্ষিণা নায়িকার তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহ। এইরূপে গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুমধুর শৃঙ্গার-রস নানাভাবে আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা শ্রীরাধিকা নির্ম্মল শৃঙ্গাররসের ও প্রেমরত্নের আকর স্বরূপ। শ্রীরাধিকা হইতেই অপরাপর নায়িকাতে প্রেমমাধুর্য্য ও শৃঙ্গার রস সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ শ্রীরাধা সদাই **বামা** বলিয়া প্রসিদ্ধা এবং চন্দ্রাবলী **দক্ষিণা** বলিয়া প্রসিদ্ধা। প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ ভেদে প্রেম তিন প্রকার। যেরূপ প্রেমে বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতা তাহার নাম **প্রৌঢ়**, তদপেক্ষা ন্যূন হইলে তাহার নাম **মধ্য**। ব্রজে মন্দপ্রেমের অভাব। চন্দ্রাবলী-সম্ভোগকালেও শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ পথে উদিত হইয়া থাকে বলিয়া শ্রীরাধায় প্রৌঢ় প্রেম এবং চন্দ্রাবলীতে মধ্যপ্রেম—এইরূপ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধিকাতে সকল নায়িকার অবস্থাই দৃষ্ট হয়। তাঁহার বাম্য-প্রাখর্য্যাদি দর্শন করিয়া রসিকশেখর পরমানন্দ লাভ করেন।

প্রেমের তারতম্যানুসারে ব্রজসুন্দরীগণের জ্যেষ্ঠা বা উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা—এই তিন প্রকার ভেদ হয়। কান্তের সুখবিধান করিতে **উত্তমা নায়িকা** তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, কান্ত তাঁহাকে খেদান্বিতা করিলেও তাঁহার মনোমধ্যে অসূয়ার উদয় হয় না, আর যদি কেহ মিথ্যা করিয়াও কান্তের কিঞ্চিন্মাত্র পীড়ার কথা বলে, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। এই সকল গুণে শ্রীকৃষ্ণ-মনোমোহিনী শ্যামসোহাগিনী শ্রীমতী রাধারাণী সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন। **মধ্যমা নায়িকার** প্রেম উত্তমা নায়িকার প্রেমের ন্যায় দুকূলপ্লাবী নহে। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-ব্যথা অবগত হইয়াও মানবতী মধ্যমা নায়িকার চিত্ত তৎক্ষণাৎ দ্রবীভূত হইয়া যায় না। মধ্যমা নায়িকা মনে করেন—আমি ত শ্রীকৃষ্ণের পীড়ার কথা

শ্রবণ করিয়াই আমার মান বিসর্জ্জন দিয়াছি, আর কিছুক্ষণ পরেই আমি প্রসন্নতা প্রকাশ করিব। কিছুক্ষণ উনি আমার বিচ্ছেদ-দুঃখ অনুভব করুন, আর যেন এপ্রকার অন্যায় না করেন। **কনিষ্ঠা নায়িকা** অভিসার করিতে ইচ্ছা করিলেও, অনুরাগের অল্পতা হেতু "আমি পথিমধ্যে লোকচক্ষে পতিত হইতে পারি"—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, অথবা আকাশে যৎকিঞ্চিৎ মেঘাগম দর্শন করিয়া এবং বারিপাতে গাত্র বসনাদি আর্দ্র হইয়া যাইতে পারে—এইরূপ মনে করিয়া অভিসারে বিমুখ হয়েন। এই যে বহিরঙ্গ বস্তুর স্মৃতি এবং অন্তরঙ্গ বস্তুর বিস্মৃতি—ইহা প্রেমের লক্ষণ নহে। ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রেমের ধ্বংস হয় না। প্রেমের উদয়ে কুল-ধর্ম্ম-লজ্জাদি সমস্তই বিস্মরণ হইয়া যায়। কোন প্রতিকূল ভাব প্রকৃত প্রেমকে ভেদ বা বিচলিত করিতে পারে না।

লীলা ভেদে নায়িকাগণ অষ্টদশা প্রাপ্ত হয়েন। **অষ্ট নায়িকা** যথা—

(১) **অভিসারিকা**—সঙ্কেত স্থানে নায়ক নায়িকার গমনের নাম **অভিসার**। যৌবন ও মদন হেতু যে নায়িকা কান্তের সহিত মিলনাশায় উৎসুকচিত্তে স্বয়ং অভিসার করেন অথবা কান্তকে অভিসার করান, তাঁহাকে অভিসারিকা বলা হয়। দূর হইতে লোকে যাহাতে দেখিতে না পায়, সে কারণে শুক্লপক্ষে **জ্যোৎস্নাভিসারিকার** শুভ্রবর্ণ বসন-ভূষণ এবং কৃষ্ণপক্ষে **তমোভিসারিকার** কৃষ্ণবর্ণ বসনভূষণ হইয়া থাকে। অভিসারকালে নায়িকা অবগুণ্ঠিতা হইয়া ও একটী মাত্র সখী সঙ্গে লইয়া অভিসার করেন, লজ্জা বশতঃ স্বীয় অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ সঙ্গোপন করেন এবং যাহাতে ভূষণাদির শব্দ না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

(২) **বাসক সজ্জা**—বাসক বলিতে নায়ক নায়িকার বিলাস বুঝায়। নায়ক-সমাগম প্রত্যাশায় যে নায়িকা কান্তের ইচ্ছাবশতঃ সঙ্কেত কুঞ্জে

অবস্থান পূর্ব্বক হর্ষচিত্তে কান্তের আগমন প্রতীক্ষা করেন এবং স্বীয় অঙ্গ বিভূষিত ও বাসক-গৃহ সুসজ্জিত করিয়া রাখেন, সেই নায়িকাকে **বাসক-সজ্জিকা** বলা হয়। তদবস্থায় নায়িকা প্রেমাতিশয্যে সু সজ্জিত শয্যা পুনর্ব্বার সাজাইতে থাকেন এবং উজ্জ্বল প্রদীপকে আরও উজ্জ্বলিত করিয়া দেন। কিছুতেই যেন তাঁহার সাধ মিটিতেছে না। কখন তিনি নিজ অঙ্গচ্ছায়া দর্শনে "কান্ত আসিয়াছেন"—এইরূপ মনে করিয়া ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছেন, কখন বা নিরাশ হইয়া কাতরভাবে সখীগণকে বলিতেছেন—"সখি! কানু এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? তবে কি তিনি আজ আসিবেন না।" বাসক-সজ্জিকা নায়িকার স্মরক্রীড়া-সঙ্কল্প, কান্তপথ নিরীক্ষণ, সখী সহ বিনোদ বার্ত্তা এবং মুহুর্মুহুঃ দূতীর প্রতি অবলোকন—এইরূপ বিবিধ প্রকার চেষ্টা হইয়া থাকে।

(৩) **উৎকণ্ঠিতা**—সঙ্কেত করিয়া কান্ত বহুক্ষণ যাবৎ সমাগত না হইলে দুঃখে কাতর হইয়া যে নায়িকা উৎসুকচিত্তে পথপানে চাহিয়া নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকেন, তাঁহাকে উৎকণ্ঠিতা বলা হয়। উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা বলিতেছেন—"বন্ধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু, গাঁথিনু ফুলের মালা। তাম্বুল সাজিনু, দীপ উজারিনু, মন্দির হইল আলা। সই! পাছে এ সব হইবে আন। সে হেন নাগর, গুণের সাগর, কাহে না মিলিল কান॥" বাসকসজ্জা-দশার শেষে, মানের বিরতিতে অর্থাৎ কলহান্তরিতা অবস্থায় এবং পরাধীনত্ব প্রযুক্ত সঙ্গমের অভাব হইলে—এই তিন সময়ে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়।

(৪) **বিপ্রলব্ধা**—সঙ্কেত করিয়াও যদি কান্ত আগমন না করেন, তাহা হইলে বিচ্ছেদবিষাদে ও অনাদৃত জ্ঞানে যে নায়িকার চিত্ত অতিশয় ব্যথিত হয়, তাঁহাকে বিপ্রলব্ধা বলা হয়। তখন বাসকগৃহ, শয্যা মাল্যাদি ক্লেশদায়ক বোধ হয় এবং নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি বহুবিধ চেষ্টা প্রকাশ পায়। উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধিকা বিপ্রলব্ধা-

দশা প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন—"ফুলের এ মালা, ফুলের এ ডালা, শেজ বিছাইনু ফুলে। সব হইল বাসী, আর কেন সই, ভাসাগো যমুনা জলে॥ কুঙ্কুম কস্তুরী, চুবক চন্দন, লাগিছে গরল হেন। তাম্বুল বিরস, ফুলহার ফণী, দংশিছে হৃদয়ে যেন॥ সকল লৈয়া যমুনায় ডার, আর ত না যায় দেখা। ললাটের সিন্দুর মুছি কর দূর, নয়ানের কাজর রেখা॥" নবনীরদ শ্যামনাগর সঙ্কেত অনুসারে শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে বিপক্ষ নায়িকা শ্রীচন্দ্রাবলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। চন্দ্রাবলী তাঁহাকে জোর করিয়া নিজকুঞ্জে লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনাগমনে শ্রীরাধা বিপ্রলব্ধা দশা প্রাপ্ত হইলেন।

(৫) **খণ্ডিতা**—বিপক্ষ নায়িকার সহিত নিশা যাপন করিয়া এবং তদীয় ভোগচিহ্নাদি অঙ্গে ধারণ করিয়া কান্ত যদি সঙ্কেতকাল অতিক্রম পূর্ব্বক প্রাতঃকালে সমাগত হয়েন, তাহা হইলে নায়িকা তদ্দর্শনে কোপান্বিতা হইয়া খণ্ডিতা-ভাব প্রাপ্ত হয়েন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন প্রভৃতি চেষ্টা তখন প্রকাশ পায়। শ্যামনাগর চন্দ্রাবলীর সহিত নিশা যাপন করিয়া প্রভাতে শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিয়াছেন।— "নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান, আছেন আপন কোপে। নয়ান ভুরুর, ভঙ্গিম দেখিয়া, নাগর তরাসে কাঁপে॥" খণ্ডিতা শ্রীরাধা বলিতেছেন— "আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর। অধরে কাজল দিল, কপালে সিন্দুর॥ বদন কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত। পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদারিত॥ না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে। তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥ শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত। এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥" এইরূপ বলিয়া শ্রীমতী দুর্জ্জয় মান করিয়া বসিলেন। অতঃপর শ্রীমতীর প্রতি শ্যামনাগরের কাতরোক্তি ও প্রিয়া-পদধারণ, পরিশেষে মানভঞ্জনে অসমর্থ হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান। বল্লভ প্রস্থান কারণে, মানিনীর মানও অন্তর্হিত হইল।

(৬) **কলহান্তরিতা**—যে নায়িকা সখীগণের সমক্ষে পদানত বল্লভকে ক্রোধবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করেন, তাঁহাকে কলহান্তরিতা বলা হয়। সন্তাপ, প্রলাপ, গ্লানি, অশ্রুপাত, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ প্রভৃতি কলহান্তরিতা-নায়িকার চেষ্টা। মান-ভরে বল্লভকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীমতী নিজ সখীকে বলিতেছেন—"আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিলুঁ, কাহে করিলুঁ হেন মান। শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর, কাঁহা সখি করল পয়াণ॥ তপ বরত কত, করি দিন যামিনী, যো কানু কো নাহি পায়। হেন অমূল্য ধন, মঝু পদে গড়ায়ল, কোপে মুঞি ঠেলিলুঁ পায়॥ আরে সই! কি হবে উপায়। কহিতে বিদরে হিয়া, ছাড়িলুঁ সে হেন পিয়া, অতি ছার মানের দায়॥" অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূতী প্রেরণ, শ্রীকৃষ্ণসহ দূতীর মিলন এবং অনুতপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতীর কুঞ্জে আনয়ন। দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া কলা-কৌতুকী শ্রীমতী আবার মান করিয়া বসিলেন। মানবতী শ্রীমতীর নিকটে আসিয়া শ্যামনাগর খেদোক্তি করিতে করিতে পুনরায় মানিনীর পদধারণ করিলেন। মানিনীর মন যেন ক্রমশঃ রসার্দ্র হইতে লাগিল। অতঃপর মানিনীর মানভঞ্জন এবং উভয়ের মিলন-সম্ভোগ।

(৭) **প্রোষিত ভর্তৃকা**—কান্ত দূর দেশে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিলে যে নায়িকা তদীয় বিরহে সাতিশয় কাতরা হইয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলা হয়। প্রিয়সঙ্কীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, অস্বস্তিবোধ, মালিন্য, জাড্য, চিন্তা প্রভৃতি প্রোষিত-ভর্তৃকার চেষ্টা।

(৮) **স্বাধীন ভর্তৃকা**—কান্ত যাহার প্রেমাধীন ও আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করেন এবং যিনি নিরন্তর বিচিত্র বিলাসাসক্তা, তাঁহাকে স্বাধীন-ভর্তৃকা বলা হয়। স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধা সম্ভোগান্তে স্বীয় সর্বাঙ্গে সম্ভোগচিহ্নাদি ও বেশভূষাদির বিপর্যায় দর্শন করিয়া এবং স্বীয়

সৌভাগ্যবশতঃ মনে মনে আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিয়া পরিহাসপরায়ণা সখীগণের নিকটে লজ্জিত হইবার ভয়ে কান্তকে বলিলেন—"প্রিয়তম! অভিসার কালে আমার যেরূপ বেশ ছিল সেইরূপে আমাকে সাজাইয়া দাও।" চিরাকাঙ্ক্ষিত সেবার সুযোগ লাভ করিয়া প্রেমাধীন নাগর প্রিয়ার চরণ যুগল অলক্তক রসে রঞ্জিত করিয়া দিলেন এবং মনের সাধে প্রিয়তমার প্রেমগর্ব্বিত মধুরাননের অপূর্ব্ব মাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে এবং নানা অছিলায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দর্শন-স্পর্শন-আঘ্রাণ ও চুম্বন করিতে করিতে বিচিত্র-বেশ রচনা সমাপন করিলেন। অতঃপর রসিকশেখর প্রাণপ্রিয়ার রূপ-সুধা পান করিতে করিতে স্মিতমুখে কহিতেছেন—"প্রিয়ে! সম্ভোগের সকল চিহ্নই ত' দূর করিলাম, এখন তোমার এই চিরানুগত দাস আর কি করিবে, আজ্ঞা কর।"

অষ্ট নায়িকার মধ্যে অভিসারিকা, বাসক সজ্জিকা ও স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা—এই তিন প্রকার নায়িকা সতত হৃষ্টচিত্তা ও নানাবিধ ভূষণাদি দ্বারা বিভূষিতা হইয়া থাকেন। আর উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ও প্রোষিত ভর্ত্তৃকা—এই পাঁচ প্রকার নায়িকার অঙ্গ ভূষণ শূন্য এবং হৃদয় চিন্তায় সন্তপ্ত হইয়া থাকে। বামগণ্ডে হস্তপ্রদান, খেদ প্রভৃতি লক্ষণগুলি তখন প্রকাশ পায়।

শ্রীরাধিকার অষ্ট সখীর এক এক জন অভিসারিকাদি এক একটী দশার রসজ্ঞা। চিত্রা অভিসারিকা দশার, চম্পকলতা বাসকসজ্জা দশার, রঙ্গদেবী উৎকণ্ঠিতা দশার, তুঙ্গবিদ্যা বিপ্রলব্ধা দশার, ললিতা খণ্ডিতা দশার, সুদেবী কলহান্তরিতা দশার, ইন্দুলেখা প্রোষিতভর্ত্তৃকা দশার এবং বিশাখা স্বাধীনভর্ত্তৃকা দশার রসবিষয়ে অভিজ্ঞা।

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস দুই প্রকার। নায়ক নায়িকার মিলনকালে আলিঙ্গন-চুম্বনাদির আনুকূল্যহেতু উল্লাসময় যে ভাব অনুভূত হয়, তাহার নাম **সম্ভোগ**। আর নায়ক নায়িকার

যুক্ত ও অযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের বহু আকাঙ্ক্ষিত আলিঙ্গন-চুম্বনাদির অপ্রাপ্তি বশতঃ নায়ক নায়িকার হৃদয়ে যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহার নাম **বিপ্রলম্ভ**। এই সম্ভোগ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় শীতল এবং বিপ্রলম্ভ সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উষ্ণ। প্রকৃতপক্ষে বিপ্রলম্ভ বলিতে সম্যকরূপে প্রাপ্তি বুঝায়। বিপ্রলম্ভকালে, প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত পরস্পরের স্মরণের ফলে, হৃদয় মধ্যে প্রিয়জনের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তখন সম্ভোগের অভাবেও সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয়। তদবস্থায় তমাল বৃক্ষাদিতে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হইত। বিপ্রলম্ভ জনিত তীব্র উৎকণ্ঠার পর মিলন হইলে, সেই মিলন পরমসুখদায়ক হইয়া থাকে। বিয়োগাত্মক এই বিপ্রলম্ভ বাহিরে বিষের ন্যায় জ্বালাময় হইলেও প্রিয়জনের স্ফূর্ত্তিহেতু অন্তরে ইহা অমৃতের ন্যায় মধুর। তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের ন্যায় ইহাতে তীব্র যাতনা ও অপরিমিত আনন্দ যুগপৎ বিদ্যমান থাকে। বিয়োগাত্মক এই বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। বিরহ না থাকিলে মিলনের পরিপূর্ণ আস্বাদন হয় না। অনল-উত্তাপে দুগ্ধ যেমন ক্ষীর হইয়া যায়, বিরহ-সন্তাপে প্রেমও তেমনি ঘনীভূত হইয়া থাকে। মিলনে বিরহ-ভয় আছে, কিন্তু বিরহে প্রাণে প্রাণে অবিচ্ছেদ মিলন অনুভূত হইয়া থাকে।

বিপ্রলম্ভ—কান্ত-কান্তার অমিলনের নাম বিপ্রলম্ভ। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার।

(১) **পূর্ব্বরাগ** বা প্রথম অনুরাগ—নায়ক নায়িকার মিলনের বা অঙ্গসঙ্গের পূর্ব্বে পরস্পরকে স্বপ্নে, চিত্রপটে বা সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া, অথবা কাহারও মুখে পরস্পরের গুণগান শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠাময়ী যে রতি উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত বিভাবাদি চারি ভাবের সংযোগে পুষ্টিলাভ করিয়া আস্বাদময়ী হইলে সেই রতিকে পূর্ব্বরাগ বলা হয়। পূর্ব্বরাগ-অবস্থায় নায়িকা—"সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসাএয়া পরে।"

পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা নিজভাবে বিভোরা হইয়া অবনত বদনে নখদ্বারা ভূমিলিখন করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে বলিতেছেন—"সখি! যমুনার পথে ময়ূরপিচ্ছ বিভূষিত মেঘশ্যামলকান্তি বিশিষ্ট এক অপূর্ব্ব পুরুষরত্ন দেখিলাম। তাঁহার নবজলধর-সুন্দর শ্রীঅঙ্গের কান্তিচ্ছটা ইন্দীবর (নীলপদ্ম) সদৃশ স্নিগ্ধ। অপরূপ নয়ন-ভঙ্গী ও সুমধুর বংশীধ্বনি দ্বারা তিনি আমার মনপ্রাণ হরণ করিয়াছেন। তদবধি আমি আর গৃহকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিতেছি না।" এইরূপ বলিয়া শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের অপরূপ রূপ, তাঁহার ভুবনমোহন শ্যামাঙ্গচ্ছটা ও সুমধুর বংশীধ্বনির অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি চিন্তা করিতে করিতে বিবশাঙ্গী হইলেন। শ্যাম-জলধরের প্রেম-বারি-বর্ষণ বিনা রাইকিশোরীর মনের এই তাপ জুড়াইবার নহে।

কথিত আছে, একদিন কুলবধূ শ্রীরাধা যমুনায় স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। আর্দ্র বস্ত্র নিংড়াইতে নিংড়াইতে তিনি সখীসহ গৃহে ফিরিতেছেন। দূর হইতে সদ্যঃস্নাত শ্রীমতীর অপরূপ রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া অধীর চিত্তে শ্যামসুন্দর বলিতেছেন—"চলে নীল সাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরাণ সহিত মোর। সেই হইতে মোর, হিয়া নহে থির, মনোমথ জ্বরে ভোর।" শ্রীরাধা নয়নের অন্তরাল হইলে, কিশোরশেখর শ্যামসুন্দর রাইকিশোরীর অপরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বরাগে আটপ্রকার রসের উল্লেখ আছে—যথা, সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, ভাট বা বন্দীমুখে শ্রবণ, দূতী মুখে শ্রবণ, সখী মুখে শ্রবণ, গীত হইতে শ্রবণ ও বংশীধ্বনি শ্রবণ।

(১) **মান**—পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র বা পৃথক অবস্থিত নায়ক নায়িকার বহু আকাঙ্ক্ষিত চুম্বন-বীক্ষণাদির বিরোধী যে অবস্থা তাহার নাম মান। সাক্ষাতে বা স্বপ্নে বিপক্ষ নায়িকার সঙ্গ বা ভোগ-চিহ্নাদি দর্শন করিয়া, অথবা নায়ককে বিপক্ষ নায়িকার উৎকর্ষ কীর্ত্তন

করিতে বা তাঁহার নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে শুনিয়া এবং এইভাবে বিপক্ষ নায়িকার প্রতি নায়কের অনুরাগ অনুভব করিয়া, অথবা অন্য কোনও কারণে বা অকারণে মানের উৎপত্তি হয়। বাহ্যিক উপেক্ষা থাকিলেও এই মান প্রেমেরই পরিপাক বিশেষ (পৃঃ ১৩২ দ্রষ্ট)। প্রেম-মাধুর্য্যে ভরা এই মানের ফলে প্রেম নবনবায়মান হইয়া উঠে।

মানে আটপ্রকার **রস** যথা—সখীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, মুরলী-ধ্বনি শ্রবণ, বিপক্ষ গাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন, প্রিয়গাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন, (সাক্ষাতে বা স্বপ্নে) গোত্রস্খলন অর্থাৎ নায়ক কর্তৃক নায়িকাকে তদীয় বিপক্ষের নাম ধরিয়া আহ্বান, স্বপ্নে দর্শন এবং অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন।

(৩) প্রেমবৈচিত্ত্য বা মিলন-কালীন বিরহ—প্রেমের উৎকর্ষতা বশতঃ, প্রিয়তমের সমীপে থাকিয়াও তৎসহ বিচ্ছেদভয়ে যে আর্ত্তির বা পীড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। কথিত আছে, একদিন যুগলকিশোর মধুর রসবিলাসে মগ্ন আছেন, আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সম্ভোগের পরস্পর আদান-প্রদান পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে, এমন সময়ে একটী ভ্রমর শ্রীরাধার মুখ-সৌরভে লুব্ধ হইয়া তাঁহার মুখের উপর উড়িয়া পড়িতেছিল। তদ্দর্শনে শ্রীরাধা ভ্রমর বিতাড়নে ব্যস্ত আছেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বয়স্য মধুমঙ্গল উপস্থিত ছিলেন। ভ্রমরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া এবং তাহার গমন সূচনা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"মধুসূদন গত" অর্থাৎ ভ্রমর চলিয়া গিয়াছে। মধুসূদন অর্থে ভ্রমর। মধুমঙ্গল এই অর্থে মধুসূদন-শব্দটী ব্যবহার করিলেও, শ্রীরাধা মোহবশতঃ মনে করিলেন—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণই বুঝি চলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি আর সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। বিরহ হুতাশে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"কহ সখি! প্রিয় কোথা, আমার অন্তর বেথা, ঘুচাও আনিঞা মিলাইয়া। নতুবা না বাঁচে প্রাণ, এ দুখে করহ ত্রাণ, নহে চল আমারে লইয়া॥" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়তমার এই অপূর্ব্ব

প্রেমচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সখীগণকে শ্রীরাধার ভ্রম না ভাঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রবল অনুরাগের সহিত মিলন-অবস্থায় প্রেমের স্বভাব বশতঃ বিরহ স্ফূর্ত্তি হইলে ইহা প্রকাশ পায়।

প্রেমবৈচিত্ত্যে আটপ্রকার **রস** যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ নিজের প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, দূতীর প্রতি আক্ষেপ. মুরলীর প্রতি আক্ষেপ বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ ও গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

(৪) প্রবাস—কার্য্যানুরোধে বা পরাধীনতা বশতঃ পূর্ব্বসঙ্গম-বিশিষ্ট নায়ক নায়িকার স্থানান্তরে গমন জনিত যে বিচ্ছেদ বা ব্যবধান তাহার নাম প্রবাস বা দূরদেশে বাস। এই প্রবাসে অদর্শন জনিত বিরহ উপস্থিত হয়। **কিঞ্চিদ্দূর** (যথা গোষ্ঠে গমন) ও **সুদূর** (যথা মথুরা-দ্বারকা গমন) ভেদে প্রবাস দুই প্রকার। নিকট প্রবাসে নিকট মিলন এবং সেই মিলনেই সকল দুঃখের অবসান, কিন্তু সুদূর প্রবাসে সকল সময়েই দুরন্ত বিরহব্যথা অনুভূত হইয়া থাকে।

সুদূর প্রবাস জনিত বিরহ তিনপ্রকার—**ভাবী** (ভবিষ্যৎ), **ভবন** (বর্ত্তমান) ও **ভূত** (অতীত)। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিবেন শুনিয়া যে বিরহ তাহাকে ভাবী বিরহ, তিনি মথুরা গমন করিতেছেন দেখিয়া যে বিরহ তাহাকে ভবন বিরহ এবং তিনি মথুরা গমন করিলে যে বিরহ তাহাকে ভূত বিরহ বলা হয়।

ভাবী বিরহ—যথা, রামকৃষ্ণকে মধুপুরীতে লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন। ভাবী বিরহের আশঙ্কায় শ্রীরাধা বলিতেছেন—"সখিরে! তুই আর অধিক কি বলিবি? আমি মনে প্রাণে বেশ বুঝিতে পারিতেছি—প্রিয়তম আমাকে ছাড়িয়া প্রবাসে যাইবেন। শত শত বিপদকে আমি গ্রাহ্যও করি না, কিন্তু কানুবিরহে বাঁচিয়া থাকা যে অসম্ভব। সখি! দেখিও, যেন গমনকালে তোমরা কেহ তাঁহাকে নিষেধ

বাক্যে বাধা দিয়া তাঁহার অমঙ্গল করিও না।" **ভবন বিরহ**—যথা, হেমময় রথে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়াছেন, গোপ-গোপীগণ উন্মত্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। ক্রমে রথ অদৃশ্য হইল। অমনি শোকাকুলা শ্রীরাধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ধরাতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। **ভূত বিরহ**—যথা, রাধাকান্ত বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় বাস করিতেছেন। এদিকে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীরা হইয়া কখন উন্মত্তের ন্যায় হাস্য করিতেছেন, কখন বা অধোবদনে রোদন করিতেছেন, আবার কখন অর্দ্ধবাহ্য দশায় বলিতেছেন—"হায় হায়! কোথায় সেই নন্দকুল চন্দ্রমা? কোথায় বা সেই শিখিপুচ্ছ মৌলি মুরলীধারী মুরারি? গম্ভীর মুরলীরবে যিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেন, তিনিই বা কোথায়? সখি! সেই রাসনৃত্যকারী রসিকশেখর শ্যামনাগর আমার কোথায় গেলেন? হা বিধাতা! আমার সেই অমূল্যরত্নকে কোথায় লইয়া গেলে? তোমাকে আর কি বলিব? তোমাকে সহস্রবার ধিক্।"

প্রবাসে আটপ্রকার **রস** যথা—ভাবীবিরহ, মথুরাগমন, দ্বারকা-গমন, কালীয় নাগ দমনার্থ জলে প্রবেশ, গোষ্ঠে গমন, নন্দমোক্ষণার্থ বরুণ-লোকে গমন, কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর গমন ও রাসে অন্তর্দ্ধান। এইরূপে চারিপ্রকার বিপ্রলম্ভে মোট বত্রিশপ্রকার রসের উল্লেখ আছে।

কান্ত প্রবাসে থাকিলে তদীয় কান্তাকে **প্রোষিত ভর্ত্তৃকা** বলা হয়। প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার **দশ প্রকার দশা** ঘটিয়া থাকে—যথা, **চিন্তা** (অভীষ্ট প্রাপ্তির লালসা ও আলোচনা) **জাগরণ** (নিদ্রার অভাব), **উদ্বেগ** (মনের চাঞ্চল্য), **তানব** (বিরহ-তাপ হেতু অঙ্গের কৃশতা), **মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি** (দেহের সন্তাপাদি), **উন্মাদ** (বুদ্ধি বিভ্রম), **মোহ** (চিত্তের বিপরীত গতি) ও **মৃত্যু** (মরণের উদ্যম বা মরণবৎ অবস্থা)। মথুরা-পতি শ্রীকৃষ্ণে

নিকটে যাইয়া দূতী বলিতেছেন—"হে রাধাবল্লভ! শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-ভবন, মলয় পবন, চন্দ্রের কিরণ, কোকিলের কলনাদ—ইহারা সুখদান করা দূরে থাকুক, শ্রীরাধাকে এখন দাবানলের ন্যায় পোড়াইয়া মারিতেছে। হে রাধাকান্ত! তোমার বিরহে শ্রীমতীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর তোমাকে কি বলিব? "তোহারি মথুরা-গমন চিন্তিয়া, লিখই খিতির পরে। জাগি দিবানিশি, হৃদয় বিদরে, উদবেগে আঁখি ঝরে॥ অতি খিণ তনু, মলিন হইল, প্রলাপে কারে কি কহে। ব্যাধি বিরহে, ধরণী লুঠয়ে, মরণের পথে রহে॥ উন্মাদ হৈয়া, উঠে বৈসে যেন, মৃগী বিষ-শর-ঘাতে। মোহ-দশা ভেল, দেহ দুরবল, শকতি না রহে তাথে॥ দশমী দশায়, ঘড়ঘড় কণ্ঠ, শ্বাস বহে নাহি বহে। শুন হে মাধব, রাই দশ দশা, পামরী উদ্ধবে কহে॥" এইরূপে পদকর্ত্তা মাধব-দাস শ্রীমতীর **দশদশা** বর্ণনা করিয়াছেন।

সম্ভোগ—কান্ত ও **কান্তা** উভয়ে নির্জ্জনে মিলিত হইয়া দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারা তৃপ্তিপূর্ব্বক যে ভোগ করেন, তাহাই সম্ভোগ। মুখ্য ও গৌণ ভেদে এই সম্ভোগ দুই প্রকার। জাগ্রতাবস্থায় যে সম্ভোগ তাহাকে **মুখ্য সম্ভোগ** এবং প্রেমোৎকণ্ঠা বশতঃ স্বপ্নাবস্থায় যে সম্ভোগ তাহাকে **গৌণ সম্ভোগ** বলা হয়। মুখ্য সম্ভোগ আবার চারিপ্রকার—যথা, সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। পূর্ব্বরাগের পরে **সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ,** মানের পরে **সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ,** কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের পরে **সম্পন্ন সম্ভোগ,** এবং সুদূর প্রবাসের পরে **সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ** হইয়া থাকে। কাহারও মতে, প্রেমবৈচিত্ত্যের পরেও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ হয়।

(১) **সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ—পূর্ব্বরাগের পর** প্রথম মিলনে লজ্জা, ভয়, ও অসহিষ্ণুতা বশতঃ দর্শন-আলিঙ্গন-চুম্বনাদি ভোগাঙ্গ সকল অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ সম্ভোগের নাম সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের যে হস্ত গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, প্রথম-সমাগম নিমিত্ত লজ্জায় ও ভয়ে তাঁহার সেই হস্তই শ্রীরাধার স্তনস্পর্শে কম্পিত হইল। নবসঙ্গমে প্রবৃত্তা শ্রীরাধাও সলজ্জ বদনে অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে—"চুম্বন করিতে মুখ বস্ত্রেতে ঢাকয়। কুচে কর দিতে হস্ত ঠেলিয়া ফেলয়॥ সঙ্গমপ্রসঙ্গে অঙ্গ মুড়িয়া হেলয়। সভয় অন্তর দেহে কম্প প্রকাশয়॥"

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে—বাল্যবস্থায়, গোষ্ঠে, গোদোহনকালে ও আকস্মিক, মিলন এবং হস্তাকর্ষণ-বস্ত্রাকর্ষণ-বর্ত্মরোধ ও রতিভোগ রূপ মিলন—এই আট প্রকার মিলনে আট প্রকার রসের উল্লেখ আছে।

(২) **সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ—মানের পর** মিলনকালে নায়কের পূর্ব্বাচরণজনিত মানের কারণ নায়িকার স্মৃতিপথে উদিত হয়। নায়কের পূর্ব্বাপরাধ স্মরণে নায়িকার চিত্ত বিরস থাকায় আলিঙ্গন-চুম্বনাদি ভোগাঙ্গ সকল সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ সম্ভোগের নাম সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণের ন্যায় ইহাতে মিষ্টতা ও উষ্ণতা অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ যুগপৎ বিদ্যমান থাকে। সঙ্কীর্ণ সম্ভোগে মানিনী—"সঙ্গপ্রসঙ্গে করে বাক্যের তাড়ন। বদন ফিরায় মুখ করিতে চুম্বন॥ কোপদৃষ্টি করিয়া চাহয়ে প্রিয়পানে। আনন্দে ভাসয়ে হরি অন্তরে বাখানে॥" এখনও মানিনীর বদনকমল প্রসন্নতা বিস্তার করে নাই। সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের শেষভাগে আর সঙ্কীর্ণতা থাকে না। তখন রসবতী নায়িকা লঘু লঘু বচনে অমৃত বর্ষণ করিয়া রতিরসচঞ্চল প্রিয়তমাকে রসামৃতে ভাসাইতে থাকেন। তদবস্থায় শ্রীরাধা বলিতেছেন—"নিলজ মাধব! তোহে পরণাম। অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম॥ এ হরি! এ হরি! কর অবধান। আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ॥"

মহারাসে, জলক্রীড়ায়, কুঞ্জ-লীলায়, দান-লীলায়, বংশীহরণ-লীলায়,

নৌকাবিলাসে, মধুপানে ও সূর্য্য পূজার উদ্দেশ্যে মিলন—সঙ্কীর্ণ সম্ভোগে এই আট প্রকার মিলনে আট প্রকার **রসের** উল্লেখ আছে।

(৩) **সম্পন্ন সম্ভোগ—কিয়দ্দূর প্রবাস** হইতে কান্ত আসিয়া মিলিত হইলে যে সম্ভোগ হয়. তাহার নাম সম্পন্ন সম্ভোগ। সম্পন্ন সম্ভোগে—"তুহুঁ ভুজ পাশে, তুহুঁ ঘন বাঁধই, অধর-সুধা করু পান।" রসিকনাগর শ্রীকৃষ্ণ চন্দন-কবচ পরিয়া এবং রসবতী শ্রীরাধা কুচ ও কাঁচুলি রূপ কবচ পরিয়া রতিরণে মত্ত হইয়াছেন। বিপুল পুলকে উভয়েরই কবচ জরজর হইল, বসন-ভূষণ শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িল।

আগতি (লৌকিক ব্যবহার দ্বারা সাধারণ ভাবে আগমন) ও প্রাতুর্ভাব (অকস্মাৎ আবির্ভাব)—এই তুই ভেদে সম্পন্ন সম্ভোগ তুই প্রকার। প্রাতুর্ভাব যথা—"বিরহিনী প্রেয়সীর রাখিতে পরাণ। আচানক দেখা দিয়া হন অদর্শন॥ রতি-কেলি-আদি নানা ক্রীড়া যায় করি। স্বপনের ন্যায় তাহা মানয়ে সুন্দরী॥" (ভক্তমাল)। এই ভাবের বিরহে দ্বিগুণ পীড়া বোধ হয়।

সুদূর দর্শনে, ঝুলন-যাত্রায়, হোলী-লীলায়, প্রহেলিকায়, পাশা খেলায়, নর্ত্তন রাসে, রসালসে ও কপট নিদ্রায়, মিলন—সম্পন্ন সম্ভোগে এই আট প্রকার মিলনে আট পকার রসের উল্লেখ আছে।

(৪) **সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ**—পরাধীনতা বা **সুদূর প্রবাস বশতঃ** বিরহবিধুর নায়ক-নায়িকার পরস্পর দর্শন তুর্লভ হইলে—এই-রূপ অবস্থায় আকস্মিক মিলনে রসময় উপচারের সহিত যে অতিরিক্ত সম্ভোগ হয় তাহার নাম সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। ইহাতে সর্ব্বাধিক আগ্রহের সহিত সম্ভোগ হইয়া থাকে বলিয়া ইহাই সর্ব্বাধিক সমৃদ্ধিশালী। উদাহরণ—"নিকুঞ্জের মাঝে রাধা-কান। হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥ ঘন ঘন চুম্বন, ঘন রসভাষ। ঘন রসে মগন, নাহি পরকাশ॥

ঘন আলিঙ্গন ঘন করু কোর। অতি রসে দুহুঁ জন ভেল বিভোর॥ বিপরীত লাগি তহিঁ নাগর রায়। ঐছনে রচতহিঁ তাক উপায়॥ বুঝি সুবদনী ধনী তাকর সুখ। ঐছন বচনে ভেল উনমুখ॥ কহ শিবরাম পূরল অভিলাষ। চিরদিনে বিপরীতে করয়ে বিলাস॥"

স্বপ্নে, কুরুক্ষেত্রে, ভাবোল্লাসে, মথুরা হইতে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনে, বিপরীত সম্ভোগে, ভোজন কৌতুকে, একত্র নিদ্রায় ও স্বাধীন ভর্তৃকা-ভাবে, মিলন—এই আট প্রকার মিলনে আট প্রকার **রসের** উল্লেখ আছে। এইরূপে চারি প্রকার সম্ভোগে মোট বত্রিশ প্রকার রস উল্লিখিত হইয়াছে।

নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ—

শৃঙ্গাররসে নায়ক বলিতে অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আধার স্বরূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। রমণী-মন-চোর নবঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার, তাঁহার সর্ব্বশরীর শৃঙ্গার রসে গঠিত। নিরন্তর কামক্রীড়া বা প্রেমের খেলাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। তিনি অপ্রাকৃত নবীন মদন, সাক্ষাৎ মন্মথমোহন। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং কামদেবের চিত্তকেও তিনি মথিত করিয়া থাকেন। নিজ-মাধুর্য্যে তিনি নিজেই মুগ্ধ হইয়া যান। শৃঙ্গার-রসই তাঁহার সর্ব্বসম্পত্তি, শৃঙ্গাররস আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত তিনি দিবা-রাত্র রসলীলা করিয়া থাকেন।

যেস্থলে প্রচুর রূপে শৃঙ্গারের চেষ্টা প্রকাশ পায়, তাহাকে **ললিত** বলা হয়। "রায় কহে—কৃষ্ণ হয়ে ধীর-ললিত। নিরন্তর কাম-ক্রীড়া যাঁহার চরিত।" (চৈঃ চঃ ২।৮।১৪৭)। যিনি বিদগ্ধ বা রসপণ্ডিত অর্থাৎ যিনি চতুঃষষ্টি কলায় ও বিলাসাদিতে সুনিপুণ, যিনি নবযৌবন-সম্পন্ন, নিশ্চিন্ত বা উদ্বেগশূন্য ও পরিহাসপটু, সেইরূপ নায়ককে **ধীর-ললিত** বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গের মধ্যে যাঁহার সেরূপ প্রেম,

ধীরললিত শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেয়সীর সেইরূপ বশীভূত হইয়া থাকেন। নিত্য-নূতন বিলাসবিশিষ্ট কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স বলিয়া পরিগণিত হয়। নিত্য অনুভূত হইলেও তিনি স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য দ্বারা নিত্যই নূতনরূপে অনুভূত হয়েন।

বহুবিধ গুণ-ক্রিয়াদির আস্পদস্বরূপ শৃঙ্গার-রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ শুধু **ধীর ললিত** নহেন, লীলাভেদে তিনি আবার **ধীরোদাত্ত, ধীর শান্ত** ও **ধীরোদ্ধত**। **ধীরোদাত্ত** রূপে তিনি গম্ভীর প্রকৃতিবিশিষ্ট, বিনয়-যুক্ত, ক্ষমাশীল, দয়ালু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদারচেতা, আত্মশ্লাঘাশূন্য ও অতিশয় বলবান, **ধীরশান্ত** রূপে তিনি শান্ত, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক, বিবেকাদি গুণযুক্ত; আবার **ধীরোদ্ধত** রূপে তিনি দুষ্ট দণ্ডনের হেতু, মাৎসর্য্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধপরবশ, আত্মশ্লাঘী ও চঞ্চল। এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তাহা সম্ভব হইয়াছে

ধন্যাদি গোপ কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য দেবী কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দ গোপ সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥ (শ্রী ভাঃ ১০।২২।৪)। শ্রীকৃষ্ণও পতিরূপে তাঁহাদিগের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ধন্যাদি গোপকুমারীগণের শ্রীকৃষ্ণে পতিভাব হয়, কিন্তু শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপতি-ভাব। এই পতি ও উপপতি—ইহাদের প্রত্যেকের বৃত্তিভেদে অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ এবং ধৃষ্ট, এই চারি প্রকার ভেদ হয়। শ্রীরামচন্দ্র যেমন কেবল শ্রীসীতা দেবীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি অন্যললনাবিষয়ক স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকার প্রতি আসক্ত ছিলেন। শ্রীরাধাকে দর্শন করিলে, অন্য কোনও রমণীর কথা তাঁহার মনে উদিত হয় না। সে কারণে নারীজনমনোহারী শ্রীকৃষ্ণকে **অনুকূল** নায়ক বলা হয়।

অন্য কোনও ললনার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলেও তিনি শ্রীরাধিকার গৌরব, ভয় ও দাক্ষিণ্যাদি পরিত্যাগ করেন না বলিয়া তাঁহাকে আবার **দক্ষিণ** নায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ আবার **শঠ** অর্থাৎ সম্মুখে প্রিয়ভাষী হইয়াও পরোক্ষে তিনি প্রিয়ভাব না দেখাইয়া গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়েন। তিনি আবার **ধৃষ্ট** অর্থাৎ অন্য ললনার ভোগ-চিহ্নাদি অভিব্যক্ত হইলেও তিনি নির্ভয় এবং মিথ্যা বচনে অতিশয় দক্ষ। এইরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর একাধারে পতি ও উপপতি এবং তাহাদের বৃত্তি ভেদে অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট। সুপ্রতিষ্ঠিত ঐশ্বর্য্য-নিবন্ধন, যুগপৎ সকল গুণ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই আছে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কোন ভাবই অযুক্ত নহে।

নায়ক প্রথমতঃ চারি প্রকার—ধীরললিত, ধীরোদাত্ত, ধীরশান্ত ও ও ধীরোদ্ধত। ইহারা প্রত্যেকে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম ভেদে দ্বাদশ প্রকার হয়। এই দ্বাদশ প্রকার নায়ক আবার পতি ও উপপতি ভেদে চব্বিশ প্রকার হয়। আবার, অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে ঐ চব্বিশ প্রকার নায়ক ষটনবতি প্রকার হইয়া থাকে। শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে নিখিল নায়কের অবস্থা বিদ্যমান। শাঠ্য, চাপল্য, কৌটিল্যাদি দ্বারা তিনি নিজ প্রেমকে কামের মত দেখাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম, তাঁহার কামের কখনও ব্যভিচার হয় না। কোটি কন্দর্পের দর্প-খর্ব্ব-কারী রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিচার পূর্ব্বক রস আস্বাদনে বিশেষ পটু। নায়কোচিত মহাগুণরাশি তাঁহাতে পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। নাগরশেখর শ্যামসুন্দর শ্রীরাধিকা প্রমুখ ব্রজসুন্দরীগণের রসাভাসদোষবর্জ্জিত কাম-গন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেম পরকীয়াভাবে আস্বাদন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। সুবলাদি প্রিয় নর্ম্ম সখাগণ ও বটু মধুমঙ্গল এই রহস্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের রসলীলায় সহায়তা করেন। "কৃষ্ণ বলে

থাকেন প্রেয়সীগণ সনে। তথায় যাইতে পারে নর্ম্ম সখাগণে॥" নর্ম্ম সখাগণ—"প্রেয়সী সম্বন্ধে নানা রসের কথনে। কৃষ্ণে সুখ দেন বহু রঙ্গের বচনে॥" (ভক্তমাল)। প্রিয় নর্ম্মসখাগণ সখীভাবাশ্রিত, রহস্যজ্ঞ, এবং প্রণয়িগণ মধ্যে অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকেন।

নায়িকাশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণী—

শ্যামসোহাগিনী রাধারাণী ব্রজগোপীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনিই নায়কশেখর শ্যামসুন্দরের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু। নিখিল প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণী সর্ব্ববিধ অপ্রাকৃত গুণ রাশি দ্বারা বিভূষিতা। ভক্তমাল বলেন—"শ্রীরাধিকা যত, গুণে অলঙ্কৃত, কৃষ্ণেতে ততেক নহে। যেহেতু মোহন, শ্রীরাধিকা বিন, ক্ষণেক সুখে না রহে॥" মাদনাখ্য মহাভাবময়ী রাধাঠাকুরাণীর সহিত মিলিত হইয়া অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ **মদনমোহন** নামে অভিহিত হয়েন এবং শ্রীরাধার অনন্যসুলভ গুণরাশি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়া থাকেন। রাধারাণীর প্রেম-তরঙ্গিত টল টল তনুখানি যেন সুধার সুরধুনী। তাঁহার হাস্য-সুধা, বচন-সুধা ও রূপ-সুধাদি আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাধ যেন মিটে না। শ্রীমতীর ভাবরসময়ী যে কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপারে আনন্দচমৎকারিতা অনুভব করিয়া প্রেমিকশিরোমণি আত্মহারা হইয়া যান। কথিত আছে, বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ একদিন ব্রজসুন্দরীগণের অনুরোধে বিচিত্র রাগ-রাগিণীর আলাপ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রীমতীর সহাস্য কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। স্বয়ং ভগবান হইয়াও তিনি আর বিশুদ্ধভাবে রাগিণীর আলাপ করিতে সক্ষম হইলেন না। সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথস্বরূপ যিনি, তাঁহার মনকেও যিনি মথিত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-মনোমোহিনী রাধারাণীর প্রেম-মহিমার তুলনা নাই। সত্যভামাদি শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণও তাঁহার সৌভাগ্য-

গুণ বাঞ্ছা করেন। শ্রীমতীর সর্ব্বাঙ্গই বিশুদ্ধ প্রেমরসে গঠিত। তাঁহার কেশে কুটিলতা, নয়নে চঞ্চলতা ও কুচযুগে নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান। আশ্চর্য্যের বিষয়—এই সকলের দ্বারাই তিনি শৃঙ্গার রসরাজ শ্যামসুন্দরকে শৃঙ্গাররসামৃত পান করাইয়া নিয়ত পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিতে সমর্থা। শ্রীরাধা ব্যতীত রসিকশেখর শ্যামসুন্দরের প্রেমপিপাসা মিটে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।১০৮)। রাধা-প্রেমের এমনই অদ্ভুত শক্তি যে সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ইহা পুতুলের মত নাচাইতে পারে। প্রেমময়ী শ্রীরাধা দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া থাকেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন—"দেখে এলাম তারে সই, দেখে এলাম তারে। এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥ বেন্ধেছে বিনোদ চূড়া নব-গুঞ্জা দিয়া। উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥ কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা। আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেল রাখা॥ মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হেলন। দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥" নিত্য নব প্রেমোল্লাসপূর্ণ যুগলকিশোরের সুখ-দুঃখের অবস্থা ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যাহা চাহেন একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই তাহা পরিপূর্ণরূপে পাইয়া থাকেন। আবার শ্রীরাধা যাহা চাহেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই তাহা পরিপূর্ণ-রূপে প্রাপ্ত হয়েন। ঋক্ পরিশিষ্টে উক্ত আছে—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা" শ্রীরাধার সাহচর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্যে শ্রীরাধা সাতিশয় শোভান্বিত হইয়া থাকেন।

যুগল কিশোর—

শ্রীকৃষ্ণ-সুখের ও শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের আধার ভূতা শ্রীরাধার সহিত উজ্জ্বলরসময়ী প্রেমলীলা করিয়া রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রেমবিলাস প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত। তাঁহাদের

অনন্তসুলভ প্রেম লক্ষবাণ (অর্থাৎ লক্ষবার অগ্নিতে দগ্ধ সুতরাং অতি বিশুদ্ধ) স্বর্ণের ন্যায় সুনির্ম্মল ও উজ্জ্বল। এই প্রেমের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। সাধক চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—"এখন পীরিতি না দেখি, না শুনি। পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি ॥ দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥" শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তি, রাধাগতপ্রাণ শ্যামসুন্দর রাধা-নামে সাধা বাঁশী বাজাইয়া আকুল প্রাণে প্রিয়তমাকে আহ্বান করিতেছেন, আর সেই বাঁশীরবে পাগল হইয়া কৃষ্ণগতপ্রাণা প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা প্রাণবল্লভের নিকটে ছুটিয়া চলিয়াছেন! ভাবে বিভোর হইয়া উভয়েই যেন বলিতেছেন—"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥" উভয়েই যেন ভাবিতেছেন—"লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়া রাখল, তৈও হিয় জুড়ন না গেলি।" যুগল কিশোরের অপূর্ব্ব প্রেম-মহিমার তুলনা নাই—"নিতুই নূতন, পিরীতি দুজন, তিলে তিলে বাঢ়ি যায়। ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাঢ়য়, পরিণামে নাহি ক্ষয় ॥" যুগলকিশোরের রূপেরও তুলনা নাই—"দুহুঁ মুখ সুন্দর, কি দিব তুলনা। কানু মরকত মণি, রাই কাঁচা সোনা ॥ নব গোরচনা গোরী, কানু ইন্দীবর। বিনোদিনী বিজুরী, বিনোদ জলধর ॥" শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শ্রীরাধা তেমনি পূর্ণ। কাম-বিলাসে মহাতৃষান্বিত হইয়া তাঁহারা যুগলে মণিমাণিক্যাদি খচিত রতন-বেদিকার উপরে অঙ্গ-হেলাহেলি করিয়া এবং মৃদু মধুর হাস্যশোভিত বদনে তৃষিত নয়নে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, মনোহর নেত্রপ্রান্ত দ্বারা পরস্পরের চন্দ্রবদনের প্রেমসুধা পান করিতেছেন—আর চতুর্দ্দিকে সখীগণ সেবা-সামগ্রী হস্তে যুগলকিশোরের তৎকালোচিত সেবা করিতেছেন। "দুহুঁ অঙ্গ হেলা হেলি। দুহুঁ দোঁহা মুখ হেরি, দুহুঁ রসে দুহুঁ ভেল ভোর ॥" যুগলকিশোরের এই অপূর্ব্ব রসলীলা ভাষায় প্রকাশ

করা যায় না। মূকাস্বাদনবৎ ইহা স্বসংবেদ্যমাত্র। এই রসসুধার এক কণাই সারা জগৎকে সুখের বন্যায় ভাসাইয়া দিতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩৬) বলেন—"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥" যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম, তথাপি ভক্তজনের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চে বিচিত্র লীলাবিলাস করিলেন। তাঁহার এই রসময় লীলাকথা শ্রবণ করিলে জীব তদেকনিষ্ঠ হয়, অর্থাৎ বহির্মুখী জীবের মতি অন্তর্মুখী হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত শৃঙ্গাররসাকৃষ্ট অথচ বহির্মুখী, তাহাদিগকেও আত্মপরায়ণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই শৃঙ্গাররসাত্মক প্রেমের খেলা।

বেদান্তসূত্রে, "**জন্মাদ্যস্য যতঃ**" অর্থাৎ যাহা হইতে এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন, যাহাতে অবস্থিত এবং যাহাতে বিলীন হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম (পৃঃ ৩০ দেখ) বলা হইয়াছে। কান্তা-কান্তভাবে পরস্পর আলিঙ্গিত যুগল-কিশোরের একীভূত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অভিন্নতাপ্রাপ্ত দেহই বেদের **ব্রহ্ম**, যাহাতে ভেদবুদ্ধির অবকাশমাত্র থাকে না (পৃঃ ১৫৬ দেখ)। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এক স্বরূপ ও এক আত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে দুই পৃথক দেহ ধারণ করিয়া রতিরঙ্গরসে ডুবিয়া আছেন। তাঁহারা উভয়ে আবার একত্র মিলিত হইয়া রাইকান্তি-মিলিত-তনু কলির প্রচ্ছন্ন-অবতার **শ্রীগৌরাঙ্গরূপে** বিচিত্র লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। যুগলকিশোরের অপূর্ব্ব মহামিলনই শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্মরণ মঙ্গল

১। যুগলকিশোরের লীলাস্মরণ,—

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণ-কমলের প্রেমসেবাই জীবের সাধ্য. যুগলকিশোরের প্রেমসেবা-প্রাপ্তিই সকল সাধ্যের সার। ব্রজসুন্দরীগণের ভাব-মাধুর্য্যে যাঁহারা আসক্ত, সেইরূপ ব্রজচরিতপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রগাঢ় **লৌল্য মূল্যেই**, অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণের স্বভাবসিদ্ধ ভাবমাধুর্য্যে প্রগাঢ় তৃষ্ণা বা লোভ-বিশেষরূপ মূল্যদ্বারাই, সর্ব্বসাধ্যসার এই প্রেমসেবা লাভ করিতে পারেন। লোভই তাহার একমাত্র মূল্য। কোটিজন্মের সুকৃতির ফলেও তাহা পাওয়া যায় না। রাগানুগাভক্তগণ অন্তশ্চিন্তিত গোপকিশোরী-দেহে সখী-মঞ্জরীর আনুগত্যে প্রেমানন্দময় যুগলকিশোরের দৈনন্দিন রসকেলি স্মরণ-মনন করিয়া এবং সেইভাবে বাহ্যবিস্মৃতিময় এক অপূর্ব্ব অন্তর্দশা লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দে ভাসিতে থাকেন। অগাধ কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে অবগাহন করিয়া সাধকের মনপ্রাণ তখন নিত্য নূতন অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতেই মানসী-সেবার পরিণতি বা পূর্ণতাপ্রাপ্তি। লোভ প্রবর্ত্তিত রাগমার্গ ব্যতীত অর্থাৎ প্রবল অনুরাগের সহিত সম্পূর্ণ মনটী নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিতে না পারিলে, এইরূপ অবস্থা লাভ হয় না।

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অভীষ্ট বস্তুর অনুচিন্তনের নাম **স্মরণ**। এই স্মরণই উপনিষদে নিদিধ্যাসন নামে অভিহিত হইয়াছে। এই স্মরণই রাগমার্গের অন্তরঙ্গ সাধন, বাহ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিযাজন। অষ্টপ্রহর

ভজনের নিমিত্ত যুগলকিশোরের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণের ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বপ্রকার ভজনের মধ্যে স্মরণই শ্রেষ্ঠ ভজন এবং সর্ব্ব প্রকার স্মরণের মধ্যে হৃদ্গত কামরোগনাশক **অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণই** শ্রেষ্ঠ স্মরণ। আনন্দোল্লাসময়ী এই মহালীলার স্মরণ ব্যতীত যুগলকিশোরের নিকুঞ্জসেবা লাভ করা যায় না। মধুর ভজনের পথ-প্রদর্শক নরোত্তম দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন—"হরি হরি! আর কবে হেন দশা হব—ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব, দুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাব। কবে বৃষভানু-পুরে আহীরী গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জনমিব। দোঁহ চন্দ্রমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে অশ্রুধার। বৃন্দার আদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব, কবে হেন হইবে আমার॥ জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি, কর্পূর বাসিত গুয়াপান। এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা, ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপাম॥ সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিব কবে, যোগাইব ললিতার কাছে। নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়, দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে॥" নির্ব্বিচার প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ও তদ্ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত ব্রজধামে যুগলকিশোরের প্রেমসেবা লাভ হয় না, মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় ব্যতীত যুগলকিশোরের অপ্রাকৃত রস-লীলার সুমধুর চিত্র হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না।

স্কন্দ পুরাণ বলেন—বৃন্দাদেবী কর্তৃক সুরক্ষিত দ্বাদশ বনই **বৃন্দাবন**। শ্রীহরি এইস্থানে নিত্য বাস করেন এবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবগণ এই ধামকে সেবা করেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াকানন এই বৃন্দাবনের সমস্তই **অপ্রাকৃত** বা চিন্ময় এবং সর্ব্বাভীষ্টসাধক। তথাকার বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ধেনুগণ কামধেনু, ভূমিই চিন্তামণি, জলই অমৃত, কথাই গান, গমনই নৃত্য, বংশীই প্রিয়সখী এবং চিদানন্দময় বস্তুগুলি তথাকার জ্যোতিঃ-স্বরূপ। যুগল কিশোরের নিত্যবাসহেতু তথাকার জীবজন্তু সকল ক্রোধ-লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া মিত্রের ন্যায় একত্রে বাস করে। নরোত্তম দাস

ঠাকুর গাহিয়াছেন —"যোগমায়া বন্দোঁ ভগবতী পৌর্ণমাসী। ব্রজের পূজিতা তেঁহো সর্বলোকে ঘোষি॥ যুগলকিশোর-লীলা যত ইতি উতি হয়। তাঁহার ঘটনা সব জানিহ নিশ্চয়। তাঁর দুই শিষ্যা আছে নামে বীরা, বৃন্দা। বীরা ব্রজে থাকে, বৃন্দাবনে থাকে বৃন্দা॥ সিদ্ধ মন্ত্র বৃন্দাকে দিয়াছে পৌর্ণমাসী। মন্ত্রবলে বনদেবীগণ তাঁর দাসী॥ তাথে দিব্য শক্তি ধরে বৃন্দাঠাকুরাণী। দূতী-সখীরূপে, দোঁহা মিলায় আনি॥ ছয় ঋতু মূর্ত্তিমন্ত সেবা করে নিতি। পক্ষিগণ শব্দ করে মনুষ্য আকৃতি॥ ময়ূর করয়ে নৃত্য ভ্রমর ঝঙ্কার। শারী শুক কথা কহে মনুষ্য আকার॥ কপোত হুংকার শুনি, কোকিলের রা। মলয় পবন বহে মন্দ মন্দ বা॥"

সান্দীপনী মুনির জননী, সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী ভগবতী **পৌর্ণমাসী** দেবর্ষি নারদের উপদেশে অবন্তীপুরী হইতে ব্রজধামে আসিয়া যমুনাতীরে পর্ণ কুটীরে বাস করেন। তাঁহার তপস্বিনীর বেশ, শিরে শুভ্র কেশ এবং পরিধানে কাষায় বসন। স্বরূপতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়কারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া। ব্রজের সকলেই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক সখা **মধুমঙ্গল** (বটু) সান্দীপনী মুনির পুত্র। দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার অনুরাগ বিস্তারের নিমিত্ত গর্গ-মুনির কন্যা নান্দীমুখীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্তরঙ্গা দূতী নান্দীমুখী —"মান রক্ষা পূর্বক সন্ধিতে বুদ্ধিমতী।" কাহারও মতে, নান্দীমুখী সান্দীপনী মুনির কন্যা।

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয়-প্রপিতামহ দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া-পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম শূরসেন এবং আভীর বৈশ্য জাতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম পর্জন্যদেব। শূরসেনের পুত্র **বসুদেব** মথুরায় বাস করেন এবং পর্জন্যদেবের পুত্র **নন্দ** গোকুলে বাস করেন। সেই সময়ে শ্রীরাধার পিতা **বৃষভানু** গোকুলের নিকটে রাবল গ্রামে বাস করিতেন। কথিত আছে, রাবলেই শ্রীরাধার জন্ম হয়। রাজা কংসের ভয়ে বসুদেব স্বীয়

গর্ভবতী পত্নী রোহিণী দেবীকে মথুরা হইতে গোকুলে নন্দালয়ে পাঠাইয়া দেন। নন্দালয়েই শ্রীবলরামের জন্ম হয়। কয়েক বৎসর পরে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া নন্দ মহারাজ **নন্দীশ্বর** গ্রামে এবং তাঁহার মিত্র বৃষভানুরাজ **বর্ষাণে** যাইয়া বাস করেন। নন্দ মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপনন্দের পুত্রের নাম সুভদ্র এবং সুভদ্রের পত্নীর নাম **কুন্দলতা**। দেবী কুন্দলতা শ্রীরাধা-কৃষ্ণমিলনের সহায়কারিণী ছিলেন। **ধনিষ্ঠা** ছিলেন নন্দালয়ের দাসী এবং **তুলসী** ছিলেন শ্রীরাধার প্রিয়তমা দাসী।

শ্রীরাধার শ্বশুরালয় **যাবট** গ্রামে। শ্রীকৃষ্ণ-সখা **শ্রীদাম তাঁহার** জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং **অনঙ্গ মঞ্জরী** তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা। পিতা বৃষভানুরাজ প্রিয়তমা কন্যা শ্রীরাধিকার জন্য যাবটে তাঁহার শ্বশুরালয়ে স্বতন্ত্র একটি বৃহৎ মহল তৈয়ারী করাইয়া দেন। শ্রীরাধার সখীগণ ব্যতীত আর কাহারও তথায় যাতায়াত ছিল না। জাত্যাভিমানিনী শাশুড়ী **জটিলা** তথায় প্রবেশ করেন না। দূর হইতেই তিনি বধূর সহিত কথা বলেন। আর পতি-অভিমানী নপুংসক **অভিমন্যু** রাত্রিকালেও গোশালায় বাস করেন। জটিলা-পুত্র এই অভিমন্যু মা যশোদার মাতুল-পুত্র—এই সম্পর্কে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাতুল।

সূর্য্যকুণ্ডতীরে **সূর্য্যমন্দিরে** সূর্য্যদেবের শ্রীবিগ্রহ আছেন। দেবী পৌর্ণমাসীর হিত উপদেশ অনুসারে, শাশুড়ী জটিলা স্বীয় পুত্র অভিমন্যুর মঙ্গলকামনা করিয়া দেবী কুন্দলতার তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন স্বীয় বধূকে সূর্য্যমন্দিরে পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে শ্রীরাধা পুষ্পচয়নের ছলে কুন্দলতা ও সখীগণের সহিত নিজ কুণ্ড (রাধাকুণ্ড) তীরে আসিয়া প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী অরিষ্টাসুরের প্রাণবধ করিলে, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ তাঁহার বৃষবধজনিত পাপক্ষালনের জন্য সর্ব্ব-তীর্থে স্নানের ব্যবস্থা

করিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অসুরবধস্থানে পদাঘাত করিলেন। তখনই সেই স্থান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় একটী সুদৃশ্য কুণ্ডে পরিণত হইল এবং কুণ্ডে সর্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হয়েন। ইহাই **শ্যামকুণ্ড**। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—"তুমি আমার শক্তিস্বরূপা, সুতরাং তোমাকেও পাপস্পর্শ করিয়াছে। তখন শ্রীরাধার পাপক্ষালনের জন্য শ্যামকুণ্ডের পার্শ্বে **রাধাকুণ্ড** প্রস্তুত হইল। শ্রীরাধার ন্যায় রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। কুণ্ডের মহিমা ও শোভা অতুলনীয়। শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ও নীরে যুগলকিশোর সখীগণের সহিত লীলাবিলাস করিয়া থাকেন।

২। অষ্টকালীয় নিত্যলীলার দিগ্‌দর্শন—

প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন— এই চারিকালে যুগলকিশোরের **দিবা-লীলা** এবং সায়ং, প্রদোষ, নিশা ও নিশান্ত—এই চারিকালে **রাত্রি-লীলা**। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ দণ্ড সময়কে **নিশান্তকাল** বলা হয়। ৬০ দণ্ডে অষ্টপ্রহর বা এক দিন, সুতরাং ১ দণ্ড=২৪ মিনিট এবং ৬ দণ্ড=২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট। সকাল ৬টার সময় সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রি ঘণ্টা ৩।৩৬ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত নিশান্ত কাল। অন্যান্য কালের পরিমাণও ৬ দণ্ড হিসাবে ধরা হয়, কেবল মধ্যাহ্ন ও নিশা—এই দুই কালের প্রত্যেকের পরিমাণ ১২ দণ্ড করিয়া ধরা হয়। বিরহ বর্ণনা দ্বারা রসলীলার পরিসমাপ্তি নিয়মবিরুদ্ধ। সে কারণে বিরহাত্মক নিশান্ত লীলা বর্ণনা দ্বারা অষ্টকালীয় লীলা আরম্ভ করা হয়।

নিশান্ত লীলায় শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে নিদ্রাগত যুগলকিশোরের জাগরণ এবং নিজ নিজ গৃহে গোপনে আগমন ও শয়ন। **প্রাতঃকালে** উভয়ের জাগরণ, স্নান ও বস্ত্রাদি পরিধান, শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন লীলা, নন্দালয়ে রন্ধনার্থ আগতা শ্রীরাধার চন্দ্রমুখ দর্শন ও

ভোজন শয়নাদি লীলা। **পূর্ব্বাহ্নে** (সঙ্গবে) সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনগমন ও গোচারণাদি লীলা, **মধ্যাহ্নে** ও **নিশাকালে** বৃন্দাদেবী-সেবিত বনমধ্যে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্ভাবে বিবিধ বিলাস, **অপরাহ্নে** ধেনুসহ শ্রীকৃষ্ণের গৃহে আগমন, পথিমধ্যে যাবটগ্রামে রাই-মুখ সন্দর্শন, **সায়ংকালে** শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন ও স্নান-জলপানাদি লীলা এবং **প্রদোষে** শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় গমন, সুহৃৎবর্গের আনন্দবর্দ্ধন ও ভোজনাদি লীলা। অষ্টপ্রহরই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নে ও নিশাকালে সাক্ষাদ্ভাবে এবং অন্যান্য কালে মনে মনে, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিলাস; মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেন—কখন, কোথায় ও কি প্রকারে শ্রীরাধার সহিত তাঁহার মিলন হইবে এবং মিলনকালে কিরূপ রসকেলি করিতে হইবে।

(১) **নিশান্তলীলা** বা কুঞ্জভঙ্গ (রাত্রি ঘণ্টা ৩৷৩৬ হইতে সূর্য্যোদয় ৬টা পর্য্যন্ত)—নিভৃত নিশা-লীলায় বৃন্দাবনস্থ বিলাসকুঞ্জে রতন-পালঙ্কোপরি সুখে শায়িত যুগলকিশোর—"ঘন ঘন চুম্বন, দৃঢ় পরিরম্ভণ" —ইত্যাদি প্রকারে রসকেলি করিতে করিতে রতিরণক্লান্ত হইয়া কেলিকুঞ্জের পুষ্পশয্যায় সুরতনাশন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন।" "দুহুঁ জন ঘুমাওল সুখে। দুহুঁ অরপিত দুহুঁ মুখে॥ তনু তনু জড়িত করিয়া। আবেশে রহল ঘুমাইয়া॥ নিজ নিজ কুঞ্জ তার কাছে। তাহে সখীগণ শুতিয়াছে॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি যত। শুতিল কুঞ্জের চারিভিত॥"

নিশা-অবসানে সেবাপ্রাণা মঞ্জরীগণ জাগরিত হইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে তৎকালোচিত সেবার উপযোগী দ্রব্য-সমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সখীগণ আসিয়া গবাক্ষপথে প্রেমিক যুগলের রতিরসালসে অপরূপ শয়ন-মধুরিমা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—"রতন পালঙ্কে শুতি রহু দুহুঁ জন, অতিশয় আলসে ভোর। ঘন-দামিনী কিয়ে মরকত কাঞ্চন, ঐছন দুহুঁ দুহুঁ কোর॥"

ওদিকে—"বৃন্দা-বচনহি সব দ্বিজ কুল। কুঞ্জয়ে চৌদিশে হৈয়া আকুল॥" যুগলকিশোরের নিদ্রা ভঙ্গের নিমিত্ত বৃন্দাদেবী পক্ষীগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের কোমল কলরবে জাগরিত হইয়া এবং সেই শব্দে রজনী প্রভাত হইয়াছে বুঝিয়া উভয়ে সঙ্গভঙ্গভয়ে কাতর হইলেন। জাগরিত হইয়াও রসালসে দোঁহার প্রগাঢ় প্রেম-আলিঙ্গন শিথিল হইল না। উভয়ে—"শুতল হিয়ে হিয়ে গোরি।" আর—"রাই-বদন ঘন, চুম্বই সাদরে, কাতর হৃদয় মুরারি।" দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভোর হইয়া রতি-রণরঙ্গস্থলী কুসুম-শয্যায় উভয়ে নিমীলিত নয়নে শুইয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন—"বর পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল, রজনী কয়ল অবসান।" অবস্থা বুঝিয়া, বৃন্দাদেবী গৃহপালিত শুক শারীকে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার শিক্ষানুসারে গৃহপালিত শুকশারী নানাবিধ হৃদ্য ও অহৃদ্য বচনাবলী দ্বারা যুগলকিশোরের হৃদয়ে বাস্তব ব্যাপারের স্মৃতি জাগাইয়া, শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিল। তখন—"অনেক যতনে উঠি বসিলা দুইজন। বৃন্দাসঙ্গে নিকটে আইলা সখীগণ॥" কুঞ্জ মধ্যে আসিয়া সখীগণ নাগর-নাগরীর ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি, রতিশ্রান্ত কলেবর এবং বেশভূষাদির বিপর্য্যয় ও স্থানচ্যুতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভঙ্গিমাময় বাক্যরস ও বচনচাতুরী দ্বারা বিবিধ হাস্য পরিহাস ও নানারঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া, সুরসিক নাগরবর মৃদু মধুর হাস্য ও কৌতুকের সহিত নৈশবিলাস ও রতিরণ বর্ণনা করিয়া রসবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন—"লাজে কমলমুখী ঝাঁপি রহল মুখ-আধ।" রসবতীর লজ্জাবিনম্র বদনকমল ও সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত বিচিত্র অঙ্গ-শোভা দর্শনে রসরাজ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

বিনোদিনীর বিনোদমুখের মৃদুমন্দ হাস্য যেন সুধা উদগীরণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রসিকেন্দ্র চূড়ামণি পুনর্ব্বিলাসের নিমিত্ত লালসাকুল হইলেন এবং প্রিয়তমাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ঘন ঘন

চুম্বন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নানাভাবে হাস্য-পরিহাস ও রস-আলাপন অবাধে চলিতেছে বটে, কিন্তু ভাবী বিচ্ছেদ ভয়ে প্রেমিকযুগলের মনে একটুও স্বস্তি নাই। সারারজনী বিহার করিয়াও তাঁহাদের প্রেম-পিপাসা মিটে নাই। প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহাদের প্রেমার্ত্তি নবনবায়মান হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সঙ্গভঙ্গভয়ে উভয়ে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।—"দুহুঁক নয়ন নীরে, দুহুঁ তনু ভীগই, রোয়ই মুখ মুখ জোরি।" উভয়ের হৃদ্গত প্রণয় যেন অশ্রুধারারূপে বহির্গত হইতেছে।

গৃহ-প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বৃন্দাদেবীর নিদেশে—"কক্‌খটী উঠায় তান, কি করহ রাধা-কান, তুরিতহি করহ পয়ান। রাইরে না দেখি ঘরে, জটিলা লগুড় করে, বনে আসি করয়ে সন্ধান॥" এইরূপে কক্‌খটী বানরী জটিলার আগমন সংবাদ নিবেদন করিলে, তাহার কপট বচনে বিচলিত হইয়া—"ভরমহি কানুক, পীতবসন লেই, সুন্দরী ঝাঁপল অঙ্গ। রাইক ওড়নি, লেই সুনাগর, চলু সব সহচরী সঙ্গ॥" "মেঘশ্যামল কৃষ্ণচন্দ্র প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধিকার উদ্দীপক পীত-বসন পরিধান করেন এবং গৌরবর্ণা শ্রীরাধা প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপক নীল-বসন ধারণ করেন। ব্যস্ততা প্রযুক্ত এক্ষণে দোঁহার বস্ত্র পরিবর্ত্তিত হইল বটে, কিন্তু শ্রীঅঙ্গের ও পরিবর্ত্তিত বস্ত্রের বর্ণসাম্যহেতু উভয়ের বস্ত্র-পরিবর্ত্তন কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উভয়ে আকুল চিত্তে কুঞ্জের বাহিরে আসিলেন। তখন—'বিচ্ছেদে আকুল দোঁহে, নেত্রে জলধার। দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করে বার বার॥ কালোচিত কর্ম্ম তবে করে দুই জন। দুই পথে দুই জন করিলা গমন। সচকিত নয়নে মন্দিরে দোঁহে গেলা। আলসে পালঙ্কোপরি শয়ন করিলা॥"

সকলেই গোপনে নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং অবশিষ্ট রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন।

(২) প্রাতঃকালীন লীলা—(সূর্যোদয় ৬টা হইতে ৮।২৪ পর্যন্ত)—যথানিয়মে দেবী পৌর্ণমাসী প্রাতঃকালে নন্দালয়ে আসিলে, ব্রজেশ্বরী তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। দেবীও আনন্দিত মনে রাণীকে আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রতিচিহ্নযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তখনও শুইয়া আছেন। পৌর্ণমাসী নন্দরাণীকে বলিলেন—"দেখ, কৃষ্ণ নীল বস্ত্র কেমনে পরিল। কপালে সিন্দুর দাগ কেমনে লাগিল।" পুত্রের অঙ্গে শ্রীরাধার নীল উত্তরীয় দেখিয়া স্নেহান্ধা জননী মনে করিলেন – ইহা বলরামেরই নীল বসন। তাই তিনি সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন –"রামের বসন, পরিলা কখন, কে নিল বসন তোর ?" পুত্রের মুখে কোন কথাই নাই। তখন নন্দরাণী পুত্রের অঙ্গ হইতে নীলবাস লইয়া ধনিষ্ঠার হস্তে দিলেন। অতঃপর পুত্রের অঙ্গে শ্রীরাধাকৃত নখাঘাত চিহ্ন ও রাধাঙ্গের সিন্দুর-কুঙ্কুম-কজ্জলাদি দেখিতে পাইয়া স্নেহময়ী জননী বুঝিলেন—মল্লক্রীড়াকালে পুত্রের সুকোমল অঙ্গে কণ্টকের আঁচড় লাগিয়াছে ও নানা বর্ণের মৃত্তিকা তাঁহার গাত্রে লিপ্ত হইয়াছে। তখন নন্দরাণী আক্ষেপ করিয়া ভগবতীকে বলিলেন—"সাত পাঁচ নাহি মোর অন্ধকের নড়ি। বনে বনে ফিরে সদা, উপায় কি করি ?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি স্তনক্ষীর ও নেত্রনীর দ্বারা প্রাণাধিক পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। জননীর বাক্য শুনিয়া গোকুলচাঁদ গামোড়া দিয়া হাই তুলিয়া শয্যাত্যাগ করিলেন এবং জননী ও ভগবতীকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিতেই—"যত দাসগণ, করিয়া যতন, ধোয়াইল মুখ চান্দে।" মুখ প্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া গোপ-রাজ-নন্দন সুবলাদি সখাগণ সহ প্রিয়া-রস-কথার আলোচনা করিতে করিতে গোদোহনে চলিলেন। স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—"অধিক বিলম্ব করিও না, সত্বর ভোজন করিতে আসিও।"

ওদিকে যাবট গ্রামে শ্রীরাধার শ্বশুরালয়ে তদ্গতপ্রাণা মাতামহী মুখরা দেবী (বড়-আই বা বড়াইবুড়ী) উপস্থিত হইলেন। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি বড় আদরের নাতিনীকে দেখিতে যান। শ্বাশুড়ী জটিলার প্রতি দেবীপৌর্ণমাসীর হিত উপদেশ ছিল—"বধূ দিয়া সূর্য্য পূজ দ্বাদশ বৎসরে। অসংখ্য হইবে ধেনু দিবাকরের বরে॥ যশোদা রাণীর আজ্ঞা পালিহ যতনে। পুত্রের পরমায়ুবৃদ্ধি হবে দিনে দিনে॥" দেবী পৌর্ণমাসীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহই সাহস করেন না। তাই জটিলা মুখরাকে প্রণাম করিয়া এবং দেবীর আজ্ঞা নিবেদন করিয়া বলিলেন—"তোমার নাতিনী এখনও শয়নে আছেন,— "অতএব যাঞা তারে জাগাও আপনি। করাও মঙ্গল যাতে পুত্র হয় ধনী॥" অতঃপর মুখরা একাকী শ্রীরাধার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীরাধার শয়ন-কক্ষে মিলিত হইয়াছেন এবং সকলে হাস্থ-পরিহাস-রসে নিমগ্ন আছেন। মুখরা তথায় আসিয়া স্নেহভরে আদরিণী নাতিনীর কোমলাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে রাধা-অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র দেখিতে পাইলেন এবং তাহা দেখিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন।—"তবে, কহে বিশাখা, শুনহ ঠাকুরাণী। বৃদ্ধ হৈলে বুদ্ধি লোপ হয় হেন জানি॥ পীত বস্ত্র কোথা তুমি দেখ বধূ অঙ্গে। বিচারিয়া নাহি কহ কুবুদ্ধি তরঙ্গে॥" ইতিমধ্যে চতুরা বিশাখা মুখরা দেবীর অলক্ষ্যে পীত বস্ত্রখানি লুকাইয়া রাখিয়া রাই-অঙ্গে নীলবস্ত্র জড়াইয়া দিলেন। —"তবে ত লজ্জিত হৈলা দেখি নীলাম্বরে। নিঃশব্দ হৈয়া তেহোঁ গেলা নিজ ঘরে॥" বৃদ্ধা মুখরা বাহিরে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিলেও অন্তরে তিনি শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মিলনের সহায়কারিণী ছিলেন। অতঃপর শ্রীরাধা বাহিরে আসিয়া সুবাসিত জলে মুখপ্রক্ষালনাদি করিলেন এবং সখীগণ নানা কথারঙ্গে তাঁহাকে স্নান করাইয়া বিচিত্র বস্ত্র-অলঙ্কারে ভূষিতা করিলেন। কৃষ্ণ-সুখ-যোগ্যবেশে ভূষিতা হইয়া শ্রীরাধা— 'কৃষ্ণের মিলন লাগি হইলা চঞ্চল। কাশ্মীর

প্রাপ্তিই তাঁর নারী বেশ ফল॥” শ্রীকৃষ্ণবিরহে তিনি ক্ষণপরিমিত কালও শত শত যুগের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন।

ভগবতী পৌর্ণমাসীর মুখে নন্দরাণী শুনিয়াছেন—“দুর্ব্বাসার বরে রাধা মিষ্ট হস্ত হয়। তার হস্ত-স্পর্শ খাইলে পরমায়ু বাঢ়য়॥” দেবীর সেই কথা স্মরণ করিয়া, শ্রীরাধার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রাতঃকালীন খাদ্যদ্রব্য সকল রন্ধন করাইবার জন্য তিনি কুন্দলতাকে মাতুল-পত্নী জটিলার নিকটে পাঠাইলেন। কুন্দলতাকে তিনি বলিয়া দিলেন—“জটিলার পায়ে মোর কহিবে নিবেদন। আনহ রাধিকা শীঘ্র সঙ্গে সখীগণ॥” তখন—“যশোদার আজ্ঞায় আসিয়া কুন্দলতা। জটিলায় প্রণাম করি কহিল সর্ব্ব কথা॥” রাধারাণী তখন সখীসনে কৃষ্ণকথারসে বিভোরা হইয়া আছেন। শাশুড়ীর আহ্বানে নিকটে আসিয়া এবং তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া শ্রীরাধা অন্তরে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেও প্রকাশ্যে বলিলেন—“আমি কুলবধূ, নিত্য পরগৃহে যাইতে আমার বড় লজ্জা করে।” তাহা শুনিয়া জটিলা বলিলেন—“ব্রজেশ্বরী তো তোমার অনাত্মীয়া নহেন আর তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে।” অনন্তর তিনি কুন্দলতাকে বলিলেন—“আমি জানি, তুমি অতি সতীলক্ষ্মী। আমার বধূকে আমি তোমার করে সমর্পণ করিলাম। নির্জ্জন পথ দিয়া তুমি ইহাঁকে লইয়া যাইও, যাহাতে নন্দসুতের বক্রদৃষ্টি ইহাঁর উপর না পড়ে।” জটিলার আদেশে রাই বিনোদিনী নিজ অঙ্গচ্ছটায় দশদিক আলোকিত করিয়া যাবট হইতে নন্দীশ্বর অভিমুখে চলিয়াছেন। সঙ্গে আছেন কুন্দলতা ও সখীগণ। নন্দালয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহারা দূর হইতে শ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইলেন। শ্যামনাগর গোদোহনাদি সমাপন করিয়া মদনমনোহর বেশে তৃষিত নয়নে পথপানে চাহিয়া আছেন। চারিচক্ষের মিলন হইল। তখন—“দুহুঁ অঙ্গ মাধুরি, দুহুঁ অবলোকই, দুহুঁ জন নয়ন বিভোর।” রসবতী রাই মুচকি হাসিয়া আড়নয়নে

প্রাণবল্লভকে দেখিতে দেখিতে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন এবং কম্পিত কলেবরে অবনত বদনে অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। অন্তপুরে আসিয়া শ্রীরাধা ভক্তিভরে নন্দরাণীর চরণে প্রণাম করিলেন। রাণী তাঁহাকে সস্নেহে হৃদয়ে ধরিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিলেন —"রোহিণীর সঙ্গে বাছা করহ রন্ধন। এত বলি চাঁদমুখে করিলা চুম্বন॥" দাসীগণ আসিয়া শ্রীমতীর চরণ ধৌত করিয়া শুষ্ক বস্ত্রে মুছিয়া দিলেন। অতঃপর শ্রীমতী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আনন্দিত মনে রন্ধন করিতে বসিলেন, আর সখীগণ যোগাড় দিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রজেন্দ্র-কুমারের প্রিয় ভক্ষ্য-ভোজ্য-পানীয়াদি প্রস্তুত হইল।

গোদোহনের পর সখাগণসহ মল্লযুদ্ধ ও ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিয়া এবং স্নানান্তে মনোহর বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন সখাগণের সহিত ভোজনে বসিয়াছেন। "শ্রীদাম সুবল দোঁহে বৈসে কৃষ্ণ বামে। বটু সম্মুখে, আর বলরাম বসিলা দক্ষিণে॥" বটু মধুমঙ্গল রন্ধনের প্রশংসা করিয়া হাস্য পরিহাস ও নানা রঙ্গ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা খাদ্যদ্রব্যাদি থালিতে ভরিয়া রোহিণীমায়ের হস্তে তুলিয়া দিতেছেন, আর রোহিণীদেবী তাহা পরিবেশন করিতেছেন। সেই অবসরে শ্রীরাধা রোহিণীদেবীর অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী পান করিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ—"নয়ন অঞ্চলে নেহারেন রাই মুখ। তাহা দেখি সখীগণ পায় বহু সুখ॥" পরম সুখে ভোজনাদি সমাপন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ—"রতন পালঙ্কোপরি করিলা শয়ন। আনন্দে চরণ সেবা করে দাসগণ॥ "ক্ষণপরে রসিকনাগর নিদ্রার ভান করিয়া দাসগণকে সরাইয়া দিলেন।

এদিকে শ্রীরাধা—"রাণীর বচনে, চলিলা ভোজনে, বসিলা আসন 'পরি। রোহিণী আসিয়া, দেন যোগাইয়া, থালিতে থালিতে ভরি॥ রাধার যে পণ, আনিল তখন, কুন্দলতা প্রিয়তমা। অবশেষে লৈয়া,

দিলেন আনিয়া, করিয়া চাতুরী সীমা॥” শ্রীরাধার প্রতিজ্ঞা ছিল—তিনি কৃষ্ণ প্রসাদ বিনা ভোজন করিবেন না। তাই তাঁহার একটী নাম ‘কৃষ্ণাবশেষাশনা’। সখীগণ সহ শ্রীরাধা নানা রসরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশেষ পরমানন্দে ভোজন করিলেন। “সখীগণ সঙ্গে, নানা রস রঙ্গে ভোজন করল সুখে। ভক্ষ্য সমাপন, করি আচমন, তাম্বূল দেয়ল মুখে।” অতঃপর—“পুত্রের বিবাহ লাগি বস্ত্র অলঙ্কার। অভিলাষ করে রাণী কতেক প্রকার॥ সেই সব অলঙ্কার অমূল্য বসন। রাধিকারে পরাইলা করিয়া যতন॥ প্রত্যেকে প্রত্যেকে সব দিল সখীগণে। সিন্দূর তাম্বূল তবে দিল সর্ব্বজনে॥” তদনন্তর নন্দরাণী শ্রীরাধাকে বলিলেন—“পুত্রি! আমার নিকটে তোমার লজ্জা করা উচিত হয় না। কীর্ত্তিদা যেমন তোমার জননী, আমিও তোমার তেমনি। তুমি এখানে যথেচ্ছ শয়ন বিশ্রামাদি কর।” তখন সকলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুচতুরা ধনিষ্ঠা শ্রীরাধাকে গোপনে লইয়া গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইলেন।

নিশান্ত লীলাকালে, রাই-কানুর বসন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মা যশোদা কৃষ্ণাঙ্গ হইতে নীলবসন লইয়া ধনিষ্ঠার হস্তে দিয়াছিলেন এবং বিশাখা সখী রাধাঙ্গ হইতে পীতবাস লইয়া তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ধনিষ্ঠা সুযোগ বুঝিয়া শ্রীরাধার নীলবাস বিশাখার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং সুবল সখাকে দিবার জন্য বিশাখার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের পীতবাস লইলেন।

(৩) **পূর্ব্বাহ্ণ লীলা** (দিবা ঘ ৮।২৪ হইতে ১০।৪৮ পর্য্যন্ত)—কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মা যশোদা প্রাণাধিক পুত্রকে গোষ্ঠগমনোচিত ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহার গাত্রে ব্যাঘ্রনখ, রক্ষাডোর প্রভৃতি বাঁধিয়া দিলেন।—“কিবা সে মোহন বেশ ত্রিভুবন জিনি। ময়ূরের পুচ্ছ, পুষ্প চূড়ার টালনী॥ অঙ্গে আভরণ সাজে, সুগন্ধি চন্দন। কটিতে কিঙ্কিনী

বাজে, পীত বসন॥ কনক নূপুর বাজে চলিতে চরণে। এইমত বেশ বানাইল সর্ব্বজনে॥” এইরূপ যুবতীজনমনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—“রাইমুখ নিরখিয়া, ধেনু সখা সঙ্গে লৈয়া, যমুনা-পুলিন-বনে যায়।” ধেনু ও সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিলে, সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।—“বনে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ, সখাগণ সঙ্গে। নানা খেলা গোচারণ, করে নানা রঙ্গে॥ স্থানে স্থানে সখাগণ নিযুক্ত করিলা। সুবল-মঙ্গলেরে কহিতে লাগিলা॥ আমরা মাধবী পুষ্প চল যাই তুলি। এত বলি কুণ্ডতীরে আইলা কুতূহলী॥” রাধারাণীর সহিত মধুর লীলা বিলাস করিবার জন্য রাধা-কুণ্ড-তীরে আসিয়া রসিক-শেখর নাগরবর—“রাই দরশন লাগি করয়ে বিষাদ।” দর্শনোৎকণ্ঠায় ও মিলনাগ্রহে আকুল হইয়া তিনি পথপানে চাহিয়া থাকিয়া রাই-সঙ্গ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মা যশোদা অতি কষ্টে প্রাণকানুকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া বিষাদিত মনে পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সাদরে চন্দ্রবদনা শ্রীরাধার মুখ চুম্বন করিয়া কুন্দলতাকে বলিলেন—“রাইয়েরে লইয়া বাছা চলহ আপনি।” শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-গমনে শ্রীরাধা ভগ্নমনা হইয়া আছেন। রাণীর অনুমতি লইয়া ও তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি কুন্দলতা ও সখীগণসহ যাবটে ফিরিয়া গেলেন। বধূকে পাইয়া এবং তাঁহার অঙ্গে নন্দরাণী প্রদত্ত বিচিত্র বসন ও বিবিধ ভূষণ দেখিয়া শাশুড়ী জটিলা নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। কুন্দলতা সম্মুখেই ছিলেন। তাঁহার হস্ত ধরিয়া জটিলা তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন—পতিব্রতা ধর্ম্মে তোমার নিষ্ঠা আছে। তাই—“বধূরে সঁপিনু আমি, তোমার হাতে হাতে। বধূ লঞা সূর্য্য পূজা, করাহ ত্বরিতে॥” এইরূপে কুন্দলতার উপরে সূর্য্য পূজা করাইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে জটিলা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। অতঃপর—“কৃষ্ণ-সুখহেতু কৃষ্ণ-

মনোবৃত্তি জানি। প্যারীজীর বেশ করে সকল রমণী॥" স্বর্ণময় ঝাঁপা ও মল্লিকার থোপা দিয়া শ্রীরাধার বিচিত্র বেণী রচনা করিয়া—"নাসায় তিলক, কেহ কপালে সিন্দূর। অঙ্গ মুছাইয়া লেপে কুঙ্কুম কর্পূর॥ কর্ণভূষা নানা মণি-মুক্তায় জড়িত। নাসায় নোলক, গজমতি সুললিত॥ কেহ বা পরায় কণ্ঠে মুকুতার হার। রতন ধুক্ধুকি মরকতমণি সার॥ চরণে নূপুর মণি-গুঙ্গুর পঞ্চম। যাহার মধুর ধ্বনি কৃষ্ণ-মনোরম॥ কটিতে কিঙ্কিণী, করে বলয় কঙ্কণ। যাহাতে কৃষ্ণের মত্ত শ্রবণ নয়ন॥" এইরূপে মনোহর বেশে সজ্জিতা হইয়া প্রিয়তমের জন্য রসবতীর উৎকণ্ঠা প্রবল হইয়া উঠিল।

এদিকে ললিতা সখী শ্রীকৃষ্ণের সমাচার ও মিলন-সঙ্কেত-কথা জানিবার জন্য সুচতুরা তুলসীমঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। শ্রীরাধার বিপক্ষ নায়িকা চন্দ্রাবলীও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গসুখ লাভের আশায় দুইজন প্রধানা সখী পদ্মা ও শৈব্যার সহিত বনে আসিয়াছেন। পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী একটী মিলনযোগ্য কুঞ্জে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, আর শৈব্যা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে বহির্গতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া এবং তুলসীকে সেখানে দেখিতে পাইয়া শৈব্যা হতাশ মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমি যে অন্য কার্য্যে এখানে আসিয়াছি, এই কথা তুলসীকে বুঝাইয়া কোনও রকমে মান রক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ মনে করিয়া তিনি তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সখী কোথায়? আজ চন্দ্রাবলীর গৃহে ভদ্রকালীর পূজা হইবে। শ্রীরাধাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বাহির হইয়া এবং তাঁহাকে তাঁহার ঘরে না পাইয়া আমি এই বনে আসিয়াছি।" সুচতুরা তুলসী শৈব্যার চতুরতা বুঝিতে পারিয়া এবং "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"—এই নীতি অবলম্বন করিয়া উত্তর দিলেন—"শ্যামলা আজ নিজ গৃহে অম্বিকার পূজা করিবেন। শ্রীরাধা এখন সখীগণের সহিত সেইখানেই আছেন। আমিও এতক্ষণ সেইখানে ছিলাম।

পূজার ফুলের জন্য ললিতা আমাকে বনদেবী বৃন্দার নিকটে পাঠাইল। বৃন্দার সন্ধানেই আমি এখানে আসিয়াছি।" শৈব্যাকে এইরূপে প্রতারিত করিয়া তুলসী সহর্ষে চলিয়া গেলেন। তুলসী চক্ষুর অগোচর হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বাহ্যিক তাচ্ছিল্য দেখাইয়া শৈব্যাকে চন্দ্রাবলীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈব্যা বলিলেন—"গৌরী পূজার ছলে চন্দ্রাবলীকে অভিসার করাইয়া এবং পদ্মার সহিত তাঁহাকে কুঞ্জে রাখিয়া তোমার সন্ধানে আমি একক এখানে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া নাগরশেখর কিছুক্ষণের জন্য চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। ক্ষণপরেই চতুরচূড়ামণি রাধাগতপ্রাণ শ্যামনাগর নিজ মনোভাব গোপন করিয়া এবং বাহিরে আনন্দের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ইহা ত' বড়ই আনন্দের কথা। চন্দ্রাননা চন্দ্রাবলীর সহিত নির্জ্জনে মিলিত হইবার জন্য আমি সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি, কিন্তু দাদা বলদেব এই বনে আসিতে পারেন। অতএব প্রাণপ্রিয়া চন্দ্রাবলীকে তুমি গোপনে গৌরীতীর্থে লইয়া যাও। আমি শীঘ্রই সেখানে যাইয়া তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব।" এইরূপে শঠশিরোমণি রসিকনাগর চন্দ্রাবলী ও তাঁহার সখীগণকে সুদূর স্থানে পাঠাইয়া দিলেন এবং এইরূপে শ্রীরাধার সঙ্গসুখ নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে, সখীগণ তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণে পাঠাইয়া দিয়া সূর্য্যপূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং সত্বর আয়োজন সমাপন করিয়া শ্রীরাধাকে লইয়া বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তুলসীর আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সকলে চলিয়াছেন, এমন সময়ে তুলসী আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তুলসী বলিলেন—"কৃষ্ণ দিয়াছেন মালা, গলার গুঞ্জাহার।" এইরূপ বলিয়া এবং সঙ্কেত-কুঞ্জের কথা নিবেদন করিয়া তুলসী সেই মালা ললিতার হস্তে অর্পণ করিলেন, আর ললিতা তাহা রাই-কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধযুক্ত মালার

পরশে শ্রীরাধার অঙ্গে কম্পপুলকাদি দেখা দিল। কন্দর্পপীড়ায় কাতরা হইয়া তিনি প্রাণপ্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার জন্য অধীরা হইয়া উঠিলেন এবং লালসাময় ভাবাবেশে সূর্য্যমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া—"সূর্য্যেরে প্রণাম করি বাহির হৈলা। সঙ্গের সঙ্গিনী প্রতি কহিতে লাগিলা॥ তোমরা মণ্ডপে থাক, সামগ্রী আগুলি। আমরা পূজার লাগি বনে পুষ্প তুলি॥ এত বলি সখী সঙ্গে রাধাকুণ্ডে আইলা। নানা ভাবরসে ভোর কৃষ্ণেরে মিলিলা॥" দূর হইতে প্রিয়তমার চন্দ্রবদনে মিলনানন্দের অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শন করিয়া শ্যামসুন্দরের মনপ্রাণ প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া গেল।

(৪) **মধ্যাহ্ন লীলা**—(দিবা ঘ ১০৷৪৮ হইতে ঘ ৩৷৩৬ পর্য্যন্ত)—যদুনন্দন ঠাকুরকৃত **লীলা সূত্র**ঃ—

"বংশীসঙ্গতি ফাগুখেলা, তারপর দোললীলা, তবে মধুপান লীলাগণ।
তবে হয় রতিলীলা, তার পাছে জলখেলা, অঙ্গবেশ ভোজন শয়ন।
শুকপাঠ, পাশা খেলা, সূর্য্যপূজা আদি লীলা, আনন্দসাগরে নিমগন॥"

রাধাকুণ্ডতীরে নিকুঞ্জকুটীরে যুগলকিশোর মিলিত হইয়াছেন। "দুহুঁ দরশনে দোঁহার আনন্দিত মন। দরিদ্র পাইল যেন অমূল্য রতন॥" প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া দোঁহে দোঁহার অপরূপ রূপসুধা পান করিতেছেন। কন্দর্প-শরে উভয়ের হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। "দুহুঁ দোঁহা দরশনে, নানা ভাব বিভূষণে, ভূষিতা হৈলা শ্যাম-গোরী॥" দোঁহার বামা-হর্ষ-চপলতা, সুমধুর অঙ্গভঙ্গী ও মনোহর ভ্রূ-নেত্রচালনাদি দেখিয়া এবং দোঁহার নানা নর্ম্মসুখকথা শুনিয়া কুন্দলতা ও সখীগণ দোঁহার বাক্চাতুরীর রস বিস্তার করিতে লাগিলেন। তৎপরে, সকলে মিলিয়া বনবিহারে ও কুসুমচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। "তোড়ইতে কুসুম চলল যব রাই। নাগর বাহু পসারল যাই॥ সুবদনি গরবিনী হিয়ে অভিলাষ। ঝুটহি কান্দল তাহে মৃদু হাস॥" অতঃপর যুগলকিশোর চুম্বন, কুচমর্দ্দন

প্রভৃতি লীলারসে বিভোর হইলেন। এইরূপে নানা রস-কৌতুক চলিতে লাগিল।

ক্ষণপরে,—"রসিক নাগর, গুণের সাগর, কুসুমচয়ন ক'রে। হাসিয়া হাসিয়া আইল লইয়া, রাইয়েরে দিবার তরে॥ ভুজযুগ তুলি, রাই সুবদনী, তোলয়ে লবঙ্গ ফুল। রসিকশেখর, হইলা বিভোর, দেখিয়া ভুজের মূল॥ ফুল ঝাঁপা লইয়া, যতন করিয়া, রাইক নিকটে আসি। ধনীর আঁচলে, দিলেন বিভোলে, ফুলের সহিত বাঁশী॥" এইরূপে শ্যামের মুরলী পাইয়া রসবতী রাই তাহা গোপনে বিশাখার নিকটে রাখিয়া দিলেন। তখন—"সখীগণ মেলি, লইয়া মুরলী, চলিলা নিভৃত ঘরে। নাগর শেখর, পড়ল ফাঁপর, মুরলী নাহিক করে॥" মুরলী না দেখিয়া রতি-লম্পট নাগরবর মুরলী-অন্বেষণের ছলে, প্রেমকটাক্ষ, বাহু-প্রসারণ, দৃঢ়ালিঙ্গন, নীবী ও কঞ্চুলিকা উন্মোচন, পয়োধরাদিতে হস্তার্পণ—ইত্যাদি নানাপ্রকারে গোপীগণের বিলাস-বাসনা উদ্দীপন পূর্ব্বক হাস্যকৌতুকাদি করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সকলে বসন্তসুখদ বনে গমন করিলেন। তথায় **হোলিলীলা** বা ফাগু খেলা আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে আছেন সুবল-মধুমঙ্গল এবং রাধারাণীর পক্ষে আছেন ললিতাদি সখীগণ। চুয়া, চন্দন, ফাগু, কুঙ্কুম ও বহুবিধ গন্ধচূর্ণাদি লইয়া সকলে মাতিয়া উঠিয়াছেন। মণিময় পিচকারী নিঃসৃত সুগন্ধি জলে সকলের অঙ্গ সিঞ্চিত হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রজসুন্দরীগণের পরিহিত সূক্ষ্মবসন জলসিক্ত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ব্যক্ত করিতে থাকিলে, সেই অঙ্গ মধুরিমামৃত-সমুদ্রে রসিক নাগরের নয়ন-মন ডুবিয়া গেল। নাগরবর তখন শ্রীরাধার মদনবাণে উন্মত্ত হইয়া রসবতী রাই-ধনীর স্তনাধর গ্রহণপূর্ব্বক আপন মনোবাসনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। সহচরীগণ সেই সময়ে—"অনঙ্গ-রঙ্গিম গাওত গীত। বায়ত উম্ফ কানু মনোনীত॥"

অতঃপর হিন্দোলা বা **ঝুলন-লীলা**। বৃন্দাদেবী পূর্ব্ব হইতেই রতন-হিন্দোলা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। নাগরবর প্রিয়তমাকে বামে লইয়া এবং অঙ্গে অঙ্গে হেলাহেলি করিয়া সুসজ্জিত হিন্দোলা-উপরি উপবেশন করিলেন। যুগলকিশোরের কোটিচন্দ্র-বিনিন্দিত রূপ-মাধুরী দশ দিক আলোকিত করিয়াছে। সখীগণ নিম্নে দাঁড়াইয়া হাস্যোৎফুল্ল বদনে নৃত্য গীত আরম্ভ করিলেন, কেহ বা হিন্দোলায় দোল দিতে লাগিলেন। তখন—"ঝুলনা ঝনকে, রাধিকা চমকে, তা দেখি নাগর ডরে। হাসিয়া হাসিয়া বাহু পসারিয়া, ধনীরে করল কোরে॥" সখীগণের আনন্দ আর ধরে না—তাদৃশ মিলন-কৌতুক দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা সমান বেগে দোল দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে রস রঙ্গ করিয়া যুগলকিশোর হিন্দোলা হইতে অবতরণ করিলেন।

তবে হয় **মধুপান ও রতিক্রীড়া**। রসিকশেখর মধু-পান-পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রিয়তমার বদনপ্রান্তে ধরিলেন। রসবতী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া পানপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং বসনে বদন ঢাকিয়া মধুর শুধু আঘ্রাণ মাত্র লইয়া, হাসিতে হাসিতে পানপাত্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। রসবতী যথার্থই পান করিয়াছেন—এইরূপ মনে করিয়া রসরাজ পরমানন্দে মধুপান করিলেন এবং পাত্রটী প্রিয়তমার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহাকে আবার পান করিতে বলিলেন। শ্রীরাধাও তখন বস্ত্রাঞ্চলে বদন ঢাকিয়া কৃষ্ণাধর-সংযোগে সুবাসিত মধুপান করিলেন। অতঃপর সখীগণ একে একে সকলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অধর-সুরভিত মধুপান করিয়া হর্ষোন্মত্ত হইলেন। এইরূপে মহাকুতূহলে মধুপান করিয়া অলসভ্রান্তনেত্রে ও কম্পিস্বরে সকলে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। পানাতিশয্যে ভ্রান্তনয়না গোপসুন্দরীগণের কটিবন্ধন শিথিল, বেণীবন্ধন বিক্ষিপ্ত ও বক্ষবাস স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে—"মধুপানে মত্ত হৈলা রাধা নিতম্বিনী। মদন স্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি॥ সেবাপরা সখী তারা নানা সেবা করে।

দুহুঁকে লইয়া গেলা শয়নের ঘরে॥ কুসুম শয্যাতে দুহুঁ করিলা শয়ন। নিজ নিজ কুঞ্জে শুইলেন সখীগণ॥” নিভৃত নিকুঞ্জে রাই-কানু রতিলীলানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। রসিকশেখর নিজ ভুজবলের সাহায্যে রসবতীর সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শনাদি করিয়া তাঁহার মদন-মত্ততা উৎপাদন করিলেন এবং হস্ত-নখ-দন্ত-বক্ষ ও অধরাদি দ্বারা তাঁহার দেহপুরীর সমস্ত ধন লুটিয়া লইলেন। যথা-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল দেখিয়া রসবতী রাই প্রবল পরাক্রমে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন এবং প্রবল পৌরুষতা প্রকাশ করিয়া পুরুষোচিত লীলা আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার কর্ণের কুণ্ডল ও কণ্ঠের মুক্তামালা সহর্ষে নাচিতে লাগিল এবং কটিভূষণ দুন্দুভির ন্যায় বাজিতে লাগিল। শ্রমজলে উভয়ের তনুই সিক্ত হইল; ক্রমে উভয়ে রতি-রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। অতঃপর প্রিয়তমার বাসনানুসারে—“ক্ষণএকে জাগিয়া উঠল কান। সখিগণ কুঞ্জহি করল পয়ান॥ সব সখীগণ সঙ্গে রতিরণ কেল। ইহ অপরূপ কোই বুঝই না ভেল॥ আওল কানু পুন রাইক পাশ। মাধব হেরইতে অধিক উল্লাস॥”

অতঃপর সকলে গ্রীষ্ম-হর্ষ-বন প্রদেশে গমন করিয়া **জলকেলি** আরম্ভ করিলেন। “দুহু দুহু মেলি, করু জলকেলি। কেহো দেই নীরে, কেহো লই চিরে। কেহো কেহো হারি, কেহো দেই গারি।” গোপ সুন্দরীগণ সকলেই জল-বিহার-রসে অভিজ্ঞা। তাঁহারা অক্লান্তে হস্ত ধারণ করিয়া এবং রসিকনাগরকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জল-সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। রসরাজও বলিষ্ঠ হস্তদ্বয় দ্বারা দীর্ঘধারে জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্রজসুন্দরীগণ জলযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া—“কানু করে বেঢ়ি, ধয়ল কিশোরী। সলিল অগাধা, লেই চলু রাধা। কানুক অঙ্কে, ভাসত শঙ্কে। পাওল তীরে, বেকত শরীরে। নিরখিয়ে কান, হানে পাঁচ বাণ। ধনী

করি বুকে, চুম্ব দেই মুখে। ধনী কুচ জোর, হাসি দেই মোড়। হরি পুরি সাধা, আনন্দ রাধা। রাখলি তীরে, অলপহি নীরে।" অতঃপর শ্রীরাধার ইঙ্গিতে শৃঙ্গার-রসরাজ সখীগণের সহিত নানা প্রকারে রস-রঙ্গ করিতে লাগিলেন। অতঃপর—"আর্দ্র বস্ত্র ছাড়ি, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান। **ভোজন** মন্দিরে দুহুঁ করল পয়ান ॥ ভোজন সমাপি দোঁহার **নিভৃতে শয়ন**। শ্রীরূপমঞ্জরী করে পাদ সম্বাহন ॥" রূপমঞ্জরীপ্রমুখ সেবা-প্রাণা মঞ্জরীগণের সমক্ষে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি ও নিভৃত শয়নাদি রহস্য-লীলায় সঙ্কোচ নাই।

যুগলকিশোর কুসুম-শয্যায় সুখে শায়িত আছেন, এমন সময়ে **শুকপাঠ** আরম্ভ হইল। বৃন্দাদেবীর শিক্ষানুসারে শুক ও শারিকা মানুষের ভাষায় যুগলকিশোরের রূপগুণাদি বর্ণনা করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে—"লাগিল শুক শারীর প্রেম কলহ।" তখন—"শুক বলে—আমার কৃষ্ণ মদনমোহন। শারী বলে—আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নৈলে শুধুই মদন ॥ শুক বলে—আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা। শারী বলে—আমার রাধার নামটী তাতে লেখা, ঐ যে যাচ্ছে দেখা ॥ শুক বলে—আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে। শারী বলে—আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে, চূড়া তাইতে হেলে ॥" এইরূপে তাহাদের প্রেম-কলহ চলিতেছে, সেই সময়ে—"শুক বলে—শারি! আর কেন দ্বন্দ্ব। রাধা কৃষ্ণ দুজনার কেহ নহে মন্দ, (ওরা) দুজনাই যে ভাল ॥" এইরূপে দ্বন্দ্বের উপসংহার হইল।

যুগলকিশোর সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। এইবার রসিকনাগরের পাশা খেলিবার ইচ্ছা হইল। বংশী ও বেশর পণ রাখিয়া যুগলকিশোর **পাশাখেলায়** বসিলেন। মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে এবং ললিতা শ্রীরাধিকাকে খেলায় সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রথমে শ্রীরাধার জয় হইল। বেগতিক দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাধের বাঁশিটী নিজ বস্ত্রে

লুকাইয়া রাখিলেন। বংশীর উপরেই সখীগণের বরাবর লক্ষ্য। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া—"রাই জিনি, বংশী ছিনি, লইল তখন। করতালি দিয়া বলে কি হবে এখন॥" বংশী হারাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ছলছল নেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। আবার খেলা আরম্ভ হইল। "পুনঃ কৃষ্ণ চালে পাশা, অতি ব্যগ্র হৈয়া। বংশী বেশর নিল, মুখ চুম্বন করিয়া॥" অতঃপর "সুবল বিশাখা দোঁহে মধ্যস্থ হৈয়া। বংশী বেশর দেওয়াইল বিচার করিয়া॥" এই সময়ে "কীরক মুখে শুনি জরতি আগমন"—সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলে খেলা ভঙ্গ হইল। তখন কুন্দলতা রাইকে লইয়া সত্বর **সূর্য্যমন্দিরে গমন** করিলেন। তাঁহারা মন্দিরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে—"দিনমণি প্রণমিতে আইলা জটিলা।" জটিলা আসিয়া—"কুন্দলতা দেখি কথা কহে, ব্যাজ কেনে? কুন্দলতা কহে, বিপ্র না পাই এখানে॥ জটিলা কহয়ে—কেনে, কোথা গেল বটু? কুন্দলতা কহে—তোমার কথায় ভেল কটু॥ আর এক বিপ্র আছে, গর্গমুনির শিষ্য। জটিলা কহয়ে—তবে আনহ অবশ্য॥" জটিলা এই কথা বলিলে—"তবে কুন্দলতা যাই, তাহারে আনিল। রসের সাগর কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হৈল॥" শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মচারীবেশে আসিয়াছেন। জটিলা তাঁহার সৌম্য-মূর্ত্তি ও রূপ-লাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি দয়া করিয়া আমার বধূকে মিত্রপূজা করাও।" বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোক দর্শন করে না। তোমার অনুরোধে আমি তোমার বধূকে মিত্রপূজা করাইব। উনি বস্ত্র দ্বারা স্বীয় গাত্র আবরণ করুন।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী পূজা করিতে বসিলেন। পূজা শেষ করিয়া তিনি বাহিরে আসিলে, ভাগ্যগণনার জন্য জটিলা তাঁহাকে বধূর হস্ত দেখিতে অনুরোধ করিলেন।—"এত শুনি বিষ্ণু স্মরি বলে ব্রহ্মচারী। কুশাগ্রেতে স্ত্রীস্পর্শ আমি নাহি করি॥ কিন্তু এঁহো পতিব্রতা মিত্র পূজায় রতা। হস্ত পদ দেখে কহি শাস্ত্রমত কথা॥" ব্রহ্মচারী বেশে রসিকনাগর বলিতে লাগিলেন

—"এই বধূর হস্তে অপূর্ব্ব মাঙ্গলিক চিহ্নাদি দেখিতেছি। ইহাঁর স্বামীর সৌভাগ্যের ও পরমায়ুর উপর গ্রহের কুদৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু এই মঙ্গলময়ী বধূর সতীত্বের প্রভাবে গ্রহাদি কোন বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না।" ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া জটিলা আনন্দিত মনে তাঁহাকে বলিলেন —"প্রতিদিন সূর্য্যপূজা করাইবা আসি। রাধিকারে জানিবা আপন নিজ দাসী॥" অতঃপর জটিলা বধূকে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। ইত্যবসরে মধুমঙ্গল নৈবেদ্য বাঁধিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোচারণ-স্থানে গমন করিলেন।

(৫) **অপরাহ্নলীলা** বা উত্তর গোষ্ঠ (দিবা ঘ ৩।৩৬ হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যান্ত)—সূর্য্যপূজার নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া বটু শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নৈবেদ্য দেখিয়া সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া সূর্য্য-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীবলরামের আনন্দের আর সীমা নাই। অপরাহ্নে গৃহে ফিরিবার কালে, শ্রীকৃষ্ণ—"মুরলীতে ধেনুগণ ডাকিতে লাগিলা।" মোহন বেণুধ্বনি শ্রবণে—"তৃণমুখে গাভীগণ নিকটে আইলা।" গোধন সকল একত্রিত করিয়া ধেনুসহ সকলে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীবলদেব এবং শ্রীদামাদি রাধা-কৃষ্ণ-মিলনের অনুকূল কতিপয় সখা আগে আগে চলিয়াছেন।

এদিকে রসবতী রাই যাবটে ফিরিয়া আসিয়া—"সুরস পক্কান্ন, করল রচন, পূরল সোণার থালা।" প্রাণবল্লভের জন্য নানা উপহার প্রস্তুত হইলে, প্রেমময়ী শ্রীরাধা সেগুলি—"ঢাকিয়া বসনে, রাখিয়া গোপনে, সিনান করিতে যায়। দাসীগণ সঙ্গে, নানা রস রঙ্গে, সিনান করল তায়॥" অতঃপর সখীগণ তাঁহাকে বেশের মন্দিরে লইয়া গেলেন। —"বেশের মন্দিরে, বসিল সত্বরে, করিলা মোহন বেশ। উঠিয়া অট্টালী, চৌদিকে নেহারি, দিবস হইলা শেষ॥" স্নান ও বেশভূষাদি করিয়া প্রিয়দরশন-আশে শ্রীরাধা সখীগণসহ অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিলেন এবং

আকুল নেত্রে প্রিয়তমের পথপানে চাহিয়া থাকিলেন। ক্রমে গোধূলি-রাশি নয়নগোচর হইল এবং কোলাহলের সহিত বেণুধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সকলে দেখিলেন—"শিশু পশু সঙ্গত, করি হরি আওত, গোখুর ধূলি উছলাই।" দূর হইতে নাগরবরকে ধেনুগণসহ আসিতে দেখিয়া রাই ধনীর—"বিরস বদন, সরস ভেল। হিয়ার আগুনি, তখনি গেল॥" ক্রমে চারি চক্ষের মিলন হইল। হরষিত মনে দোঁহে দোঁহার রূপ সুধা পান করিতে লাগিলেন।—"তবে কৃষ্ণ নন্দীশ্বরে করিলা গমন। কৃষ্ণ দেখি ব্রজবাসী আনন্দিত মন॥" স্নেহময়ী জননী নন্দরাণী সারাদিন নন্দদুলালকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে—"কৃষ্ণ-বলরামে হেরি আনন্দ অন্তর। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন উপর॥ মঙ্গল আরতি করি নিছনি লৈল। রাম-কৃষ্ণে রত্ন-সিংহাসনে বসাইল॥"

(৬) **সায়াহ্নলীলা**—(সন্ধ্যা ৬।০ হইতে রাত্রি ৮।২৪ পর্য্যন্ত)—সখীগণ সহ শ্রীরাধা অট্টালিকার উপর হইতে নীচে আসিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন ললিতাসখী শ্রীরাধার তৈয়ারী যতেক পক্কান্ন, পান-মালাদি উপহার আনিয়া তুলসীর হাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।—"তুলসীর হাতে দিয়া ললিতা পাঠাইলা। ধনিষ্ঠার হাতে দিহ, তাহারে কহিলা॥ সঙ্কেত করিয়া তুমি আসিহ সকালে। তবে সখী সঙ্গে মোরা যাব কুতূহলে॥" ললিতার এই কথা শুনিয়া—"তুলসী উলসি হৈয়া, যায় উপহার লৈয়া, ত্বরিতে মিলিল রাজঘরে। গোপতে লইয়া থালা, ধনিষ্ঠারে দিয়া বালা, কহিল রাইয়ের সমাচারে॥" তুলসী নন্দভবনে আসিয়া ভোজ্যদ্রব্যাদি ধনিষ্ঠার হাতে দিলেন।

এদিকে—"কৃষ্ণ গৃহে স্নান করি, বসনভূষণ পরি, উপহার করিলা ভোজন।" নন্দনন্দন আহারে বসিয়াছেন, স্নেহময়ী জননী কত যত্ন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন। নন্দরাণী বলিলেন—"জননী বিনয়, শুনহ তনয়, আর না বলিব কি। তোমার কারণ, এসব পক্কান্ন

পাঠায় রাজার ঝি। অরুচি তেজিয়া, ভোজন করিয়া, ঘুচাও সবার দুখ। তোমার ভোজন, শুনিয়া তখন, রাধিকা পাওব সুখ॥” পরমসুখে ভোজন শেষ করিয়া যশোদানন্দন তাম্বুল সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে— “কানুর বদন, নেহারে সঘন, ধনিষ্ঠা চতুরী বালা। ইঙ্গিত বুঝিয়া, চতুর নাগর, দেওল চম্পকমালা॥ সঙ্কেত করিয়া, ধনিষ্ঠা আসিয়া, দেওল তুলসী করে। অবশেষ লৈয়া, থালিতে ভরিয়া, দেওল রাইয়ের তরে॥ সে সব লইয়া, তুলসী চলিয়া, তুরিতে আওল ঘরে। থালামালা তথি, তুলসী যুবতী, সোঁপল রাধার করে॥” মালা দেখিয়া রসবতী সঙ্কেত-কাহিনী বুঝিলেন এবং তুলসী-আনীত শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ সখীগণসহ সানন্দে ভোজন করিলেন। এদিকে—“জলপান করি কান্, মুখে দিয়া গুয়াপান, খড়িকে চলিলা গোদোহনে।” জলপানান্তে শ্রীকৃষ্ণ গোদোহন করিবার জন্য ধেনুশালামাঝে আসিলেন।

(৭) **প্রদোষলীলা**—(রাত্রি ঘ ৮।২৪ হইতে ঘ ১০।৪৮ পর্যন্ত)—সখাগণ সহ গোদোহনান্তে সকৌতুক খেলা করিয়া—“তবে কৃষ্ণ সখাসনে আনন্দিত মনে। রাজসভা প্রতি গেলা বলরাম সনে॥ কৃষ্ণ-বলরামে নন্দ কোলেতে করিল। গুণিজন নৃত্যগীত করিতে লাগিল॥ নানা যন্ত্র তালবাদ্য শুনিতে মধুর। ভট্ট লোক ছন্দ পড়ে অমৃতের পূর॥ সেই সুখে নন্দরায় আনন্দে ডুবিলা। হেনকালে নন্দরাণী লোক পাঠাইলা॥” আহার করিতে আসিবার জন্য মা-যশোদা লোক পাঠাইয়াছেন। তখন সকলে গৃহে আসিয়া ভোজনে বসিলেন। নন্দ-মহারাজের সম্মুখে সখাগণের এখন আর পূর্বের ন্যায় হাসাহাসির আড়ম্বর নাই। ভোজনাদি শেষ হইলে—“নন্দের নন্দন কান, মুখে দিয়া গুয়াপান, বসিলা সুখদ শেজপরি। আলসে ঢালয়ে গা, সেবকে সেবয়ে পা, নিদ্রায় নয়ান গেল ভরি॥” ব্রজেন্দ্রনন্দনকে নিদ্রিত দেখিয়া সেবাপরায়ণ ভৃত্যগণ আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপনে সঙ্কেত-কুঞ্জে গমন

করিলেন।—"দশদণ্ড রাত্রি শেষে রসিক-শেখর। করিলে আগমন কুঞ্জের ভিতর॥ প্রেমেতে আকুলচিত্ত উৎকণ্ঠিত হঞা। রাই-আগমন-পথ রহিলা চাহিয়া॥"

ও দিকে—"জটিলা কহয়ে বধূর ঠাঞি। ত্বরিতে ভোজন করহ মাই।"—এই কথা বলিয়া জটিলা বধূর হাত ধরিলেন এবং সাদরে তাঁহাকে রন্ধন-ভবনে লইয়া গেলেন। রন্ধনভবনে যাইয়া—"জটিলা কহয়ে বৈসহ ঝি। আমি তোরে সব আনিয়া দি॥" শাশুড়ীর কথা শুনিয়া—"মিনতি করিয়া কহয়ে রাই। আপনি শয়ন করহ মাই॥ আপনার ঘরে যাইয়ে লইয়া। করিব ভোজন সোয়াথ পাইয়া॥ শুনিয়া জটিলা পাইল সুখ। হাসিয়া চুম্বিল বধূর মুখ॥ জটিলা যাইয়া শয়ন করে। রাধিকা আইলা আপন ঘরে॥" সখীগণের সহিত আপন গৃহে যাইয়া শ্রীমতী আহারে বসিলেন এবং প্রাণবল্লভের শেষান্ন পরমসুখে গ্রহণ করিলেন। তখন—"কানু-অবশেষ পরশ পাই। অমিয়া-সাগরে সাঁতারে রাই॥ পুলকে পূরল রাইক তনু। পিয়া-রস-মধু পায়ল জনু॥" ভোজনাবসানে শ্রীমতী কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য সুখদ পালঙ্কোপরি শয়ন করিলেন। অতঃপর শ্রীমতীর **অভিসার আয়োজন**। সখীগণ তাঁহাকে মদনমোহন-মন-মোহন বেশে সুসজ্জিতা করিলেন। অভিসারোচিত বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া এবং অনঙ্গ রঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া—"সঙ্গোপনে সখী সঙ্গে চলিলা সুন্দরী। বৃন্দাবনে কুঞ্জ মাঝে যাঁহা গিরিধারী॥ নানামত মিষ্টান্ন, চন্দন, বনমালা। সুবাসিত বারি নিল সুবর্ণ পিঞ্জরা॥ কনক সম্পুট তাম্বূল যতেক হয়। কৃষ্ণ-অভিসারে রাই করিলা বিজয়॥" সুবদনী বিনোদিনী প্রাণপ্রিয়তমের সহিত নিভৃত নিকুঞ্জে মিলিত হইয়াছেন। "দোঁহারূপ হেরি দোঁহে আনন্দিত মন। দোঁহা মুখ হেরি দোঁহে কৈল আলিঙ্গন। দরিদ্রে পাইল যেন ঘট ভরি ধন। কৃষ্ণ কোলে আইলা রাই, হইল মিলন।"

(৮) **নিশা লীলা** (রাত্রি ঘ ১০।৪৮ হইতে রাত্রি ঘ ৩।৩৬ পর্য্যন্ত) —পরস্পর মিলনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত প্রেমিকযুগল নিভৃতে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি নাই—"দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে, অবধি নাহিক সুখে, পুলকে পূরল দুহুঁ তনু। চৌদিকে সখীর ঠাট, যৈছন চাঁদের হাট, তার মাঝে শোভে রাধা-কানু॥" অবাধে যুগল কিশোরের রসকেলি চলিতে লাগিল, আর সখীগণ নানাভাবে রসরঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিলেন।—"তবে রত্নবেদীরোপর বসিলা দুইজন। করিতে লাগিলা বৃন্দা বিবিধ সেবন॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে। হাস পরিহাস করে প্রেমের তরঙ্গে॥ তবে **বনবিহার** করিলা কতক্ষণে। **পুষ্পবরিষণ** কৈলা সব সখীগণে॥ রাই'র দক্ষিণ কর ধরি বনমালী। কুঞ্জে কুঞ্জে উদ্যানে করয়ে রসকেলি।" অতঃপর **নৃত্যলীলা** আরম্ভ হইল, যুগলকিশোর মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্যকালে—"দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি, দুহুঁ দোঁহা মুখ হেরি, দুহুঁ রসে দুহুঁ ভেল ভোর।" এইরূপে—"কতেক প্রকারে নৃত্য করি দুইজন। বসিয়া দেখেন সুখে, নাচে সখীগণ॥" আনন্দে বিভোর হইয়া সখীগণ নৃত্য করিতে করিতে নানা রসরঙ্গ আরম্ভ করিলেন।—"সখীগণ মেলি, করত কত রঙ্গ। কত রস গাওত, নয়নক ভঙ্গ॥ কোই কোই নাচত, কোই ধরু তাল। কোই বাজায়ত, যন্ত্র রসাল॥" কিছুক্ষণ পরে রসরাজ নাগরবর রসবতী শ্রীমতীকে বলিলেন—"চাঁদবদনি নাচত দেখি। না হবে ভূষণের ধ্বনি, না নড়িবে চীর। দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর॥ বিষম সঙ্কটতালে বাজাইব বাঁশী। ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ, বুঝিব প্রেয়সী॥ হারিলে কাড়িয়া লব বেশর কাঁচলী। জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥" রসরাজ ভূমিতে ধনুচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং তাহার উপরে রসবতী রসভরে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। "যেমন বলে শ্যামনাগর, তেমনি নাচে রাই। মুরলী লুকায় শ্যাম, চারিদিকে চাই॥" শ্যাম-

নটবরের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সখীগণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এইবার, "শ্যাম ! তোমাকে নাচতে হবে। না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড, নূপুরের কড়াই। না নড়িবে বনমালা, বুঝিব বড়াই॥ না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি, শ্রবণের কুণ্ডল। না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল॥ উদ্ঘট তালে যদি তুমি হার বনমালি। চূড়া বাঁশী কেড়ে লব, দিব করতালি। আর তুমি—"যদি জিন, রাই দিব, আমরা হব দাসী॥"

নৃত্য-লীলার পর রসিকচূড়ামণি কমলমুখীকে বামে লইয়া মণিময় শিলার উপরে উপবেশন করিলেন।—"প্রেমভরে দুইজন বসিলা আসনে। নানা সেবা করিতে লাগিল সখীগণে॥ চামর ঢুলায় কেহ তাম্বুল যোগায়। দুহুঁ রূপ নিরখিয়া কেহ কেহ গায়॥" অতঃপর—"রতন মন্দির মাহা দুহুঁ জন গেল। বহু উপহার ফল ভোজন কেল॥ নানারস পরিপাটী তাম্বুল ভক্ষণ। ছল করি বাহিরে আইলা সখীগণ॥" যুগলকিশোরের রসবিলাসের জন্য বৃন্দাদেবী পূর্ব্ব হইতেই মন্দির মধ্যে মনোহর কুসুম-শয্যা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৃন্দা রচিত, "সুখদ শেজ পর, নাগরি নাগর, বৈঠলি নব রতি সাধে। প্রতি অঙ্গ চুম্বনে, রস অনুমোদনে, থর থরি কাঁপয়ে রাধে॥" সখীগণ বাহিরে থাকিয়া গবাক্ষ পথে রতিরণ-লীলা দেখিতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন—"পুন হরি নাগরী, চুম্বই বেরি বেরি, অধর সুধা করুপান। মদন মহোদধি, উছলি উছলি পড়ু, ডুবল নাগর কান। উচ কুচ কলস, পরশ করি নাগর, ভাসই যৌবন বানে। নবরতি সুখে, দুখ জনু ভাবই, নাহ মিনতি নাহি মানে॥ সুরত সময় রসে, কামুমন মাতল, কমলিনী কাতর বালা। সব অঙ্গ শিথিল, স্বেদ জলে তীতল, মরদিত চম্পক মালা॥" তখন—"ধনী হেরি নাগর, পড়-লহি ফাঁপর, ছোড়ল কেলি বিলাস।" এইরূপ সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের পর শীতল পবনে শ্রীমতীর শ্রমঘর্ম্ম বিদূরিত হইলে সুচতুর নাগরবর বুঝিতে পারিলেন—"রাইক ইহ সব কপট তরাস।" তখন রসিক নাগর মৃদুমন্দ

হাস্য করিয়া—"পুন পুন চুম্বই রাই-বয়ান। দুহুঁ জন মরমে হানল পাঁচ বাণ॥ ফিরি ফিরি এই মত করেন বিলাস। দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভোর পরম উল্লাস॥"

অতঃপর শ্রীমতীর ইঙ্গিতে শ্যামনাগর একে একে প্রত্যেক সখীর নিকটে গমন করিলেন। "সব সখীগণ ঠামে কয়ল পয়াণ। সভাসনে রতিরণ করু তব কান্॥" সব সমাধা করিয়া নাগরবর ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া শ্রীমতী পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। আবার যুগলকিশোরের কেলিবিলাস আরম্ভ হইল—"দুহুঁ মেলি, কেলি বিলাস করু। দুহুঁ অধরামৃত, দুহুঁ মুখ ভরু॥ দুহুঁ তনু পুলকিত, দুহুঁ মন ভোর। বিনোদিনী রাধা, বিনোদিয়া কোর॥ দুহুঁ কেলি পণ্ডিত, রূপে গুণে সম। বিলাস বিক্রম রসে, কেহো নহে কম॥ অখণ্ড বিলাস রস, কিছু নহে বাদ। দুহুঁ মেলি পূরল, আজনম সাধ॥" বিপরীত বিলাসাদি রতি রণে পরিশ্রান্ত হইয়া—"অলসে অবশ ভেল রসবতী রাই। মদন-মদালসে শুতলি যাই॥ কান্ত শয়ন করু কামিনী কোর। চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর॥ দুহুঁ শিরে দুহুঁ ভুজ, বয়ানে বয়ান। উরু উরু লপটল নয়ানে নয়ান॥ ঘুমি রহল তহিঁ কিশোরী কিশোর। কেশ প্রবেশ নাহি, তনু তনু জোর॥" যুগলকিশোরের যখন এইরূপ অবস্থা তখন—"সখিগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান। নিভৃত নিকেতনে কয়ল শয়ান॥" অতঃপর সকলেই নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

দ্রষ্টব্য—

যুগলকিশোরের **দানলীলাপ্রসঙ্গে** কথিত আছে, একদা গোবর্দ্ধনগিরির নিকটে শাণ্ডিল্যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। জটিলা শুনিলেন—"যে গোপ যুবতী, ঘৃত দিবে তথি, ইহার পাবে দান।" শাশুড়ীর আদেশে শ্রীমতী সখীগণসহ যজ্ঞের ঘৃত লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, শ্যামনাগর সুবলাদি সখাগণসহ

পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সেই সময়ে শ্রীমতীর দেহে কিল-কিঞ্চিত ভাবের উদয় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য এবং পসারী, বাজিকর, বণিকিনী, নাপিতানী, বাদিয়া প্রভৃতি বেশে শ্রীরাধার সহিত তাঁহার মিলন পদকর্ত্তাগণ নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে নৌকা-বিলাস সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

নৌকাবিলাস—একদিন শ্রীমতী দধি ঘৃত পসরা লইয়া বর্ষাকালীন বনশোভা দর্শন করিতে করিতে যমুনা তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন মাতামহী মুখরা ও অন্তরঙ্গা সখীগণ। অকস্মাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘাটে একখানিও নৌকা নাই। সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শ্যামনাগর একখানি তরণী লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে বাধ্য হইয়া শ্যাম-নাবিকের নৌকায় আরোহণ করিলেন, নৌকাও চলিতে আরম্ভ করিল। "মুচকি হাসিয়া শ্যামা যার পানে চায়। নাচিয়া যৌবন দিতে সেইজন ধায়॥" ক্ষণপরেই প্রবল ঝটিকা ও মেঘগর্জ্জনের সহিত বিদ্যুৎ দেখা দিল। "তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে। হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে॥" সকলে ভীতা হইয়া নৌকা তীরে লাগাইতে বলিলেন। তখন কপট-শিরোমণি শ্রীমতীকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"আমি অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বিদ্যুদ্বরণী ঐ রমণীশিরোমণি আমার নিকটে আসিয়া বলিলে, উঁহার অঙ্গচ্ছটায় পথ দেখিয়া আমি নৌকা তীরে লাগাইতে পারি।" অগত্যা শ্রীমতীকে শ্যামের পাশে গিয়া বসিতে হইল। শ্যাম-নাগর তাঁহার সহিত নানা রসরঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এদিকে, প্রবলবেগে তুফান ছুটিতেছে, রণরঙ্গিণীর ন্যায় যমুনা নৃত্য করিতেছে, নৌকাও ভীষণ টলিতেছে। শ্রীমতীর মনে আর স্বস্তি নাই। ভীতা হইয়া তিনি বলিতেছেন—"হাম নিরস, তুহুঁ হাসি উতরোল। কেহ ছিউ ভেজই, কেহ হরিবোল॥"

শ্রীমতীর কথা শুনিয়া প্রেমিকবর বলিলেন—"না বোল, কুবোল ধনি, রমণীর শিরোমণি, তুয়া প্রেমে কিনা করি আমি।" নাবিকবর বলিতে লাগিলেন—"যোগী ভোগী নাপিতানী, তোমার লাগিয়া দানী, ওঝা হইলাম তোমার কারণে। তুয়া অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে, তুয়া লাগি করিলুঁ দোকানে॥ রাখাল হৈয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু সনে, তুয়া লাগি বনে বনচারী। তুহার পীরিতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া, তুয়া লাগি হইলুঁ কাণ্ডারী॥" সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোগ যেন অদ্ভুত যাদুবলে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রীমতী একটু সুস্থা হইলে প্রেমিক শিরোমণি আবার বলিতে লাগিলেন—"তুমি প্রীতি মূর্ত্তিমতী, তোমার প্রসাদে সতি, ধরি নাম—মদনমোহন। প্রেমগুরু কল্পতরু, এ সংসার মহামরু, তব প্রেম নন্দন-কানন॥" শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম মহিমার তুলনা নাই। অতীন্দ্রিয় তাঁহাদের এই প্রেম প্রাকৃত মনবুদ্ধির অতীত। বহু জন্মের বহু সাধনার ফলে ইহা উপলব্ধিযোগ্য হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দিব্যোন্মাদ ও গম্ভীরালীলা।

১। শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ—

নিত্য নবনবায়মান শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগ হইতে এই দিব্যোন্মাদের উৎপত্তি। অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আধার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ জন্মিলে, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞানে নিত্য নূতন বলিয়া বোধ হয়। তখন নিজের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, লজ্জা, ভয়—সমস্তই বিসর্জন দিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার প্রীতিবিধান করিবার জন্য একটা তীব্র

আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তখন পরম দুঃখকেও পরম সুখ বলিয়া বোধ হয়। এই অনুরাগ অনুক্ষণ বাড়িতে বাড়িতে যাবদাশ্রয়-বৃত্তিত্ব (চরম উৎকর্ষাবস্থা) ও স্বসংবেদ্য দশা (নিজের প্রভাবেই নিজের অনুভবযোগ্য অবস্থা) লাভ করিয়া একার্থবাচক ভাব বা মহাভাবে পরিণত হয়। রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে ভাব বা মহাভাব দ্বিবিধ। ব্রজদেবীগণের ভাবকে অধিরূঢ় ভাব বা মহাভাব বলা হয়। অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষপ্রাপ্ত অধিরূঢ়ভাবরূপ মহাভাব রূঢ় ভাবেরই উচ্চতর স্ফুরণ। মোদন ও মাদন ভেদে অধিরূঢ় মহাভাব দুই প্রকার। হ্লাদিনী শক্তির পরমা বৃত্তিস্বরূপ এই **মোদন** শ্রীরাধিকার যূথ ভিন্ন অন্যত্র প্রকটিত হয় না। মোদন অপেক্ষা মাদন উৎকৃষ্ট। উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত এই **মাদন** একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই উদিত হইয়া থাকে। অন্য কোন গোপীতে, এমন কি স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণেও ইহার প্রকাশ নাই। সম্ভোগ কালেই এই মাদন রস উৎপন্ন হয়। এই মাদনে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন চুম্বনাদি সম্ভোগলীলার সর্ব্বপ্রকার সুখ অনুভূত হয় এবং কোটি কোটি সুখের এককালীন উদয় হইয়া থাকে। এই মাদন রস এমনই অদ্ভুত যে সম্ভোগ-সুখানুভবের মধ্যেই ইহাতে উৎকট বিরহের ও প্রবল উৎকণ্ঠার অনুভব হয়, তখন জীবন একান্ত দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়ে। তদবস্থায় সম্ভোগ-সুখের ও বিরহ-ব্যথার যুগপৎ আবির্ভাবে মাদন রস এক অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করিয়া থাকে। ঈর্ষার কারণ না থাকিলেও, এই মাদনে ঈর্ষারও উদয় হয়। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ তমাল-তরুর গাত্রে একটী মালতীলতাকে জড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধা বলিতেছেন—"সখি! এই কোমলা মালতী পূর্ব্ব জন্মে কতই না তপস্যা করিয়াছিল, যাহার জন্য সে এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-সুখ নিরন্তর উপভোগ করিতেছে। আহা! তাহার জীবনই ধন্য।" এই মাদনের গতিরোধ করিতে স্বয়ং মদনেরও শক্তি নাই।

সম্ভোগকালেই মাদন রস উৎপন্ন হয়। মাদনে বিরহ নাই, কিন্তু মোদনে বিরহ আছে। বিরহাবস্থায় মোদনের নাম **মোহন**। মোদনে সাত্ত্বিক ভাব সকল উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু মোহনে বিরহ বৈবশ্য-হেতু সাত্ত্বিকভাব সকল সুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এই মোহন একমাত্র বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাতেই প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া মোহনভাববতী শ্রীরাধিকা স্বীয় মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন —"আমার মৃত্যু হইলে আমার এই দেহের ক্ষিতি-অংশ যেন আমার প্রাণপ্রিয়তমের যাতায়াতের পথে গিয়া থাকে, ইহার জল-অংশ যেন তাঁহার কেলি-সরোবরে গিয়া মিশে, ইত্যাদি।" এইরূপে শ্রীরাধা মৃত্যু স্বীকারপূর্ব্বক নিজ দেহের ক্ষিত্যপ্ তেজাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এই মোহনাখ্য মহাভাব আবার যখন কোন অনির্ব্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমসদৃশ বিচিত্র দশা লাভ করে, তখন তাহাকে **দিব্যোন্মাদ** বলা হয়। বিরহাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হওয়া এবং আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞান করা এই দিব্যোন্মাদের কার্য্য। মোহনের অনুভাবরূপ এই দিব্যোন্মাদ একমাত্র শ্রীরাধিকার সম্পত্তি। দিব্যোন্মাদে সাত্ত্বিকভাব সকল সুদ্দীপ্ত হয় এবং প্রেমবৈবশ্য জনিত ভ্রমসদৃশ প্রচেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্যাদি প্রকাশ পায়। তখন যাহা প্রকৃত পক্ষে সম্মুখে আছে, তাহা নাই বলিয়া বোধ হয় এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা সম্মুখে নাই, তাহাই সম্মুখে আছে বলিয়া বোধ হয়। "উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প, মোহনের দুই ভেদ।" (চৈঃ চৈঃ ২।২৩।৩৯)। প্রেম-জনিত চিত্তবৃত্তির বিবশতার ফলে কায়িক-বিকাশরূপ **উদ্‌ঘূর্ণা**, বাচনিক বিকাশরূপ **চিত্রজল্প** প্রভৃতি বিবিধ প্রকার চেষ্টা দিব্যোন্মাদে প্রকটিত হইয়া থাকে। দিব্যোন্মাদগ্রস্ত শ্রীরাধা সম্বন্ধে কবি গাহিয়াছেন—"বিরহে ব্যাকুল ধনী কিছুই না জানে। আন-আন বরণ হইল দিনে দিনে। কম্পপুলক স্বেদ নয়নহি ধারা।

প্রণয়-জড়িমা বহু ভাব বিথারা॥ যোগিনি যৈছন ধ্যানি-আকার।
ডাকিলে সমতি না দেই দশবার॥ আধ আধ বচন কহিছে কার সনে।
পুনপুন পুছয়ে সবহুঁ তরুগণে॥ ত্রিভঙ্গ হৈয়া ক্ষেণে বাজায় মুরলী।
দেখিয়া কান্দয়ে সখী করিয়া বিকুলি॥"

(বিথারা = বিস্তার। সমতি = সম্মতি বা সাড়া)

উদ্‌ঘূর্ণা—বিরহহেতু নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলা হয়। শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় আছেন, সেই সময়ে বিরহ-বিহ্বলা শ্রীরাধা উদ্‌ঘূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, কখন অভিসারিকা নায়িকার ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন; কখন বা বাসকসজ্জিকার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করিতেছেন, আবার কখন খণ্ডিতার ন্যায় আকাশের নীল মেঘকে তর্জ্জন করিতেছেন।

চিত্রজল্প—প্রিয়তমের সুহৃদের দর্শন লাভ হইলে গূঢ়রোষ বশতঃ প্রচুরভাবময় যে জল্পনা বা কথাবার্ত্তা, তাহার নাম চিত্রজল্প। অনির্ব্বচনীয় ভাবময় এই চিত্রজল্পের অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

শ্রীবৃন্দাবন ও বৃন্দাবনবাসী সকলকে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র মথুরায় গিয়াছেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-আদেশে মথুরা হইতে আগত কৃষ্ণতুল্যবেশধারী উদ্ধব মহাশয়কে দেখিয়া এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ মনে করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে যথাবিধি সম্মানিত করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম ধ্যান করিতে করিতে শ্রীরাধার অপূর্ব্ব গর্ব্বাদিময় দিব্যোন্মাদের উদয় হইল। তখন তিনি একটী ভ্রমরকে স্বীয় চরণযুগলের চতুর্দ্দিকে গুঞ্জন করিতে দেখিয়া ও দিব্যোন্মাদ বশতঃ উদ্ধবকে ভ্রমররূপে অনুমান করিয়া মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য দুঃখিত হইয়াই বোধ হয় তিনি আমাদের প্রসন্নতার জন্য এই দূত প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপে ভ্রমরটিকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত একজন দূতরূপে কল্পনা করিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে

করিতে শ্রীরাধা তাহাকে উদ্দেশ করিয়া নানাবিধ ভ্রমময় প্রচেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে, "মধুপ! কিতববন্ধো" ইত্যাদি দশটী শ্লোকে (১২-২১ শ্লোক দেখ) তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই দশটী শ্লোককে **ভ্রমরগীতা** বলা হয়। ইহাতে দশাঙ্গ চিত্রজল্পের দশ অঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ যথা—"চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতং। বিজল্পোজ্জল্প সংজল্পো অবজল্পোঽভিজল্পিতং। আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতাঃ॥" অর্থাৎ, প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প—এই দশটী চিত্রজল্পের অঙ্গ।

(১) **প্রজল্প**—অসূয়া, ঈর্ষা ও মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া প্রিয়ব্যক্তির যে অকৌশলের বা অপটুতার উদ্গার, তাহার নাম প্রজল্প—যথা,

> "মধুপ! কিতববন্ধো! মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
> কুচ-বিলুলিতমালা-কুঙ্কুম-শ্মশ্রুভির্নঃ।
> বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
> যদু-সদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥ (ভাঃ ১০।৪৭।১২)।

অন্বয়—মধুপ (হে ভ্রমর), কিতবন্ধো (হে ধূর্ত্তবন্ধো), সপত্ন্যাঃ (সপত্নীগণের) কুচবিলুলিত (রতি সময়ে কুচযুগদ্বারা বিমর্দ্দিত) মালা-কুঙ্কুম-শ্মশ্রুভিঃ (শ্রীকৃষ্ণবক্ষস্থ বনমালার কুঙ্কুমে রঞ্জিত শ্মশ্রুরাজি দ্বারা উপলক্ষিত যে তুমি, অর্থাৎ মালা-কুঙ্কুম যাঁহার শ্মশ্রুতে লগ্ন আছে, সেই তুমি) নঃ (আমাদিগের) অঙ্ঘ্রিং (চরণ) মা স্পৃশ (স্পর্শ করিও না)। মধুপতি (গোপ জাতি হইয়াও যিনি এখন যদুপতি হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ) তন্মানিনীনাং (আমাদের সপত্নী সেই মানিনী যদুপত্নীগণের) প্রসাদং বহতু (পাদগ্রহণাদি দ্বারা তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করুন)। (আমরা নিকৃষ্টা গোপ নারী, আমাদিগকে প্রসন্না করিয়া তাঁহার কি

লাভ হইবে ?)। যদুসদসি (যদু সভায়) বিড়ম্ব্যং (উপহাসযোগ্য হইবে তাঁহার বা সেই কৃষ্ণের আচরণ) যস্য (যাঁহার) দূতঃ (দূত হইয়া) ত্বম্ ঈদৃক (তুমি ঈদৃশ সুরতচিহ্ন ধারণ করিয়াছ)। অর্থাৎ, তুমি যখন তাঁহার দূত হইয়া যদুপত্নীগণের ঈদৃশ সুরত চিহ্ন ধারণ করিয়াছ তখন তিনি যদু-সভায় উপহাসাস্পদই হইবেন।

ব্যাখ্যা—স্বীয় চরণ-কমলের সৌরভলোভে আগত গুঞ্জনকারী ভ্রমরটীকে দেখিয়া দিব্যোন্মাদ বশতঃ শ্রীরাধা মনে করিলেন—"পুষ্পরেণু দ্বারা রঞ্জিতশ্মশ্রু এই ভ্রমর শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে এখানে আসিয়া আমাকে প্রসন্না করিবার জন্য আমার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছে।" এইরূপ মনে করিয়া তিনি ভ্রমরটীকে "হে মধুপ, হে কিতববন্ধো"—এইরূপে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না।" মধুপ অর্থে মদ্যপ বা মদ্যপায়ী এবং **কিতববন্ধু** অর্থে ধূর্ত্তের বন্ধু। ভ্রমরটী তাহার স্বভাববশতঃ গুঞ্জন করিতেছে, তাহা দেখিয়া শ্রীরাধা মনে করিলেন—তাহাকে মধুপ ও কিতববন্ধু বলা হইয়াছে বলিয়া সে গুণ্ গুণ্ শব্দ দ্বারা প্রত্যুক্তি করিয়া আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছে। তাই শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"হে মধুকর! তুমি মধুপ নহ—একথা তুমি বলিতে পার না। তুমি যে মধুপ, তোমার পীতবর্ণ শ্মশ্রুই তাহার প্রমাণ। আমার **সপত্নীর** কুচযুগলে কৃষ্ণ-বক্ষঃ সংঘর্ষ হওয়ায় কৃষ্ণ-কণ্ঠের যে বন-মালা বিমর্দ্দিত ও কুচকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল, তুমি সেই বনমালার উপরে বসিয়াই মধুপান করিয়াছিলে। কুচযুগ দ্বারা বিমর্দ্দিত সেই মালার কুঙ্কুম এখনও তোমার শ্মশ্রুরাজিতে বিজড়িত হইয়া আছে, তাহাতেই তোমার কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তুমি মধুপ নহ—একথা বলিলে চলিবে কেন ?"

"আবার, তুমি যে কিতববন্ধু নও—তাহাও তুমি বলিতে পার না। হে মধুকর! তুমি হয়ত জান না—"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং

(ভাঃ ১০।৩২।২২) ইত্যাদি বাক্যে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন—"তোমাদের প্রেমঋণ আমি শোধ দিতে পারিলাম না, সেকারণে আমি তোমাদের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিলাম।" এইরূপে তিনি যে নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ব্যভিচারহেতু তিনি কিতব বা শঠ বা বঞ্চক হইলেন না কি? এইরূপ কিতব যিনি, তুমি ত তাঁহারই বন্ধু। অতএব তুমি কিতববন্ধু নহ—একথা বলিলে চলিবে কেন?" অতঃপর শ্রীরাধা মদ্যপায়ী ধূর্ত্তের স্পর্শে স্বীয় চরণ অপবিত্র হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আবার বলিলেন—"তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না। যদি প্রণাম করিতে অভিলাষ থাকে, তবে দূর হইতে প্রণাম কর।" এই কথা বলিয়া তিনি স্থিরভাবে ভ্রমরটীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরে শ্রীরাধা মনে করিলেন যেন ভ্রমরটী গুণ্ গুণ্ স্বরে বলিতেছে—"এরূপ অবস্থায় আমি মথুরায় ফিরিয়া যাই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া তোমাকে প্রসন্না করুন।" এইরূপ মনে করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"হায় হায়, তুমি যে মধুপ, শুধু মদ্যপানেই তুমি পটু। অন্য কোনও কার্য্যে তোমার পটুতা নাই, তাই তুমি এইরূপ কথা বলিতেছ। তুমি কি ভুলিয়া গেলে—তিনি এখন মধুপতি, যাদবগণের পতি। গোপ-জাতি হইয়াও ভাগ্যবশে তিনি এখন ক্ষত্রিয় যাদবগণের পতি হইয়াছেন। আমরা যে নিকৃষ্টা গোপনারী, আমাদিগের নিকটে আসিতে বা আমা-দিগকে প্রসন্না করিতে তাঁহার অবসর কোথায়? সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তিনি এখন মানিনী ক্ষত্রিয়া স্ত্রীগণের প্রসাদ বহন করুন, তাঁহাদিগকেই সর্ব্বদা প্রসন্না করিতে থাকুন। আমাদিগকে প্রসন্না করিয়া তাঁহার কোনও লাভ নাই। দুঃখের বিষয়, তুমি তাঁহার দূত হইয়া ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণের সুরত সম্বন্ধীয় কুঙ্কুম নিজ শ্মশ্রুতে ধারণ করিতেছ। এই কারণে তিনি কিন্তু যদুগণের সভায় নিন্দিত ও উপহাসাস্পদই হইবেন। তিনি মধুপতি, মধু বা মদ্যের পতি, সুতরাং মদ্যপই। মদ্যপান

জনিত মত্ততা বশতঃই তিনি তোমার সদৃশ সুরতচিহ্নধারী ভ্রমরকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন। নিজ হিতাহিতের দিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। যদুস্ত্রীগণের ধর্ম্ম লোপ হওয়ায় তৎপতিগণ যে কুপিত হইয়া তাঁহার বিড়ম্বনাই করিবেন, মত্ততাবশতঃ তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

এস্থলে, 'কিতববন্ধু'-শব্দে প্রেমসুলভ অসূয়া, 'সপত্নী'-শব্দে ঈর্ষা, 'চরণ স্পর্শ করিও না'—এই বাক্যে মদ বা গর্ব্ব, 'ক্ষত্রিয়া স্ত্রীগণের প্রসাদ বহন করুন'—এই বাক্যে অসূয়া এবং 'যদুগণের সভায়' ইত্যাদি বাক্যে অকৌশলের উদ্গার ধ্বনিত হইল।

(২) **পরিজল্প**—প্রভুর নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদি দোষের উল্লেখ করিয়া ভঙ্গিদ্বারা নিজের বিচক্ষণতা প্রকাশক উক্তির নাম পরিজল্প—যথা, "সকৃদধর সুধাং স্বাং···" (ভাঃ ১০।৪৭।১৩)।

ভ্রমরটীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"ছি ছি, এ কি বলিবার কথা? **তুমি যেমন** পুষ্পের মধুপান করিয়া বিনাদোষে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া থাক, তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণও তেমনি স্বীয় **মোহিনী** অধর সুধা একবার মাত্র ছলেবলে **পান করাইয়া** নির্দয়-ভাবে আমাদিগকে **সত্তই পরিত্যাগ করিয়া** চলিয়া গিয়াছেন। জীবিত না থাকিলে কষ্টভোগের সম্ভাবনা নাই—এইরূপ বিচার করিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার অধর সুধা একবার মাত্র পান করাইয়াছেন। সুখদানের ইচ্ছা থাকিলে তিনি তাঁহার অধর সুধা আমাদিগকে বারবার পান করাইতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এত কষ্টেও আমরা এখনও জীবিত আছি। তুমি অবশ্য বলিতে পার—'তোমরা সকলে সতী সাধ্বী হইয়াও তাঁহার জন্য লালায়িত হইয়াছিলে কেন?' ওহে মধুকর! ভ্রমর জাতি বলিয়া তুমি হয়ত জান না, তাহার এই লালসাবর্দ্ধক অধর সুধার কি অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তি, যাহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধি ভ্রংশিত

হইয়াছিল। যাহার দ্বারা আমরা দুই লোক হইতে ভ্রষ্ট হইলাম।" এইকথা বলিয়া শ্রীরাধা কিছুক্ষণ স্থিরভাবে ভ্রমরটীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন ভ্রমরটী গুন্ গুন্ স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, তোমরা তাঁহার নিন্দা করিতেছ কেন?" এইরূপ মনে করিয়া শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"আমাদের মনে হয়, কোমল স্বভাবা লক্ষ্মীদেবী শঠ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রলোভনময় মিথ্যা বাক্য দ্বারা হৃতচিত্তা হইয়া তাঁহার পরিচর্যা করিয়া থাকেন। আমরা ত আর তোমার লক্ষ্মীদেবীর মত কোমলস্বভাবা সরলা নহি, তাঁহার মত আমরা **অবিচক্ষণাও নহি**। তাই তিনি যাহা করিতে পারেন, আমরা তাহা পারি না।"

এস্থলে, 'মোহিনী' ও 'পান করাইয়া'—এই দুই পদে শ্রীকৃষ্ণের শঠতা, সদ্যই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন'—এই বাক্যে তাঁহার নির্দ্দয়তা ও প্রেমশূন্যতা, 'তুমি যেমন' ইত্যাদি বাক্যে চপলতা এবং 'অবিচক্ষণাও নহি'—ইহা দ্বারা আপনার বিচক্ষণতা সূচিত হইল।

(৩) **বিজল্প**—মানগর্ভা অসূয়া অর্থাৎ ভিতরে গূঢ়মান অথচ বাহিরে সুস্পষ্ট অসূয়া—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপহাসাত্মক কটাক্ষোক্তির নাম বিজল্প—যথা, "কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে..." (ভাঃ ১০।৪৭।১৪)।

নিজস্বভাব বশতঃ ভ্রমরটী গুঞ্জন করিতেছিল। তাহা শুনিয়া শ্রীরাধার বোধ হইল যেন সে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিয়া গান বিষয়ে নিজের দক্ষতা প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ মনে করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—পশুগণ চতুষ্পদ, আর তুমি ষট্‌পদ সুতরাং সার্দ্ধপশু। তাই বুদ্ধির অভাব হেতু তুমি জান না,—কোথায় কোন গান করা সঙ্গত। এইরূপে অসূয়া প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"ওহে মধুকর! আমরা যদুপতিকে বিশেষরূপে জানি, তাঁহাকে অনেক বার অনুভব করিয়াছি।

তুমি বৃথা এই গোপী সভায় তাঁহার গুণগান করিতেছ। গোপীগণ কখনই তোমার গানে প্রসন্না হইবে না। তুমি পুনঃ পুনঃ গান করিতেছ যদুপতি কৃষ্ণের কথা, তাহাতে আবার আমাদের নিকটে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া গৃহত্যাগিণী ও বনচারিনী হইয়াছে, যাহারা এখন এক মুষ্টি চনক প্রদানেও অসমর্থা। তুমি যে নিতান্তই অজ্ঞ, তাই তোমাকে তোমার এই গানের উপযুক্ত স্থান উপদেশ করিতেছি, মন দিয়া শুন। তুমি মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পুরস্ত্রীগণের সাক্ষাতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন কর। গাঢ় আলিঙ্গনাদি দ্বারা রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কুচ-তাপ ও কন্দর্পপীড়ার শান্তি করিতেছেন। সানন্দে তাঁহারা তোমার অভীষ্টপূরণ অবশ্যই করিবেন। অতএব আর তুমি এখানে কালবিলম্ব করিও না, তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া যদুপতির গুণগান কর।"

এস্থলে, প্রথমাংশে অসূয়া ও শেষাংশে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপহাসাত্মক কটাক্ষ করা হইয়াছে।

(৪) উজ্জল্প—যাহাতে গর্ব্বগর্ভা, অর্থাৎ ভিতরে গর্ব্ব আছে এইরূপ, ঈর্ষা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কুহকতা বা প্রতারণা কীর্ত্তন ও অসূয়া সহ সর্ব্বদা আক্ষেপ থাকে, তাহার নাম উজ্জল্প—যথা, "দিবি ভুবি চ রসায়াং···" (ভাঃ ১০।৪৭।১৫)।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—"ওহে মধুকর! তুমি বুঝি গুন্ গুন্ স্বরে বলিতেছ—'যদুপতি মথুরায় থাকিয়া দিবারাত্র আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন এবং আমার প্রসন্নতার জন্যই তিনি তোমাকে দূতরূপে এখানে পাঠাইয়াছেন। আমরা কিন্তু তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমরা অনেকবার তাঁহার সঙ্গ করিয়াছি, তাই আমরা বিশেষরূপে জানি—স্ত্রীগণ ব্যতিরেকে তাঁহার কালাতিপাত হয় না। তিনি যদি মথুরায় স্ত্রী প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগকে

স্মরণ করিতেন এবং তথায় লইয়া যাইবার জন্য তোমাকে এখানে পাঠাইতেন।" এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা গুঞ্জনকারী ভ্রমরটীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি বলিতে লাগিলেন—"তুমি বুঝি আবার বলিতেছ—'ক্ষত্রিয়া পুরস্ত্রীগণ গোপজাতি শ্রীকৃষ্ণকে কি প্রকারে অঙ্গীকার করিবে?' এরূপ কথা তুমি বলিতে পার না। **ত্রিভুবনে কোন্ রমণী** তাঁহার দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ লাভের নিমিত্ত তাঁহার **চরণরজের উপাসনা** করেন। নাগপত্নীগণের এইরূপ বাক্য আমরা অনেকবার ভগবতী পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি। সাক্ষাৎ কমলার নিকটে **আমরা কোথাকার কে?** একেত আমরা মানুষী, তাহাতে আবার গোপী, তাহাতেও কিনা আবার বনচরী। এরূপ অবস্থায়, আমরা কিরূপে তাঁহার যোগ্য হইতে পারি?" শ্রীরাধার এইরূপ বাক্যে শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি হইতেও আপনাদিগের প্রেমাধিক্য ও রূপলাবণ্যাদির আধিক্য ব্যক্ত হওয়ায়, ইহাতে গর্ব্বগর্ভিত ঈর্ষাই ধ্বনিত হইল।

ক্ষণপরে, শ্রীরাধা আবার বলিলেন—"ওহে মধুকর! তুমি বোধ হয় গুন্‌গুন্ স্বরে বলিতেছ—'জগতে সকলেই কৃষ্ণকে **উত্তমঃশ্লোক** শব্দে কীর্ত্তন করিয়া থাকে।' তোমার এই কথাই বা আমরা কিরূপে স্বীকার করিব? যিনি দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন, তাঁহাকেইত উত্তমঃশ্লোক বলা হয়। আমরা তাঁহার অভিলম্পিত নহি, তাহা জানি। তথাপি তিনি যদি আমাদের মত সন্তপ্ত দীনহীন জনকে সুখপ্রদান না করিলেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে কিরূপে উত্তমঃশ্লোক-শব্দে কীর্ত্তন করিতে পারি? সেক্ষেত্রে উত্তমঃশ্লোকতা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না।

শ্রীরাধার এই উক্তিতে 'আমরা কোথাকার কে'—ইহা দ্বারা দৈন্য, 'ত্রিভুবনে কোন্ রমণী' ইত্যাদি বাক্যে কুহকতা, 'চরণ রজের উপাসনা'

ইত্যাদি বাক্যে গর্ব ও ঈর্ষা এবং 'উত্তমঃশ্লোক' সম্বন্ধীয় বাক্য দ্বারা অসূয়াসহ আক্ষেপ ধ্বনিত হইল।

(৫) **সঞ্জল্প**—দুর্গম' উপহাসের সহিত আক্ষেপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অকৃতজ্ঞতাদি প্রকাশক উক্তির নাম সঞ্জল্প—যথা, "বিসৃজশিরসি পাদং..." (ভাঃ ১০।৪৭।১৬)।

ভ্রমরটীকে স্বীয় চরণতলে পতিত দেখিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—"ওহে মধুকর! তুমি কি যদুপতির অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার নিকটে তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ এবং আমাদিগের স্নেহলাভ করিবার জন্য নিজ মস্তকে আমার চরণ ধারণ করিয়াছ? না-না, আমি তোমার কোন কথাই শুনিব না, তুমি আমার চরণ পরিত্যাগ কর।" তথাপি তাহাকে স্বীয় চরণ সমীপে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন 'তুমি কি মুকুন্দের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এখানে আসিয়াছ? দেখিতেছি—তুমি দূতোচিত প্রিয়বচনে ও অনুনয় বিনয় দ্বারা প্রার্থনা করিতে বিলক্ষণ পটু। তোমাদের সকল বিষয়ই আমি অবগত আছি। আমার চরণ ত্যাগ করিয়া তুমি মথুরায় ফিরিয়া যাও।" ভ্রমরটীকে তখনও গুঞ্জন করিতে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"ওহে মধুকর! তুমি কি গুন্‌গুন্ স্বরে বলিতেছে—"তাঁহার সহিত সন্ধি করাই যুক্তিসঙ্গত।" এরূপ কথা তুমি আর আমাকে বলিও না। তাঁহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ প্রেমশূন্য পুরুষের সহিত কিরূপে সন্ধি হইতে পারে? তুমি ভাবিয়া দেখ—তাঁহার নিমিত্ত আমরা পতিপুত্র, ইহলোক, পরলোক, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি। তথাপি তিনি আমাদিগকে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। এরূপ অব্যবস্থিত অকৃতজ্ঞ পুরুষকে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি?

এস্থলে, পূর্বাংশে দুর্গম উপহাসের সহিত আক্ষেপ ও উত্তরাংশে অকৃতজ্ঞতাদি ধ্বনিত হইল।

(৬) **অবজল্প**—শ্রীকৃষ্ণ কঠিন বা নিষ্ঠুর এবং কামুক ও ধূর্ত্ত, সুতরাং তিনি আসক্তির অযোগ্য এবং ভয়ের হেতু—ঈর্ষার সহিত এইরূপ ভাব প্রকাশক উক্তির নাম অবজল্প—যথা, "মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং…" (ভাঃ ১০।৪৭।১৭)।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—"হে মধুকর! তুমি কি গুন্ গুন্ স্বরে বলিতেছ—"শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত অতিশয় কোমল এবং তিনি নিত্য আমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। হায় হায়, তুমি যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন, তাই নৃশংস-প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব কিছুই জান না। তিনি যে শুধু এই জন্মেই কঠোর হইয়াছেন, তাহা নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও তিনি ঐরূপ কঠোর ছিলেন। আমরা দেবী পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি—রামাবতারে তিনি ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধের ন্যায় গুপ্তভাবে বানররাজ বালীকে **বধ করিয়াছিলেন** এবং **স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া** দেবারিদুহিতা শূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। বামনাবতারে তিনিই আবার পরম ভক্ত বলিরাজার **পূজোপহার গ্রহণ করিয়া** কাকের ন্যায় ছলে তাঁহাকেই বন্ধন করিয়াছিলেন।"

শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"তবেই দেখ—রামাবতারে শ্রীরামচন্দ্র-রূপে তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্ঠুর ব্যাধের ন্যায় গুপ্তভাবে বালী-বধ করিলেন। ব্যাধও বানরবধ করে না, অতএব তিনি বানর বধ করিয়া ব্যাধ অপেক্ষাও নিষ্ঠুর হইলেন না কি? আবার দেখ—দাশরথি রামচন্দ্র জটা-বল্কলধারী সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন করিলেন বটে কিন্তু এমনই তিনি স্ত্রীপরায়ণ যে তখনও তিনি স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। স্বীয় পত্নী সীতাদেবীকে নিকটে রাখিয়া তিনি বনে বাস করিলেন। আবার বনবাস কালে, সুন্দরী শূর্পনখা যখন তাঁহাকে পতিরূপে প্রার্থনা করিল, তখন তিনি তাহাকে গ্রহণ ত করিলেনই না, যাহাতে অন্য কেহই তাঁহাকে ভোগ না করে, সেই জন্য তাহাকে বিরূপা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শূর্পনখাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি যে ধর্ম্ম-

জ্ঞান দেখাইলেন, কুব্জাকে গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার সেই ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল? শ্রীকৃষ্ণের ক্রূরতার ও অকৃতজ্ঞতার কথা আর কত বলিব। বামনাবতারে তিনিই আবার ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম ধার্ম্মিক বলি রাজাকে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এতাদৃশ ধূর্ত্ত, কামুক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি পুরুষের সহিত সখ্যতা করা আমাদের উচিত হইবে না।

অতঃপর শ্রীরাধা নীরবে ভ্রমরটিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—'মধুকর! তুমি কি বলিতেছ—'তোমরা শুদ্ধচিত্তা হইয়া পরনিন্দা করিতেছ কেন?' হায় হায়, তুমি এখানে নবাগত, তাই জান না যে কৃষ্ণকথায় রত থাকাই ব্রজভূমির ধর্ম্ম। আমাদের দুর্দ্দৈব, আমরা এই ব্রজভূমি ত্যাগ করিতেও সক্ষম নহি। আমাদের দুঃখের কথা আর কত বলিব—তোমার প্রভুর এমন দুরন্ত মোহন স্বভাব যে তাঁহার কথারূপ অর্থ ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে, শুধু আমাদের কেন, নিখিল মুনিগণের পক্ষেও, দুষ্কর। তজ্জন্যহেতু আমরা তোমাদের যদুপতির কথা আলোচনা করিলেও, **তাঁহার সখ্যে আমাদের প্রয়োজন নাই।**"

এ স্থলে, 'বধ করিয়াছিলেন'—ইহা দ্বারা কাঠিন্য, 'স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া' ইহাতে কামিত্ব, 'পূজোপহার গ্রহণ করিয়া'—ইহা দ্বারা ধূর্ত্ততা, 'সখ্যে আমাদের প্রয়োজন নাই'—ইত্যাদি দ্বারা আসক্তির অযোগ্যতা, ভয় ও ঈর্ষা ধ্বনিত হইল।

(৭) **অভিজল্প**—শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষিগণকে পর্য্যন্ত দুঃখ দিয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করাই উচিত—ভঙ্গি দ্বারা এইরূপ অনুতাপসূচক বচনকে অভিজল্প বলা হয়—যথা, "যদনুচরিত লীলা ইত্যাদি" (ভাঃ ১০।৪৭।১৮)।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—"ওহে মধুকর! শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎভাবে সখ্য করিয়া আমরা যে দুঃখিনী হইয়াছি, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তাঁহার নিষ্ঠুরতার কথা আর কি বলিব, তাঁহার লীলা-কথাও সমস্ত জগৎকে দুঃখদান করিয়া থাকে। তাঁহার চরিত্ররূপ-লীলা কথা কর্ণপথের অমৃতস্বরূপ বটে, কিন্তু সেই কর্ণামৃতের কণিকামাত্র যে কেহ শ্রবণ বা আস্বাদন করিয়াছে সে-ই কঠোর, নির্দ্দয় ও কৃতঘ্নের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে, সে-ই রাগাদি দ্বন্দ্ব রহিত হইয়াও গৃহ কুটুম্বাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভোগে আসক্তিশূন্য হইয়া পড়ে এবং ভোগরহিত পক্ষিগণের ন্যায় কেবল প্রাণধারণার্থ কঠোর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। তুমি হয়ত জান না —এখানে এমন অনেক পক্ষী আছে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণমাত্রই গৃহাদি ত্যাগ করিয়া তাঁহার লীলাস্থল এই বৃন্দাবনে আসিয়া ভিক্ষুচর্য্যা আচরণ করিয়া রহিয়াছে এবং আমাদের সঙ্গ বশতঃ মহাদুঃখী হইয়া আছে। হে মধুকর! তোমার প্রভু পক্ষিগণকে পর্য্যন্ত দুঃখ দেন, সুতরাং তাঁহাকে ত্যাগ করাই উচিত বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার কথা এরূপ সর্ব্বনাশিনী জানিয়াও, কিছুতেই আমরা তাহা **ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।**" শ্রীরাধার এইরূপ ব্যাজোক্তি দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে।

এস্থলে, পক্ষীকে সাদৃশ্য করিয়া সজ্জনগণের খেদ বশতঃ ও পক্ষি-গণেরও খেদ বশতঃ তাঁহার ত্যাগই সমুচিত—ভঙ্গী দ্বারা এইরূপ বলা হইয়াছে। 'ত্যাগ করিতে পারিতেছি না'—ইহা দ্বারা অনুতাপ ধ্বনিত হইয়াছে।

(৮) **আজল্প**—নির্বেদ বা অনুতাপ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও দুঃখপ্রদত্ত এবং ভঙ্গীদ্বারা অন্যের সুখদাতৃত্ব কীর্ত্তনের নাম আজল্প—যথা "বয়মৃতমিব জিহ্ম ..." (ভাঃ ১০।৪৭।১৯)।

শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—"ওহে মধুকর! তুমি কি গুন্ গুন্ স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছ—'শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরূপই হইলেন, তখন তোমরা তাঁহার সহিত সখ্যতা করিলে কেন?' মধুকর! আমাদের দুঃখের কথা তোমাকে আর কি বলিব—অবোধ কৃষ্ণসারবধূ হরিণীগণ যেমন নিষ্ঠুর ব্যাধের গানে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক শরাঘাতে পীড়িত হইয়া ব্যথা অনুভব করিয়া থাকে, আমরাও তেমনি সেই **কুটিলের**—ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং (ভাঃ ১০।৩২।২২ দেখ) ইত্যাদি বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া বহুবার তদীয় **নখাঘাত** জনিত তীব্র কন্দর্পপীড়া সহ্য করিয়া এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, কিন্তু কখনও মদনসুখ পাই নাই। এইরূপ যিনি, তাঁহার সখ্যে আমাদের প্রয়োজন নাই। অতএব তুমি তাঁহার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া **অন্যপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন কর।**

এস্থলে, দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা, 'নখাঘাত'-শব্দে দুঃখদত্ব এবং 'অন্য প্রসঙ্গ কীর্ত্তন কর'—এইরূপে ভঙ্গিদ্বারা অন্যের সুখদত্ব সূচিত হইল।

(৯) **প্রতিজল্প**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অপর স্ত্রী সর্ব্বদাই থাকে, সুতরাং তাঁহার নিকটে গমন করা অনুচিত—এইরূপ বাক্য এবং দূতের সম্মান যাহাতে উক্ত হয়, তাহাকে প্রতিজল্প বলা হয়—যথা, "প্রিয়সখ পুনরাগাঃ····" (ভাঃ ১০।৪৭।২০)।

ক্ষণকাল ভ্রমরটীকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীরাধা মনে করিলেন—তবে বোধ হয় সে মথুরায় ফিরিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছে। হায় হায়! আমি যে তাহাকে তীক্ষ্ণ বাক্য বাণদ্বারা সন্তপ্ত করিয়াছি। এইরূপ মনে করিয়া শ্রীরাধা কলহান্তরিতা দশা প্রাপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—আমার কান্ত বিবিধ সদ্গুণশালী ও প্রেমের সাগর। নিশ্চয়ই তিনি আমার শত শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দূতকে আবার এখানে পাঠাইয়া দিবেন। এইরূপ আকাঙ্ক্ষা লইয়া শ্রীরাধা ভ্রমরের আগমন-পথ

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় শ্রীরাধা ভ্রমরটীকে আবার সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সাদরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"হে আমার প্রিয়তমের সখা! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কি তোমায় পুনর্ব্বার এখানে পাঠাইলেন? তুমি আমার প্রিয়তমের সখা, সুতরাং আমার মাননীয়। এক্ষণে আমি তোমার কোন্ অভিলাষ পূরণ করিব, বল। হে সৌম্য! তুমি কিন্তু আমাদিগকে মধুপুরী যাইবার জন্য অনুরোধ করিও না। তুমিই বুঝিয়া দেখ—তোমাদের যদুপতি যখন পুরস্ত্রীগণের মিথুনভাব পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, তখন কি জন্য তুমি আমাদিগকে তাঁহাদের সমীপে লইয়া যাইবে? আমাদের সেই স্থানে যাওয়া বৃথা নয় কি? আর যদি বল—নিরন্তর তিনি একাকী অবস্থান করেন, তাহা হইলেও আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। মধুকর! তুমি কি জাননা—তাঁহার প্রিয়তমারূপে প্রসিদ্ধা দেবী কমলা স্বর্ণরেখা রূপে নিরন্তর তাঁহার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিয়া পরমসুখে তাঁহার সহবাস করিতেছেন। প্রেমবহুল ব্রজধামে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা ছিল না। সম্পত্তিবহুল মধুপুরীতে এখন তাঁহার মহান্ আদর হইয়াছে। তবে তিনি কেন আর এখানে আসিবেন? আর কেনই বা তুমি আমাদিগকে তাদৃশ যুগ্মভাব-প্রাপ্ত পুরুষের নিকটে লইয়া যাইবে?

এই উদাহরণে প্রতিজল্পের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট আছে।

(১০) **সুজল্প**—সরলতা বশতঃ গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জিজ্ঞাসা যাহাতে থাকে তাহাকে সুজল্প বলা হয়—যথা, "অপি বত মধুপুর্য্যাং···"(ভাঃ ১০।৪৭।২১)।

হায় হায়! উন্মত্ত হইয়া এতক্ষণ আমি কি প্রলাপ বলিলাম, আমি যে এখনও প্রয়োজনীয় কোন কথাই জিজ্ঞাসা করি নাই—এইরূপে অনুতাপ করিয়া শ্রীরাধা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন—"হে সৌম্য! তুমি সুমহান্ সোমবংশোদ্ভব, সুতরাং তুমি আমাদিগকে বঞ্চনা

করিতে পার না। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—**আর্য্যপুত্র গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বর্ত্তমানে কি মধুপুরীতেই আছেন ?"** প্রেমোন্মাদ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আর্য্যপুত্র বলিয়া শ্রীরাধা সরলভাবে জানাইলেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার স্বামী, একমাত্র তাঁহাকেই তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, অন্য কাহারও প্রতি তাঁহার পতিভাব জন্মায় নাই। এইরূপে স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধা মনে করিলেন—প্রাণবঁধু শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের এত নিকটে মথুরাপুরীতে আছেন, তখন তাঁহার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ মনে করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়! মথুরা-গমন কালে তিনি বৃন্দাবনের কিরূপ অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন, আর এখন ফিরিয়া আসিয়াইবা কি দেখিবেন। পিতা নন্দ মহারাজ তাঁহার সুখের জন্য স্থানে স্থানে কত বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, পিতৃগৃহের ন্যায় তাহারাও এখন ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সুবলাদি সখাগণ তাঁহার অভাবে মুহ্যমান, জ্ঞাতিবর্গ সকলে শোকে আচ্ছন্ন। পিতামাতার ত কথাই নাই। পিতা নন্দ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন, চক্ষের জলে মা-যশোদা অন্ধ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরাধা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মধুকর! তিনি কি তাঁহার পিতা-মাতা, শূন্য ভবন, শোকাতুর সখাবৃন্দ ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করিয়া থাকেন? ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল—সেই নৃত্য-গীত-বাদ্য ও রাসলীলাদি ক্রীড়ার কথা, মনে পড়িতে লাগিল—শ্রীকৃষ্ণ সুখের জন্য তাঁহারা কত যত্ন করিয়া বনমালা গাঁথিতেন, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে লেপন করিতেন এবং কত সোহাগভরে তাম্বুলাদি রচনা করিতেন। হায় হায়! মথুরার পুরস্ত্রীগণ ত আর এসব কিছুই জানে না, না জানি প্রাণবঁধুর তজ্জন্য কত কষ্ট হইতেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেখানে থাকা আর সঙ্গত নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"বহুপ্রকারে

সেবাকারিণী **মাদৃশ এই কিঙ্করীগণের কথা** কি তিনি কখনও নিজ-মুখে উচ্চারণ করেন? অহো! কবে তিনি এখানে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সেই অগুরুচন্দনবৎ সুবাসিত কোমল বাহুদ্বয় আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন?" লজ্জাবশতঃই শ্রীরাধা 'বাহুদ্বয় কণ্ঠে ধারণ করিবেন'—এই কথা না বলিয়া, তাহা 'মস্তকে অর্পণ করিবেন'—এইরূপ বলিলেন।

এস্থলে, আর্য্যপুত্র-শব্দ দ্বারা সরলতা ব্যঞ্জিত হইল, 'বর্ত্তমানে কি মধুপুরীতেই আছেন?'—এইরূপ প্রশ্ন দ্বারা গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত হইল, 'মাদৃশ এই কিঙ্করীগণের কথা'—এইরূপ বাক্য দ্বারা দৈন্য এবং সর্ব্বশেষে চাপল্য ও উৎকণ্ঠা ধ্বনিত হইল।

২। মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলার দিগদর্শন,—

নীলাচলে রাজগুরু কাশীমিশ্রের সুবিশাল ভবনে শ্রীরাধাকান্তদেবের মোহন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। সে কারণে এই ভবনের নাম 'রাধাকান্ত মঠ' বা বড় মঠ। ইহারই একটী নিভৃত মন্দিরে মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। এই মন্দিরের একটী ক্ষুদ্র অন্তঃপ্রকোষ্ঠের নাম **গম্ভীরা**। গম্ভীরা গৃহে প্রভু বিশ্রাম ও শয়ন করিতেন এবং কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া গম্ভীরা লীলা করিতেন। "নিরন্তর রাত্রিদিনে বিরহ উন্মাদে। হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥" (চৈঃ চঃ ২।১।৪৭)। কৃষ্ণাবতারে যিনি শ্যামসুন্দররূপে শ্রীরাধাকে কাঁদাইয়াছিলেন, গৌরাবতারে তিনিই আবার রাধাভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে **গম্ভীরা লীলা** করিলেন। প্রভুর এই গম্ভীরালীলা চির নূতন, চিরসুন্দর ও চিরমধুর। ইহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন লাভ করিতে পারিলে জীব চিরতরে ধন্য হইয়া যায়। মহাপ্রভুর গম্ভীরা-লীলাস্থলী অদ্যাবধি বিদ্যমান আছেন। তথায় মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কন্থা, কমণ্ডলু ও কাষ্ঠপাদুকা শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যাদি দ্বারা সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছেন।

প্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের লীলা দিব্যোন্মাদময়ী। প্রভুর এই দিব্যোন্মাদ বিরহবিধুরা শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদেরই অনুরূপ। "শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় দিনে দিনে॥ নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ॥" (চৈঃ চঃ ২।২।৩-৪)। উদ্ধবদর্শনে কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী রাধারাণীর যেরূপ দশা হইয়াছিল, গম্ভীরালীলায় মহাপ্রভু সেইরূপ দশা পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে স্বয়ং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে আপনকান্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং দিব্যোন্মাদবশতঃ অকারণ বাক্য-প্রয়োগ করিয়া এক করিতে আর এক করিতেন। তখন তাঁহার জগৎ-স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। প্রভুর এই দিব্যোন্মাদ ব্রজপ্রেমের অন্তিম অবস্থা, আনন্দভোগের শেষসীমা এবং ব্রজরস-আস্বাদনের চরম পরিণতি। এইরূপে মহাপ্রভু দিবানিশি রাধাভাবে বিভোর থাকিয়া ব্রজ-রস আস্বাদন করিতেন এবং ব্রজের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন।

দিব্যোন্মাদে মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত প্রাকৃত উন্মাদরোগের লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হইলেও, প্রেমের গাঢ়তার ফলস্বরূপ এই দিব্যোন্মাদ একটা স্বতন্ত্রবস্তু। ইহা এক অনির্বচনীয় সাত্ত্বিক অবস্থা, ইহা এক অপ্রাকৃত অলৌকিক ব্যাপার। ইহাতে জগৎ-জ্ঞান থাকে না, অথচ আত্মসত্তাটী প্রবুদ্ধ থাকে। প্রাকৃত উন্মাদরোগীর ন্যায় দিব্যোন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি মূর্চ্ছাকালে জ্ঞান হারান না। বাহিরে তিনি নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া থাকিলেও, ভিতরে তাঁহার সম্পূর্ণজ্ঞান থাকে। তদবস্থায় তিনি আত্মভাবে প্রবুদ্ধ থাকিয়া সুমধুর রসসুধা-আস্বাদন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই দিব্যোন্মাদে দিব্যদৃষ্টির বিকাশ হয় এবং আনন্দতরঙ্গে উদ্ভাসিত সাত্ত্বিকভাব সকলের উদ্দীপন হয়। আনন্দময়ের সহিত মিলনের ফলে আত্মা তখন চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া আনন্দধামে গমন করে। প্রকৃতপক্ষে এই দিব্যোন্মাদ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদনের এক অভিনবপন্থা। ইহাতে

চিন্ময় রাজ্যের স্ফূর্ত্তি হয়। তখন ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময়বাদ প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় প্রভুর মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ-ভ্রম হইত। ভাবের আতিশয্যেই এইরূপ ভ্রমের আবির্ভাব। নিরন্তর কৃষ্ণ-লীলানুধ্যান করিতে করিতে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া আকাশের নীলমেঘে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। বর্ণসাদৃশ্য হেতু আকাশের মেঘ শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তির একটা উদ্দীপক মাত্র। সেই একই রূপে প্রভু গোবর্দ্ধন-গিরির লীলাবৈভব স্মরণ করিতে করিতে সেইভাবে তন্ময় হইয়া গোবর্দ্ধন-ভ্রমে চটক পর্ব্বতের দিকে ছুটিয়া যাইতেন। তখন তাঁহার হৃদয় হইতে বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইত। এই দিব্যোন্মাদে সাত্ত্বিকভাব সকল একইকালে সুদ্দীপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। তাহার ফলে, প্রভুর রোমকূপে কদম্বের ন্যায় পুলক দেখা দিত এবং রোমকূপ হইতে যখন স্বেদ নির্গত হইত, তখন সেই স্বেদের সহিত রক্তও বাহির হইয়া আসিত। আবার যখন কম্প উপস্থিত হইত, তখন প্রভুর দাঁতগুলি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিত। ভাবাবেশে প্রভুর দুই চক্ষু হইতে পিচকারীর ন্যায় অশ্রুধারা নির্গত হইত। ভাবাতিশয্যে প্রভুর দেহ কখন ছোট হইয়া অদ্ভুত কূর্ম্মাকার ধারণ করিত, কখন বা হস্তপদের সন্ধি শ্লথ হওয়ায় তাঁহার দেহ অস্বাভাবিকরূপে বড় হইয়া যাইত। প্রত্যক্ষদর্শী স্বরূপ-দামোদরের ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কড়চা অবলম্বন করিয়া এবং দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়া (চৈঃ চঃ ৩।২।৮২), কবিরাজ গোস্বামী (শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ) তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রভুর গম্ভীরালীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥" (চৈঃ চঃ ২।২।৫)। সুতরাং ইহা কবির কল্পনা নহে, সমস্তই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি।

রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভু প্রকটকালের শেষ দ্বাদশবৎসর গম্ভীরালীলা করিয়াছিলেন। বারবৎসর ধরিয়া তিনি দেহধর্ম্ম ভুলিয়া সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতেন। বারবৎসর ধরিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানলে পুড়িতে পুড়িতে অহোরাত্র ক্রন্দন করিতেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন এবং ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেন, আর প্রত্যেক মূর্চ্ছায় তাঁহার জীবন-সংশয় বোধে ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিতেন। কখন কখন মুরলীধর শ্যাম-সুন্দরের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত। তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিতেন। পরক্ষণেই হয়ত তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জাগিয়া উঠিত। তখন তিনি মদনমোহন শ্যামনাগরকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। দারুণ উৎকণ্ঠায় তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেন। কোথায় যাইবেন, কি যে করিবেন, কিছুই যেন তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। চোখের জলে তাঁহার বুক তখন ভাসিয়া যাইত। প্রভুর গম্ভীরা-লীলা সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"সহস্রবদনে যদি কহয়ে অনন্ত। একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত॥ কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখেন গণেশ। একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥" (চৈঃ চঃ ৩।১৮।১২-৩)

শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেই অতিবাহিত হইয়াছে। সেই সময়ে ছিল শুধু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অদ্ভুত দিব্যোন্মাদ, অপূর্ব্ব প্রেমবৈচিত্রী ও অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় প্রভু আপনাকে রাধাজ্ঞান করিতেন এবং কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে নিজ ভাবদেহ ঢালিয়া দিয়া দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত শ্রীরাধিকার ন্যায় আচরণ করিতেন। অভ্যাসমত তিনি স্নান, ভোজন ও জগন্নাথ দর্শন করিতেন বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ শ্রীবৃন্দাবন-স্ফূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। দিবানিশি ছিল শুধু ব্রজলীলার অনুধ্যান ও ব্রজরস-

আস্বাদন। হয়ত কখন মিলনানন্দে বিভোর হইয়া আছেন, পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তীব্র যাতনা, মর্ম্মভেদী হাহাকার, প্রলাপ-বচন ও আকুল ক্রন্দন। বিরহ বেদনায় তিনি কখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে আবার হৃদয়বিদারী আকুল ক্রন্দন ও অদ্ভুত প্রলাপ। প্রভুর এই ভাবাবেশ সহজে ভাঙ্গিত না। বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধাকে যেমন করিয়া তাঁহার নিত্যসহচরী ললিতা ও বিশাখা নানা-ভাবে সান্ত্বনা দিতেন, সেইরূপে ললিতা সখীর আবেশে স্বরূপ দামোদর তৎকালোচিত সুমধুর শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিয়া এবং বিশাখা সখীর আবেশে রামানন্দ রায় ভাবানুকূল শ্লোক পাঠ করিয়া বা কৃষ্ণকথা বলিয়া রাধাভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্তবিনোদের নিমিত্ত বিধি-মত চেষ্টা করিতেন। প্রভুর চিত্তে রাধাভাবের আবেশ হইলেই তিনি স্বরূপকে ললিতাভাবে এবং রায় রামানন্দকে বিশাখাভাবে প্রত্যক্ষ করিতেন। প্রভুর গম্ভীরালীলায় তাঁহার তুইজনে সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে থাকিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক কোনও গান বা শ্লোক দ্বারা এবং সময়োচিত সেবা-যত্নের দ্বারা তাঁহার বিরহতাপিত প্রাণ শীতল করিতেন। বিপ্রলম্ভ দশায় রায়ের কৃষ্ণকথা ও স্বরূপের গান ছিল প্রভুর জীবাতু (জীবন-ধারণের উপায়)।

ক্ষণে ক্ষণে প্রভুর অন্তরের ভাব পরিবর্ত্তিত হইত। কখন্ যে কোন্ ভাবের উদয় হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। হয়ত কখন প্রভু মিলনানন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রেমসুধা পান করিতেছেন, পরক্ষণেই হয়ত অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া তখন তিনি চরম আর্ত্তি প্রকাশ করিতেন। এইভাবে প্রভু অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যময়, অনন্ত মাধুর্য্যময় ও অপূর্ব্ব রসময় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে সদাই উন্মত্ত থাকিতেন। বিষামৃতের মিলনতুল্য এই কৃষ্ণপ্রেম বাহিরে বিষের ন্যায় জ্বালাময় হইলেও, ভিতরে ইহা অমৃতের ন্যায় মধুর। তপ্ত

ইক্ষুচর্ব্বণের ন্যায় ইহাতে তীব্র যাতনা ও অপরিমিত আনন্দ যুগপৎ বিদ্যমান থাকে। অন্তরে অতুল আনন্দের অনুভব হয় বলিয়া বাহ্যিক যাতনা সত্ত্বেও অদ্ভুত এই কৃষ্ণ-প্রেম ত্যাগ করা যায় না। "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত। এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন॥" (চৈঃ চঃ ২।২।৪৪-৫)। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

প্রতি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিয়া চারিমাস কাল প্রভুর সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিতেন। পূর্ব্বে প্রভু যে ভাবে তাঁহাদের সহিত শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেন, এখন আর সেরূপ করিতে পারেন না। এখন কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিলেও, ক্ষণপরেই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গম্ভীরায় চলিয়া যান। প্রভুর এখন সদাই বিরহ ব্যাকুলতা ও দিব্যোন্মাদভাব এবং নয়নে অবিরল অশ্রুধারা। প্রেমাবেশে প্রভু কখন ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন, কখন বা কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যাইতেন। প্রভুর তাৎকালীন অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তগণের মনে পাছে কষ্ট হয়, এই ভয়ে প্রভু নিজ মনোভাব যথাসাধ্য চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহা চাপিতে পারিতেন না। যখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইতেন, তখন তিনি ভক্তগণের নিকটে দুঃখপ্রকাশ করিয়া অতি কাতর-ভাবে বলিতেন—"আমি এখানে সারা বৎসর ধরিয়া তোমাদের অপেক্ষায় থাকি। তোমরাও কত কষ্ট সহ্য করিয়া এখানে আমার নিকটে আসিয়া থাক। আমার কত সাধ—তোমাদের মধুর সঙ্গ করি, কিন্তু কিছুতেই আমি স্থির থাকিতে পারি না, পাগলের মত কেবল কাঁদিয়া ফেলি। আমার মন আর এখন আমাতে নাই। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া সে আমাকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-অন্বেষণে বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে।

তাই আমার এইরূপ দশা হইয়াছে। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।" প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে।

গৌড়ীয় ভক্তগণ যতদিন নীলাচলে প্রভুর নিকটে থাকেন, ততদিন প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান থাকে। তাঁহারা গৌড়ে ফিরিয়া যাইলে প্রভু আবার ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়েন। প্রভুর এই বিহ্বলভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ভক্তগণের সঙ্গে অন্যমনস্কে দিনমান কোনও রূপে কাটিয়া যাইত বটে কিন্তু রাত্রিকালে প্রভুর বিরহ যাতনা এতই বাড়িয়া উঠিত যে শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া প্রভু ক্রমশঃ অচেতন হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহাকে গম্ভীরার মধ্যে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইত। গম্ভীরা মধ্যে প্রভু সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতেন। তখন তিনি কখন কৃষ্ণনাম জপ করিতেন, কখন বা কৃষ্ণ গুণ গান করিতেন, আবার কখন ব্রজের মধুর রসাস্বাদনে নিমগ্ন থাকিতেন। চোখের জলে তখন তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে যাইয়া প্রভু গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেন এবং শ্রীজগন্নাথকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিতেন। কথিত আছে—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগের পর সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার পুনরায় মিলন হয়। দীর্ঘ বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, শ্রীমন্দিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রভুর মনেও সেইরূপ ভাবের উদয় হইত। রাধাভাবের আবেশে প্রভু আপনাকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিতেন এবং শ্রীবলদেব ও সুভদ্রাদেবীর সহিত জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রভু মনে করিতেন যেন সুদীর্ঘ বিরহের পর তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন। শুধু শ্রীমন্দিরে নহে, রথযাত্রাকালেও রথোপরি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু সেইরূপ মনে করিতেন। কুরুক্ষেত্র-মিলন-ভাবের আবেশে প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতে

করিতে—"সেই ত পরাণনাথ পাইনু। যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু॥" (চৈঃ চঃ ২।১।৫০)—এই পদটী কীর্ত্তন করিতেন। রাধাভাবের আবেশে প্রভুর তখন মনে হইত—যাহার বিরহে তিনি এতকাল মদনদহনে দগ্ধ হইতেছিলেন, সেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ শীতল হইয়াছে। প্রভু মিলনানন্দে বিভোর হইয়া আছেন, ক্ষণপরেই তাঁহার মনে অন্যভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল—দীর্ঘ বিরহের পর এই মিলন সুখদায়ক হইলেও, বৃন্দাবনের সঙ্গমের মত ইহা তত মধুর নহে। কথিত আছে—কুরুক্ষেত্রে রাজকীয় বেশে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার তৃপ্তি হইত না। তাঁহার মনে সদাই শ্রীবৃন্দাবনের ও বৃন্দাবনবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের কথাই উদিত হইত। শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে, তিনি যেরূপ আনন্দ পাইতেন, কুরুক্ষেত্রের মিলনে সেরূপ আনন্দ পাইতেন না। শ্রীরাধার মনোগত অভিলাষ এই যে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। শ্রীরাধার এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন—"হা হা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্রনন্দন, কাহাঁ সেই বংশীবদন। কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান, কাহাঁ সেই যমুনা পুলিন। কাহাঁ রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্য-গীত-হাস, কাহাঁ প্রভু মদনমোহন॥" (চৈঃ চঃ ২।২।৪৮-৪৯)। শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া রাধাভাবের আবেশে প্রভু যেন বলিতেছেন—বৃন্দাবনে যাহার সহিত মিলনে আমি সুখে আত্মহারা হইতাম, এখানেও সেই তুমি, আমিও সেই রাধা। দীর্ঘ বিরহের পর আবার আমাদের সুখের মিলনও হইয়াছে। তথাপি আমি বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে তোমার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

মথুরায় অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের সংবাদ লইবার জন্য মহামতি উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারা গোপীগণকে অনেক জ্ঞানোপদেশ

দেওয়াইয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৪৭।২৯-৩৭)। সেই কথা স্মরণ করিয়া প্রভু একদিন রাধাভাবের আবেশে বিরহ-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে লাগিলেন—"প্রাণবল্লভ! তুমি বলিয়াছ, তুমি সর্ব্বাত্মা। পরম কারণ-রূপে তুমি নিখিল জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ বলিয়া তোমার সহিত কখনও আমাদের বিচ্ছেদ হইতে পারে না। কিন্তু প্রিয়তম! তুমি ত ভালরূপেই জান,—তোমার সেবা ছাড়া আমরা কিছুই জানি না, তোমাকে সুখী করা ছাড়া আমরা কিছুই চাহি না। তুমি নাকি আবার ধ্যানযোগে তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছ। কিন্তু বঁধু! তুমি কি জাননা যে আমরা ধ্যান-ধারণাদির উপযুক্ত নহি। যাহাদের মন নিজ বশে থাকে তাহারাই ধ্যান-ধারণাদি করিতে সমর্থ, কিন্তু আমাদের মন ত আমাদের বশে নাই। যমুনার পুলিনে বাঁশী বাজিয়ে তুমি যে আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছ। আমাদের মন ত এখন তোমার কাছেই বাঁধা আছে। এই দেখনা, তোমা হইতে মনটা কাড়িয়া লইয়া বিষয়ে লাগাইবার জন্য আমরা কত চেষ্টা করি, কিন্তু কই, তাহা ত পারি না। ওগো নিঠুর! সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তুমি আমাদিগকে তোমার চরণ চিন্তা করিবার উপদেশ দিয়াছ। কিন্তু প্রাণ-বল্লভ! তুমি কি জান না যে তোমার প্রেমে আমরা এতই আত্মহারা হইয়া আছি যে আমাদের দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দতার কথা যে আমাদের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় না। আমরা যে দেহাদির মার্জ্জন-ভূষণাদি করিয়া থাকি, তাহা একমাত্র তোমার সুখের জন্য। যাহারা তোমা বিনা নিজেদের দেহ পর্য্যন্তও জানে না, তাহাদের আবার সংসার কোথায় যে তাহা হইতে তাহারা উদ্ধার লাভ করিবে। ওগো চিরনবীন! সদাই আমাদের মনে পড়ে সেই বৃন্দাবনের কথা, সেই গিরি গোবর্দ্ধনের কথা, সেই যমুনা পুলিনের কথা, সেই রাসাদি লীলার কথা। এত আদরের, এত ভালবাসার জিনিষগুলি তুমি এত

শীঘ্র ভুলিলে কিরূপে? না, না, এতে তো তোমার কোনও দোষ নাই। আমার এই পোড়া অদৃষ্টের দোষেই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে। ওগো প্রিয়তম! তোমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু বঁধু! আমরা যদি মরিয়া যাই, আর আমাদের মরণ কথা শুনিয়া তুমি যদি না বাঁচ—তাহা হইলে মরণেও যে আমাদের জ্বালা জুড়াইবে না, বরং তাহা আরও বাড়িয়া যাইবে। তাই আমরা অতি কষ্টে এখনও প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এইরূপে আমাদিগকে নিরাশ্রয় অবস্থায় আনিয়া উদাসীনতা প্রকাশ করা কি তোমার উচিত হইয়াছে?" অতঃপর প্রভু নীরব হইলেন, চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিতে লাগিল।

প্রভুর ভাব-বারিধির অবধি নাই। রামানন্দ রায়ের শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটক হইতে জানা যায়—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে দূর হইতে পরস্পরকে দর্শন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শ্রীরাধা প্রেমপত্রী পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেম প্রার্থনা করেন। পত্রীপাঠে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও, চতুরশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। দূতীমুখে তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীরাধার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শ্রীরাধার এই সময়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু একদিন বিহ্বল অন্তরে বলিতে লাগিলেন—"প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অতি শঠ, তাই তিনি প্রেমবিচ্ছেদের দুঃখ অবগত নহেন, তাই তিনি তাঁহার মনমজান রূপে মুগ্ধ করিয়া আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন। হায় হায়! বিধাতা যে আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখিয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাকে পোড়াইয়া মারে, আমার প্রাণবঁধুও তেমনি স্বীয় রূপ গুণাদি দ্বারা আমাকে মুগ্ধ করিয়া দুঃসহ বিরহানলে এখন দগ্ধ করিতেছেন। হায় হায়! আমার অদৃষ্টে একি হইল? প্রাণবল্লভ কর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও

কেন যে আমি এখনও জীবিত আছি, তাহা জানি না। সখি! এখন আমি কি করি? তিনি আমাকে উপেক্ষা করিলেও আমি যে তাঁহাকে, এমন কি তাঁহার স্মৃতিকে পর্য্যন্ত, ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। প্রাণবল্লভ যদি আমাকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগই করিলেন, তবে আর আমার বাঁচিয়া লাভ কি? কিন্তু সখি! মরণেও তো আমি তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণবল্লভকে যদি নাই পাইলাম, তবে তোমরা এক কাজ করিও সখি! তমালতরু তো তাঁহারই মতন কালো। আমি মরিলে আমার এই দুই বাহুলতা তমালের ডালে এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিও, যাহাতে আমার এই দেহ তমালের দেহকে আলিঙ্গন করিয়া চিরদিন এই মধুর বৃন্দাবনে থাকিতে পারে। হায় হায়! সুখের আশায় প্রেম করিলাম, তাহাই এখন দুঃখের কারণ হইল। সখি! শ্রীকৃষ্ণবিহনে আমার প্রাণ যে আর থাকে না। প্রাণ-বল্লভকে দেখাইয়া তোমরা আমার প্রাণ বাচাও।" এইরূপ বলিয়া প্রভু নিজ করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া শ্যামসুন্দরের অপরূপ রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিতে লাগিল।

শ্যামরূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রভুর চিত্তে নবজলধর শ্যামসুন্দরের স্ফূর্ত্তি হইলে, শ্যাম নটবরের অনির্ব্বচনীয় রূপাদির মাধুর্য্যে প্রভু মোহিত হইলেন। শ্যামের রূপ-রসাদি পঞ্চগুণ যেন যুগপৎ স্ফুরিত হইয়া প্রভুর চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তদবস্থায় প্রভু বলিতে লাগিলেন—"সখি! দেখ দেখ, আমার প্রাণবঁধুর রূপ-রসাদির অনুপম মাধুর্য্য আস্বা-দনের নিমিত্ত আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ই যে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। এই দেখ, আমার চক্ষুদ্বয় তাঁহার রূপমাধুর্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত, কর্ণদ্বয় তাঁহার অমিয়মাখা কণ্ঠস্বর ও বেণুধ্বনি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, নাসিকাদ্বয় তাঁহার অঙ্গ-সৌরভামৃত অনুভব করিবার নিমিত্ত, রসনা তাঁহার অধরামৃত পান করিবার নিমিত্ত এবং আমার সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার কোটীন্দুশীতল

অঙ্গস্পর্শের জন্ম নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আবার দেখ, মন ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ভোগ করিতে পারে না বলিয়া, আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই মনরূপ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া একই কালে পাঁচদিকে নিজ নিজ বিষয়ের দিকে ছুটিতেছে। সখি! আমার মন ত সবে একটী। পাঁচ জনে যদি তাহাকে একই কালে পাঁচদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তবে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হয় বল দেখি। এখন আমি করি কি? আমি যে আর এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না। এখন যে আমি প্রাণে মরি সখি!" ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া প্রভু আবার বলিলেন—"সখি! ইন্দ্রিয়গণেরই বা দোষ কি? সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথ স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরের রূপাদির মাধুর্য্যে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ না হইয়া কে-ই বা স্থির থাকিতে পারে?" অতঃপর প্রভু স্বরূপ ও রাম-রায়ের গলা জড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"হায় হায়! এখন আমি কি করি, কোথায় যাই?"

প্রভুর মনে নানাভাবের উদয় হইতেছে, আর তিনি ভাব-তরঙ্গে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছেন। বৃষভানুনন্দিনী রাধারাণীর আবেশে প্রভু বলিতে লাগিলেন—"সখি! আমার শ্যামদর্শনের সাধ এখনও যে মিটে নাই। বেণুবাদনরত শ্যামসুন্দর যখন মনোহর নটবর-বেশে সজ্জিত হইয়া আমাকে পরমানন্দ দান করিবার জন্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, বদনে মুরলী, কপোলে অলকা, কর্ণদ্বয়ে উৎপল, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা এবং বদনকমলে মৃদু মধুর হাস্য শোভা পাইতেছিল। সখি! আমার এমনই দুর্ভাগ্য, প্রাণ-বঁধুর যখন দর্শন পাইলাম তখন আনন্দ আর মদন শত্রু হইয়া আমার মনকে হরণ করিল। তাই আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি নাই। আবার যদি আমি ক্ষণকালের জন্যও প্রাণবল্লভের দর্শন পাই, তাহা হইলে আমি নয়নপথে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া তাঁহার

প্রতি অঙ্গের মধুর ছবি আমার হৃদয়পটে দৃঢ়ভাবে আঁকিয়া রাখিব।” অতঃপর প্রভু ধীরগম্ভীরভাবে প্রেমের ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

ক্ষণপরে প্রভু আবার বলিতে লাগিলেন—“মদনমোহন শ্যামনাগরের দেহকান্তি নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর, তাঁহার মুরলীশোভিত মনোহর বদনখানি অকলঙ্ক শরচ্চন্দ্র অপেক্ষাও তৃপ্তিদায়ক। সখি! সেই শিখি-পুচ্ছ বিভূষিত কোটি মন্মথমোহনের অপরূপ রূপ দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা, সেই ব্রজবিহারী মুরলীধারীর সুমধুর বাণী ও মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণেই কর্ণের সার্থকতা, সেই নবকিশোর শ্যামনটবরের উন্মাদক অঙ্গগন্ধের আঘ্রাণেই নাসিকার সার্থকতা, বংশীধারী রাসবিহারীর অধরামৃতের আস্বাদন গ্রহণেই জিহ্বার সার্থকতা, আর সেই রসিকশেখর পুরুষরতনের কোটীন্দুশীতল শ্রীঅঙ্গের স্পর্শনেই ত্বগিন্দ্রিয়ের সার্থকতা।” প্রভুর মনে হইল যেন তিনি এইভাবে নিজ ইন্দ্রিয়বর্গের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। দৈন্যবশতঃ এইরূপ মনে করিয়া প্রভু আর্ত্তি সহকারে বলিতে লাগিলেন—“হায় হায়! **সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা** আমি আমার প্রাণ-বঁধুর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলাম না। সে কারণে আমার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি সকলই, এমন কি আমার জীবন পর্য্যন্ত, ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যদি আমি তাঁহার সেবা করিতে না পারিলাম, তবে তাহাদের থাকা বা না থাকা উভয়ই আমার পক্ষে সমান। শুষ্ক কাষ্ঠভার সদৃশ আমার এই ইন্দ্রিয়গণকে আমি বৃথাই বহন করিতেছি।”

একদিন প্রভু মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া নিজ দৈন্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—“মনুষ্য-লোকে স্বসুখবাসনা বিহীন **অকপট কৃষ্ণ প্রেম** হয় না। যদি বা দুই এক জনের ভাগ্যে তাহা সম্ভব হয়, তবে তাহার বিরহ হয় না। আর যদি বা বিরহ হয়, তবে সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না। আহা! আমার যদি সেরূপ সৌভাগ্যই হইত, শ্রীকৃষ্ণে

যদি আমার অকৈতব প্রেম থাকিত, তবে তাঁহার সহিত অবশ্যই আমার মিলন হইত, কখনও বিরহ হইত না। আর যদি বিরহ হইত, তবে আমি কখনও প্রাণে বাঁচিতাম না। হায় হায়! প্রাণবঁধুর সহিত আমার মিলন হইল না, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই শ্রীকৃষ্ণচরণে আমার প্রেম জন্মায় নাই—অকপট প্রেম তো দূরের কথা, কপট প্রেমও আমাতে নাই। তবে যে আমার এই কপট ক্রন্দন, তাহা কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, তাহা কেবল স্বসৌভাগ্য-প্রকাশের জন্য, প্রেম জন্য নহে। সুনির্ম্মল এই কৃষ্ণপ্রেম অমৃতের সিন্ধু. স্বসুখবাসনাবিহীন বিশুদ্ধ হৃদয়েই তাহা প্রকাশ পায়। সেই প্রেম-সিন্ধুর এক বিন্দু পান করিলে জীব প্রেমানন্দে পাগল হইয়া যায়, চিরতরে তাহার জীবন ধন্য হয়। হায় হায়! আমি কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী নহি। সখি! কৃষ্ণ-প্রেমের অভাবে আমার জীবন পর্য্যন্ত বৃথা হইয়া গেল। কেবল আত্মসুখের জন্য আমি আমার এই ছার জীবন ধারণ করিতেছি। আমার এই ঘৃণিত জীবনে ধিক।" এইরূপে প্রভুর চিত্ত মথিত হইতে লাগিল।

রাধাভাবের আবেশে প্রভু একদিন ব্রজের মধুর রসে নিমগ্ন আছেন। নয়নধারার যেন বিরাম নাই। স্বরূপ ও রামানন্দ রায় নীরবে প্রভুর সম্মুখে বসিয়া আছেন। একটী প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। শ্যামনাগরের চিন্তায় প্রভু বিভোর হইয়া আছেন। তখন প্রভুর একেবারেই **অন্তর্দ্দশা,** বাহ্যজগতের সহিত যেন কোনও সম্বন্ধ নাই। কিছুক্ষণ পরে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, **অর্দ্ধবাহ্যদশা** ফিরিয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিরহানল জ্বলিয়া উঠিল। অর্দ্ধবাহ্যদশায় অন্তর্দ্দশার ঘোর সম্পূর্ণরূপে কাটে না, **বাহ্যদশার** সহজ জ্ঞানও তখন থাকে না। তখন সামান্য বাহ্যজ্ঞান হয়, যাহাতে বাহিরের লোকের কথা শুনিতে

পাওয়া যায়। তখন মনে হয় যেন অন্তর্দ্দশায় দৃষ্ট কোন ব্যক্তি ঐরূপ কথা বলিতেছেন। অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রভু কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে প্রলাপ বাক্যাদি বলেন এবং স্বরূপ ও রাম রায়কে ললিতা ও বিশাখা বলিয়া মনে করেন। দিবারাত্রির মধ্যে অতি অল্পক্ষণই প্রভু পরিস্ফুট বাহ্যদশায় থাকিতেন। সেই সময়ে প্রভুর স্নানাহারের ব্যবস্থা করা হইত। এইভাবে অনিয়মে প্রভুর শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তখন—"সহচর সঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া। চলিতে না পারে থেনে, পড়ে মূরছিয়া॥ অতি দুরবল দেহ, ধরণে না যায়। ক্ষিতি-তলে পড়ি, সহচর মুখ চায়॥" প্রভুর এইরূপ অবস্থা স্মরণ করিয়া ভক্ত কবি খেদ সহকারে বলিয়াছেন— "গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ। বিরহক তাপে, লুঠত সতত মহি, নিরবধি ঝরয়ে নয়ান॥ কাঞ্চন বরণ, মলিন হেন হেরইতে, মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়। কহ সেই যুকতি, যাহে পুন গৌরক, বিরহক তাপ পলায়॥"

জীবকে ব্রজের মধুর লীলারস আস্বাদনের উপায় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু কখন কখন **সখী বা মঞ্জরী ভাবেও** আবিষ্ট হইতেন। শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা সখী বা মঞ্জরীগণের ভাব শ্রীরাধা-ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সখী মঞ্জরীর ভাব লইয়াই রাধা-কৃষ্ণ-লীলার পূর্ণতা।

স্নিগ্ধ শারদচন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে প্রভু নিজগণ সহ উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন এবং রাসলীলার শ্লোক কখন নিজেই পাঠ করিতেন, কখন বা অন্যের মুখে শ্রবণ করিতেন। সেই সময়ে প্রভু কখন প্রেমাবেশে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিতেন, কখন বা ভাবাবেশে রাসলীলার অনুকরণ করিতেন, কখন বা এদিক ওদিক ছুটিয়া যাইতেন. আবার কখন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতেন। এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু একদিন দূর হইতে সমুদ্র দেখিতে পাইয়া অন্যের অলক্ষিতে দৌড়িয়া গিয়া যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সমুদ্র-তরঙ্গের সহিত ডুবিতে ভাসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হয় যেন একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ তরঙ্গের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। সেই সময়ে প্রভুর মনে শ্রীকৃষ্ণের জলবিহার-লীলার স্ফূর্ত্তি হইল। ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যেন যমুনাজলে বিহার করিতেছেন—**মঞ্জরী-ভাবের আবেশে** প্রভু মূর্চ্ছাচ্ছলে সেই রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। প্রভুর সংজ্ঞাহীন দেহ ধীবরের জালে পড়িলে সেই দেহ-স্পর্শে ধীবর প্রেমাবিষ্ট হয়েন। ক্রমে স্বরূপাদি ভক্তগণ অন্বেষণ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুর চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নাম শুনিতে শুনিতে প্রভুর চৈতন্য হইল। তখনও তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যদশা। তদবস্থায় প্রভু বলিতে লাগিলেন—"আমি কালিন্দীতীরে যাইয়া দেখি, গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ জলবিহার করিতেছেন। একজন সখী (মঞ্জরী) আমাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন।" এই বলিয়া প্রভু জলবিহার-রঙ্গ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। (চৈঃ চঃ ৩।১৮।৮০-১০৬ দেখ)। ক্রমে প্রভুর বাহ্যদশা ফিরিয়া আসিল। তখন স্বরূপ গোসাঞিকে চিনিতে পারিয়া প্রভু তাঁহাকে সমুদ্রতীরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোসাঞি তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। অতঃপর সকলে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন প্রভু সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এক পুষ্পের উদ্যান দর্শন করিয়া প্রভুর মনে হইল যেন সেটী পুষ্প কাননময় শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দাবনবোধে প্রভু তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাসোৎসবে রাসেশ্বরীর সহিত রাসবিহারী অন্তর্দ্ধান করিলে **সখীগণ** যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৩০।৫-১৩), প্রভুও সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারেই ছিল না :

সম্মুখে আম্র-পনসাদি বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, **কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা সখীগণের ভাবাবেশে** প্রভু প্রতি বৃক্ষের নিকটে যাইয়া প্রেমাশ্রুনয়নে অতি কাতরভাবে বলিলেন—"হে বৃক্ষ! পরোপকারের জন্যই তোমাদের জন্ম। তোমরা আমার কিঞ্চিৎ উপকার কর। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন বলিয়া দাও, আমার প্রাণ বাঁচাও।" বৃক্ষগণ অবশ্য প্রভুর কথার উত্তর দিল না। কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভু অনুমান করিলেন—ইহারা পুরুষ জাতি, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ইহাদের কঠিন প্রাণ, ইহারা আমার প্রাণের ব্যথা বুঝিবে না। বৃক্ষ যে কথা কহিতে পারে না, দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া প্রভু তাহা মনে করিতে পারিলেন না। প্রভু তখন ব্রজভাবে বিভোর, সখীভাবে তিনি আপনাকে স্ত্রীলোক বলিয়াই মনে করিতেছেন। অতঃপর তুলসী, মালতি, যূথী প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় প্রভু ভাবিতেছেন—"ইহারা ত স্ত্রীজাতি। ইহারা স্ত্রীলোকের দুঃখ নিশ্চয়ই বুঝিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান নিশ্চয়ই বলিয়া দিবে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রভু প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া সাশ্রুনয়নে গদগদভাবে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। তোমাদের প্রিয় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকটে আসিয়া মধুর করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়াছেন। তোমরা সকলে আমার সখীর তুল্য। শ্রীকৃষ্ণ কোন দিকে গিয়াছেন বলিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রভু কাণখাড়া করিয়া প্রত্যেকের নিকটে কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে লাগিলেন। কাহারও নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভু ভাবিলেন—ইহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের দাসী, তাই শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ইহারা আমাকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে না।

এমন সময়ে প্রভু সম্মুখে কয়েকটী হরিণী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের দৃষ্টি প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া প্রভু অনুমান

করিলেন—ইহাদের নিশ্চয়ই কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে তাই ইহাদের দৃষ্টি সুপ্রসন্ন। সেই সময়ে উদ্যান-পুষ্পের সৌরভ অনুভব করিয়া প্রভু মনে করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ। এখন প্রভুর মনে আশার সঞ্চার হইল। হরিণীগণকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন—"হে মৃগি! শ্রীকৃষ্ণ কি তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সুখ দিতে এখানে আসিয়াছিলেন? দূর হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাইয়াছি। আমরা শ্রীরাধার প্রিয়সখী। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধাদি কিরূপ, তাহা আমরা বিশেষরূপেই জানি। শ্রীকৃষ্ণ এদিকে আসেন নাই, একথা বলিলে আর চলিবে না। তিনি কোন্ দিকে গিয়াছেন বলিয়া দাও।" এই বলিয়া প্রভু উৎকর্ণ হইয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হরিণীগণ অবশ্য ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া প্রভু হতাশ মনে ভাবিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই ইহারাও কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া আছে। সে কারণে, ইহারা আমার কথা শুনিতে পায় নাই, আমার কথার উত্তর দিবে কিরূপে?"

এইরূপে প্রভু সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিতেছে না দেখিয়া প্রভু ব্যথিত হৃদয়ে যমুনাভ্রমে সমুদ্রের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে একটী কদম্ববৃক্ষ ছিল। কদম্বতলে প্রভু যেন মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনের আবির্ভাব দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার কোটি মন্মথমোহন রূপলাবণ্য দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া সযত্নে প্রভুর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। চেতনা পাইয়া প্রভু উঠিয়া বসিলেন এবং ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন। তখনও প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশা। প্রেমাবেশে প্রভু বলিতে লাগিলেন—"মুরলীবদনকে এই দেখিলাম, আর কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। অপরূপ রূপমাধুর্য্যে

আমার নয়ন-মন হরণ করিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন?” এইরূপ বলিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরে প্রভু ঈষৎবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপগোসাঞিকে বলিলেন —“স্বরূপ! একটী গান কর, যাহাতে আমার চিত্ত সুস্থ হইতে পারে।” প্রভুর আদেশে স্বরূপ **গীতগোবিন্দের** (২।২) একটী পদ গান করিলেন—“রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং। স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসং।” রাসেশ্বরী শ্রীরাধা বিশাখা সখীকে বলিতেছেন—শারদীয় রাসোৎসবে যিনি বিবিধরূপে লীলাকৌতুক করিয়াছিলেন, পরিহাসপটু সেই রাসবিহারী ব্রজরাজকে আমার মন স্মরণ করিতেছে। স্বরূপের গান শুনিয়া রাসরসনায়িকা শ্রীরাধার আবেশে প্রভু রাস-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর আদেশে স্বরূপ এক একটী পদ গান করেন, আর প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তখন অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রকটিত হইতে লাগিল। প্রভুর শ্রম হইতেছে বুঝিয়া স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর আদেশ সত্ত্বেও গান বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন রামানন্দ রায় প্রভুকে নিকটে বসাইয়া ব্যজন দ্বারা তাঁহার শ্রম দূর করিলেন। অতঃপর সকলে মিলিয়া প্রভুকে সমুদ্রে স্নান করাইয়া বাসায় লইয়া আসিলেন এবং ভোজনান্তে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

ভাবনিধি গৌরসুন্দরের ভাবতরঙ্গের অবধি নাই। সাগরতরঙ্গের ন্যায় শত শত ভাবতরঙ্গ তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়া উথলিয়া উঠে, কখন আবার বিবিধ ভাবতরঙ্গের প্রতিঘাতও দেখা যায়। একদিন প্রভু গম্ভীরা মধ্যে নীরবে বসিয়া আছেন, পলকশূন্য নয়নের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া প্রভু কাঁদিয়া উঠিতেছেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। কতক্ষণ পরে প্রভু গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—“সখি! আর ত' সহ্য হয় না। দেখ, মদনের ত' শরীর নাই, তবু সে অবলা দুর্ব্বলার উপর অত্যাচার করিতে কেমন পটু। আর

তার পঞ্চবাণের কি অদ্ভুত গুণ—ইহারা একেবারে প্রাণে মারে না, দেহটাকে জরজর করিয়া অর্দ্ধমৃতের ন্যায় করিয়া ফেলে।” অকস্মাৎ তাঁহার মনে বেণুবাদনরত প্রাণবল্লভের বেণুর কথা উদিত হইল। কৃষ্ণাধর-স্পর্শের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রভু আক্ষেপ সহকারে বলিলেন,—“সখি! প্রাণহীন **শুষ্ককাষ্ঠনির্ম্মিত বেণুর** কি সৌভাগ্য দেখ। সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও সে কোন্ তপস্যার ফলে শ্যামসুন্দরের অধর সুধা পান করিবার অধিকার লাভ করিল? আহা! তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ তপস্যা করিয়া কৃষ্ণাধরসুধা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতাম।” অতঃপর প্রভু অন্তরের বেদনা প্রকাশ করিয়া বিষণ্ণবদনে বলিতে লাগিলেন—“হায় হায়! মদনমোহন শ্যামনটবরে অপরূপ **রূপরাশি** কেন দেখিলাম? সব ভুলিয়া ঐরূপ সাগরে কেন ডুবিলাম? কেনই বা নিজেকে তাঁহার পায়ে একেবারে বিকাইয়া দিলাম? সখি! কবে আবার তাঁহার সুমধুর বাক্যসুধা পান করিয়া হৃদয়ের বিষজ্বালা জুড়াইব? কবেই বা তাঁহার কোটীন্দুশীতল শ্যাম-অঙ্গ নিজ অঙ্গ মিশাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিব?” প্রভুর মুখে আর কোনও কথা নাই। প্রেমের ধ্যানে বিভোর হইয়া প্রভু বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত হইতেছে। ভাবাবেশে প্রভু কখন উঠিয়া দাঁড়ান, কখন বা কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়েন। প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। অস্থির চিত্তে রোদন করিতে করিতে প্রভু বলিলেন—“হা হা প্রাণপ্রিয় সখি, কিনা কৈল মোরে। কানু প্রেমবিষে মোর তনু-মন জারে। রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ। যাহাঁ গেলে কানু পাঙ, তাহাঁ উড়ি যাঙ॥” (চৈঃ চঃ ২।৩।১২১-২)। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া স্বরূপ দামোদর ব্যথিত অন্তরে তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক বক্ষে ধরিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, আর রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া প্রভুর চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রভু বিরহবিধুরা শ্রীরাধার আবেশে বলিতে লাগিলেন—"এ আমার কি হ'ল? শ্যামনাগর যে আমার মনপ্রাণ সমস্তই হরণ করিয়াছেন। আমার মন আর আমার বশে নাই। শ্রীকৃষ্ণবিরহে সে এখন এতই চঞ্চল যে আমি আর আমার হৃদয়বল্লভকে পাইবার উপায় চিন্তা করিতে পারিতেছি না। আর তোমাদের অবস্থাও তো আমারই মত। এখন আমি কি করি? কে আমাকে আমার প্রাণবঁধুকে পাইবার উপায় বলিয়া দিবে? আমার প্রাণ যে আর বাঁচে না সখি!" এই সময়ে, বিদেহ নগরের বারবণিতা পিঙ্গলার কথা তাঁহার মনে পড়িল। বারনারী পিঙ্গলা সারারাত্রি নাগরের অপেক্ষায় থাকিয়া, উৎকণ্ঠার প্রবল তাড়নে, অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিল। শেষে নাগর-প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিয়া স্বৈরিণী পিঙ্গলা মনে শান্তি লাভ করে। "আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন"—মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া প্রভু বলিলেন—"সখি! কৃষ্ণ-কথা আর আমি চিন্তা করিব না কৃষ্ণ হইতে আমার মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তাহাকে বিষয়াদিতে নিয়োগ করিব। দেখি, তাতে যদি মনে শান্তি পাই। সখি! আমার দুঃখের কথা আর কি বলিব. আমার রসনাই আমার প্রতি বাম। এই দেখ না,—যাহার নাম লইব না মনে করিতেছি, আমার রসনা তাহারই নাম লইবে। শুধু রসনা কেন, আমার সকল ইন্দ্রিয়ই আমার পরম শত্রু। আমার চরণ দুটী সদাই কানু-পথে যাইতে চায়, নাসিকা বন্ধ করিয়া রাখিলেও সে সর্বক্ষণ শ্যামসুন্দরের অঙ্গগন্ধ অনুভব করে। কর্ণের কথা আর কি বলিব—কৃষ্ণকথা ও বেণুধ্বনি শুনিতে সে সদাই উৎসুক হইয়া আছে। এখন আমি করি কি? তোমরা আমার প্রিয় সখী। তোমাদের নিকট আমার এই অনুরোধ, কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কোন কথা তোমরা আর আমার নিকটে বলিও না। কৃষ্ণকথা শুনিলেই কৃষ্ণকে মনে পড়িবে, আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণ-বিরহ শত-ধারায় উথলিয়া উঠিবে।" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রভুর চিত্তে

শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি হইল, চিত্তের মধ্যে তিনি যেন তাঁহার প্রাণবল্লভকে দেখিতে পাইলেন।

চিত্ত মধ্যে প্রাণবল্লভকে দর্শন করিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন—"হায় হায়! আমি যাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করিয়াছি, সে যে আমারই চিত্তে শয়ন করিয়া আছে। হায় হায়! আমার মনও আমার বশে নাই, নিষেধ করিলেও সে আমার কথা শুনে না। এখন আমি করি কি?" নিজ মনকে বশীভূত করিতে না পারিয়া প্রভু বলিলেন—"হায় হায়! আমি যাহাকে ভুলিতে চাই, আমার মন যে তাহারই সঙ্গ করিতে চায়। তাহাকে ছাড়িয়া আমার মন যে একমুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না। ধিক আমার এই মন কে।" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রভুর দৃষ্টি স্বীয় চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অপরূপ রূপমাধুর্য্যের উপর পড়িল। রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রভু বলিলেন—"না-না, বৃথা আমি আমার মনকে ধিক্কার দিয়া তিরস্কার করিতেছি। এমন সুন্দর মুখে অমিয়মাখা মধুর হাসি দেখিয়া কে-ই বা অবিচলিতভাবে থাকিতে পারে?" প্রভুর হৃদয়ে অনুরাগ-সমুদ্রের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। ক্ষণপরেই তিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন—"হে আমার প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দর! তুমিই বলিয়া দাও, কিরূপে আমি তোমাকে পাইব, কোথায় গেলে আমার হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইবে।" এই বলিয়া প্রভু সেই পরমানন্দঘন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে কিছুক্ষণ মগ্ন থাকিয়া কম্পিত হৃদয়ে প্রভু বলিতে লাগিলেন—"কি কুক্ষণে নিষ্ঠুর বিশাখা চিত্রপটে আঁকিয়া শ্যামসুন্দরের মনোহর রূপ আমাকে দেখাইল। সেইদিন হইতে যে আমি আপনাকে তাঁহার পায়ে বিকাইয়া দিয়াছি। সখি! এখন আমি আর আমাতে নাই। আহা, মরি-মরি, শ্যামসুন্দরের কি বিশ্ববিমোহন অপরূপ রূপ,

তাঁহার বিনোদবদনে কেমন অমিয়মাখা মৃদু মধুর হাসি। শ্যামসুন্দরকে না পাইয়া আমার চিত্ত-চকোর যে পিপাসায় মরিতেছে। সখি! মান, লজ্জা, ভয় সব ত্যাগ করিয়া, শ্যামনাগরকে ভজিয়া, এ আমার কি হইল? মন-প্রাণ চুরী করিয়া পরাণবঁধু আমার এ কি করিলেন? এমন করিয়া আর কত কাল এ জ্বালা ভোগ করিব? সখি! শ্যামরূপ না দেখিয়া, শ্যামনাম না শুনিয়া যে ছিলাম ভাল। এখন মদনমোহন শ্যামসুন্দরের মোহন মূরতি খানি, তাঁহার সহাস্যবদন ও সপ্রেম দৃষ্টি, সদাই আমার মনে জাগে আর তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণটা আমার অস্থির হইয়া উঠে। সখি! মধুর শ্যামনাম আমার বুদ্ধিকে বিলোপ করিয়াছে। শ্যামরায়কে ভুলিবার জন্য আমি কত চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারি না। অমিয়-মধুর শ্যামনামের এমনই অদ্ভুত গুণ, শ্যামনাম আমার হৃদয়ে এতই আনন্দ দান করে, যে বদন আমার কিছুতেই তাহা ছাড়িতে পারিতেছে না। সখি! এই **শ্যামনামই** এখন আমার একমাত্র সম্বল।" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রভু যেন শ্যামের পিরীতি-রসে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইল, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইতে লাগিল। তখন স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে সযত্নে বক্ষে ধরিয়া ভাবানুকূল পদ গাহিলেন—

"সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে ॥ নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়। যেখানে বসতি তার, নয়নে হেরিব গো, যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ পাসরিতে চাহি মনে, পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়। কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুলনাশে, আপনার যৌবন যাচায় ॥"

প্রেমরসনিধি শ্যামসুন্দরের মনোহর শ্যামরূপ দর্শনের জন্য প্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। সচকিত নয়নে ব্যাকুল প্রাণে তিনি ইতি উতি চাহিতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। সময় যেন আর কাটে না। প্রাণবঁধুর অদর্শনে কাতর হইয়া হাহুতাশ করিতে করিতে প্রভু রাধাভাবের আবেশে বলিতেছেন—"কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥ কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥" (চৈঃ চঃ ২।২।১৪-৫)। প্রভুকে সান্ত্বনা দিয়া রামরায় বলিলেন—"প্রভু! ধৈর্য্য ধরুন, এত অধীর হইবেন না।" তাহা শুনিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন—"সখি! যদি তুমি আমার মনের দুঃখ বুঝিতে, তবে ধৈর্য্য ধরিবার জন্য আমাকে বৃথা উপদেশ দিতে না। নারীর মনোহারী **যৌবনই** রসিকশেখর শ্যামনাগরের সুখের হেতু। তাহা তো আর চিরস্থায়ী নয়। আমার পরাণবঁধু যখন আসিবেন, তখন যদি আমার যৌবন না থাকে, তবে কি দিয়া আমি তাঁহাকে সুখী করিব? তখন সখি! আমার কি গতি হইবে?"

ক্ষণপরে প্রভুর হৃদয়াকাশে অন্যভাবের তরঙ্গ উঠিল। রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর মনে হইল, যেন শ্যামনাগর এখনই তাঁহার নিকটে আসিবেন। নাগরবরের আগমন নিশ্চয় করিয়া প্রভু ব্যাকুলকণ্ঠে **বাসকসজ্জা** (পৃঃ ১৮৪) করিতে বলিলেন। প্রভু সগাম্ভে বলিতেছেন—"সখি! নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পুষ্প দ্বারা রতিক্রীড়ার উপযুক্ত শয্যা ও মালা রচনা কর। কর্পূর-বাসিত সুশীতল জল এবং পুষ্প-মালা-চন্দন-তাম্বুলাদি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখ।" অতঃপর প্রভু স্বীয় দেহ সন্দর্শন করিতে করিতে আবার বলিলেন—"সখি! আমাকে আর সাজাতে হবেনা। দেখ, আমি সর্ব্বাঙ্গে কত ভূষণ পরিয়াছি।" শ্যামগরবিনী শ্রীমতীর আবেশে প্রভু নিজাঙ্গ লীলায়িত

করিয়া বলিতে লাগিলেন —"কানু পরশমণি আমার। আমি পরেছি শ্যাম নামের হার ॥ বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণ গান। হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন ॥ কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ। নয়নের ভূষণ আমার সেরূপ দরশন ॥ যদি তোরা সাজাবি মোরে। কৃষ্ণনাম লিখ মোর অঙ্গ ভরে ॥"

বাসকসজ্জা করিয়া, রাধাভাবের আবেশে প্রভু মনে মনে কত কল্পনা করিতেছেন। প্রভু ভাবিতেছেন—প্রাণবঁধু আসিলে তিনি কি করিবেন। রসিকা নাগরীর ন্যায় তিনি যেন মনে মনে স্থির করিলেন—"অঙ্গণে আওয়াব যব রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥" এইরূপ স্থির করিয়া প্রভু নাগরবরের আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুকচিত্তে দ্বারদেশে তাকাইয়া আছেন। প্রাণবঁধুর আসিতে বিলম্ব হইতেছে মনে করিয়া শ্যামবিরহিনী শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত প্রভুর মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। দারুণ **উৎকণ্ঠায়** প্রভু কম্পিত কণ্ঠে বলিতেছেন—"সখি! দেখে এস শ্যামনাগর আসিল কিনা?" কোনও শব্দ হইলেই প্রভু ভাবিতেছেন—এই বুঝি শ্যামনাগর আসিলেন। শ্যামসুন্দরের পথ চাহিয়া প্রভু বসিয়া আছেন, তাঁহার দুই নয়নে বিরামহীন বারি ঝুরিতেছে। উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রভু ভাবিতেছেন - পরাণবঁধু এখনও কেন আসিলেন না। কিছুই যেন তিনি অনুমান করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া প্রভু বিষণ্ণভাবে গদ গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"সখি! রাত্রি ত অনেক হইল, নিঠুর কপট শ্যাম বুঝি আর এলেন না। তোমরা বলত, এরূপ শঠ লম্পটের সহিত কি কেউ প্রেম করে?" আকুল উৎকণ্ঠায় প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ক্ষণ পরিমিত কালও যেন কল্পের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছে। রাধাভাবের আবেশে প্রভু **বিপ্রলব্ধা** (পৃঃ ১৮৫) নায়িকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্যথিতচিত্তে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, আর চঞ্চল

নেত্রে ইতিউতি তাকাইতেছেন। কান্তের অনাগমনে ব্যথিত হইয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন —"আমার কঠিন প্রাণ যে এখনও কি সুখে রহিয়াছে, তাহা তো জানি না। সখি! এ পোড়া প্রাণ আর আমি রাখিব না। গরল পান করিয়া বা অনলে প্রবেশ করিয়া আমি আমার এই কঠোর প্রাণ ত্যাগ করিব"।

শ্যামনাগরের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর মনে হইল, ঐ বুঝি প্রাণ-বল্লভ আসিতেছেন। দূর হইতে ভাবাবেশে অকস্মাৎ নিজ দয়িতকে দর্শন করিয়া কন্দর্পভ্রমে প্রভু বলিতেছেন—"সখি! দেখ দেখ, ঐ বুঝি কামদেব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিবার জন্য এখানে আসিতেছেন।" এক দৃষ্টিতে প্রভু সেই দিকে তাকাইয়া আছেন। ক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন—"না না, ইনি তো কামদেব নহেন, কামদেবের কান্তি ত এত মধুর হয় না। তবে কি মধুর জ্যোতিরাশি দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এখানে আসিতেছেন?" অনিমেষ নয়নে প্রভু সেইদিকে তাকাইয়া আছেন। ক্ষণপরে প্রভু আবার বলিলেন—"না না, জ্যোতিরাশির ত এত চমৎকারিতা থাকে না। তবে কি ইনি মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য।" প্রভু যেন অনুভব করিলেন—তাঁহার মনে ও নয়নে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি জন্মিতেছে। তখন প্রভু বলিয়া উঠিলেন—"না, তাও ত নয়, কেবল মাধুর্য্যের দ্বারা নয়ন-মনের এত তৃপ্তি হয় না। তবে কি সাক্ষাৎ অমৃত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া প্রভু বলিলেন—"না না, ঐ যে কর-চরণাদিবিশিষ্ট অবয়ব দেখা যায়। অমৃতের ত অবয়ব থাকে না। **তবে ইনি কে?"** স্থির নেত্রে দেখিতে দেখিতে আনন্দের সহিত প্রভু বলিয়া উঠিলেন—"কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ আমি চিনিতে পারি নাই। ইনি যে আমারই নয়না-ভিরাম প্রাণবল্লভ, আমাকে আনন্দ দিবার জন্য আমার সম্মুখে উদয় হইয়াছেন।"

রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভু মনে করিতেছেন, যেন তাঁহার নব-কিশোর শ্যামনাগর ভুবন মোহন রূপরাশি লইয়া তাঁহারই **সম্মুখে উপস্থিত**। চির আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ের ধনকে পাইয়া প্রভুর গণ্ডদ্বয় প্রফুল্ল হইল। অনিমেষ নয়নে তিনি প্রাণের পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন। প্রভু যেন ভাবিতেছেন—"আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়লুঁ, পেখলু পিয়া মুখ চন্দা।" প্রভুর ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কাঁপিতেছে, যেন কিছু বলিবেন, কিন্তু কিছুতেই বাক্য স্ফুরণ হইতেছে না। অবস্থা বুঝিয়া স্বরূপ গোস্বামী গান ধরিলেন—"জনম অবধি হাম রূপ নিহারল, নয়ন না তিরপিত ভেল। সোই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুনল, শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥ কত মধু যামিনী, রভসে গমাওল, না বুঝল কৈছন কেলি। লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়া রাখল, তৈও হিয় জুড়ন না গেলি॥" (বিদ্যাপতির, কাহারও মতে কবিবল্লভের পদ)।

রাধাভাবের আবেশে বিভোর হইয়া প্রভু ব্রজের মধুর রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতেছেন। ক্ষণপরে প্রভুর চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। প্রভু মনে করিতেছেন, যেন তাঁহার দয়িতের সর্ব্বাঙ্গে অন্য রমণীর সহিত সম্ভোগের সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল বিরাজ করিতেছে। প্রেমানন্দে বিভোর থাকিয়া তিনি এতক্ষণ অন্য রমণীর ভোগচিহ্নগুলি লক্ষ্য করেন নাই। এখন তিনি দেখিলেন যেন রসিকেন্দ্রচূড়ামণির কপালে সিন্দূর বিন্দু, অধরে কজ্জলের রেখা, হিয়ার উপরে কঙ্কনের দাগ, তাঁহার নয়নযুগলও যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু। তদ্দর্শনে প্রভু শ্রীমতীর আবেশে **খণ্ডিতা** (পৃঃ ১৬৬) দশা প্রাপ্ত হইলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে প্রভু বক্রনেত্রে সুরতচিহ্নধারী বহুবল্লভ নাগরবরকে পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন—"মরি-মরি, তোমাকে এমন সুন্দর সাজে কে সাজালে? তোমার আদরিণীকে সঙ্গে করিয়া আন নাই কেন? আমার প্রতি তোমার অশেষ কৃপা। তাই দীর্ঘ-কাল পরে আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছ। তুমি যে আসিয়াছ, ইহাই

আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।” এইরূপ বলিয়া প্রভু অন্তরে মান (পৃঃ ১৯০) করিয়া অরুণ-বঙ্কিম নয়নে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

মানিনী শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভু মনে করিতেছেন—রসিক নাগর যেন প্রথমে ছলনা বাক্য দ্বারা তাঁহাকে কত বুঝাইলেন, মান ভাঙ্গাইতে যেন কত শত চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন, শেষে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা করার জন্য যেন কত অনুনয় বিনয় করিলেন। তাহাতেও মান ভাঙ্গিল না দেখিয়া শ্যামনাগর শ্যামসোহাগিনীর চরণযুগল ধরিয়া যেন কত সাধিলেন, যেন কত চোখের জল ফেলিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রভু মানিনী শ্রীরাধিকার আবেশে সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন—“হে রমণী-লম্পট! অন্য রমণীর সঙ্গ করিয়া তুমি বেশ করিয়াছ। হে ধৃষ্ট কালিয়া! আর কপট আলাপের প্রয়োজন নাই। তোমার আদ-রিনীর নিকটে যাইয়া তাহারই সন্তুষ্টিবিধান কর। আমার চরণে প্রণত হইলে কি হইবে? তুমি চপলের শিরোমণি, নানা ফুলের মধু পান করাই যে তোমার স্বভাব। এখানে অধিকক্ষণ থাকিলে তোমার চপল নামের কলঙ্ক হইবে। আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আর তুমি এখানে থাকিও না।

বিরহের ভাব তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু রাধাভাবের আবেশে মনে করিলেন—তাঁহার বক্রোক্তি শুনিয়া নাগরশেখর শ্যামসুন্দর নিরাশ হইয়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছেন। অমনি প্রেমের প্রবাহ মান রূপ বাধা দ্বারা বাধিত হইয়া শতধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। শ্যামনাগরকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া রাধাভাবের আবেশে প্রভু দৈন্যের সহিত বলিতে লাগিলেন—“এস, ফিরে এস, আমার জীবন সর্ব্বস্ব! আর আমি তোমার উপর মান করিব না। ওগো আমার প্রাণের দয়িত! তুমি করুণার সিন্ধু, দুঃখিত জনার বন্ধু। আমি তোমার চরণে শত অপরাধে

অপরাধী। নিজগুণে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ওগো নয়নাভিরাম! পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। আমি আমার জীবন যৌবন সকলই তোমার চরণে অর্পণ করিলাম।” অধীর হইয়া প্রভু ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভাবিতেছেন—সখীগণের সমক্ষে আমি আমার প্রাণবল্লভকে পরিত্যাগ করিয়াছি। বুঝি বা পরাণবঁধু আর এখানে আসিবেন না। দারুণ দুঃখে ও অনুতাপে পুড়িতে পুড়িতে প্রভু **কলহান্তরিতা** (পৃঃ ১৮৭) দশা প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু বলিতে লাগিলেন—“সখি! মানের দায়ে, মানের কদর বাড়াইতে গিয়া এ আমি কি করিলাম? কেন আমি আমার প্রাণবল্লভকে উপেক্ষা করিলাম? কেন আমি আমার প্রিয়তমকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় দিলাম? কেন আমি তাঁহার কাতর বচনে কর্ণপাত করি নাই? কেন আমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম? সখি! তোমরা তো এখানে ছিলে। আমি না হয় আমার প্রাণবঁধুকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছি। তোমরা কোন্ প্রাণে তাঁহাকে যাইতে দিলে? হায় হায়! আমি আমার প্রাণের প্রাণকে, আমার জীবনের সর্ব্বস্বধনকে হেলায় হারাইলাম। এখন আমার মন-প্রাণ তুষানলে দগ্ধ হইতেছে। সখি! আমার প্রাণবঁধুকে আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।” এইরূপ বলিয়া প্রভু স্বরূপ-রামরায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভুর মনের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত স্বরূপ গোসাঞি গান ধরিলেন—“আছিনু হাম অতি মানিনী ভই। ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥ কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ। কানু আওল তঁহি দোতিক সঙ্গ॥ ॥ হেরি হাম সচকিত আদর কেল॥ অবনত হেরি কোর পর নেল॥ সো তনু সরস পরশ যব ভেল। মানক গরব রসাতল গেল॥ নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ। বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ॥”

গান শুনিতে শুনিতে প্রভুর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি যেন তাঁহার হৃদয়বল্লভকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রভু বলিতেছেন—"প্রাণবঁধু! তুমি এসেছ। বহু কষ্টে জীবন ছিল, তাই আবার তোমার দর্শন পাইলাম।" অনিমেষ নয়নে প্রভু হৃদয়সর্ব্বস্বের প্রতি চাহিয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন—বিধাতা কেন তাঁহার অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিকে চক্ষু করিয়া দেন নাই। শ্যামনাগরের শ্যামরূপ দেখিয়া প্রভুর প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না। চক্ষুর নিমেষ-পতনের কালটুকু পর্য্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। বিধাতা নয়নের পলক দিয়াছেন বলিয়া বিধাতার নিন্দা করিয়া প্রভু বলিতেছেন—"কোটী নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই। তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই॥" (চৈঃ চঃ ১।৪।১৩২)।

সহসা প্রভুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইল। তিনি চাহিয়া আছেন বটে, কিন্তু বাহ্য বস্তু যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভুর এখন বাহ্যজ্ঞান নাই। **মাথুরবিরহ ভাবের আবেশে** তিনি মনে করিতেছেন, যেন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ফেলিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। বিরহবিহ্বলা শ্রীরাধার আবেশে প্রভু সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—"সখি! প্রাণবঁধু তো স্বচ্ছন্দে মথুরায় চলিয়া গেলেন। আমি যে আর বসন্তের সন্তাপ সহ্য করিতে পারিতেছি না। শ্যাম বিহনে মদন শরে আমার তনু জর জর। যাহাকে তিলেক না দেখিলে, শত শত যুগ দেখি নাই বলিয়া বোধ হয়, আমার সেই পরাণবঁধুকে ক্রূর অক্রূর আসিয়া নিয়ে গেলেন কেন? আমি এখন নিশ্চয় জানিলাম, বিধাতা আমাদের প্রতি বিরূপ। পোড়া বিধি! কেন তুই এখনও আমাদিগকে বাঁচিয়ে রেখেছিস্?" কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন—"ওরে বিধি! তুই বড় নিঠুর। তোর শরীরে দয়ার লেশ মাত্রও নাই। ওরে অকরুণ বিধি! মদনমোহন শ্যাম-

সুন্দরের অধরসুধা পান করাইয়া আশা মিটিতে না মিটিতেই তুই তাঁহাকে কাড়িয়া নিলি। এতে যে তোর দত্তাপহারিতা-পাপ জন্মিল, তাহাও তুই বুঝিলি না। বিধাতা বলিয়া কি তোর পাপের ভয়ও নাই। হায় বিধি! তুই প্রেমের মর্ম্ম কিছুই জানিস না। তাই তোর ব্যবস্থা সমস্তই প্রেমের প্রতিকূল। তোর উল্টা বিধির ফলে কান্তপরিত্যক্তা কান্তাকেও বাঁচিয়া থাকিতে হয়। না-না, তোরই বা দোষ কি? তুই তো কর্ম্মফলপ্রদাতা। তোর বিধানে, যার যেরূপ কর্ম্ম তার সেই রূপ শাস্তি। তোকে আমি দোষ দিই না, কিন্তু যিনি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, যাঁহার সুখের জন্য আমি সব ছাড়িয়াছি, তিনি আমাকে ছাড়িলেন কিরূপে? হায় হায়, সুখাদি সর্ব্বস্বই নিয়ে তিনি চলে গেলেন, আর দিয়ে গেলেন শুধু দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশ ও চোখের জল। না-না, তাঁরই বা দোষ কি? সমস্ত দোষ আমার এই পোড়া অদৃষ্টের। না জানি, জন্মান্তরে আমি কত পাপ করিয়াছি, এখন তাহারই ফলভোগ করিতেছি। হায়! হায়! আমার পরাণ কি কঠিন। প্রিয়তম আমাকে ছাড়িয়া গেলেন, তবু আমার এই পাপ প্রাণ বাহির হইল না।" এই রূপ বলিয়া প্রভু বামগণ্ডে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। দুঃসহ বিরহানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

শ্যামপরিত্যক্তা বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধিকার আবেশে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু আবার বলিতে লাগিলেন—"সখি! আর কি সেই বৃন্দাবন-বিহারী বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিবেন না? আর কি সেই বংশীধারীর মোহন বেণুগানে আমাদের কর্ণকুহর সুশীতল হইবে না? হায় হায়! ব্রজের আর সে শোভা নাই, যমুনার জলে আর সে আনন্দ উচ্ছ্বাস নাই। শ্যাম বিহনে সমস্ত ব্রজভূমি ম্রিয়মান হইয়া আছে। তরুলতা আর প্রেম কথা কহে না, বিহগকুল আর প্রেম গীত গাহে না। কুসুম কুঞ্জে মধুকর আর গুঞ্জন করে না, শুক শারী আর মধুর বুলি বলে না। পয়স্বিনী ধেনু আর

তৃণ স্পর্শ করে না, বৎসগণ আর স্তন্যপান করে না। সমস্ত স্থাবর জঙ্গমই যেন বিরহ দহনে দগ্ধ হইতেছে। সখি! আমি যে কোথাও স্বস্তি পাইতেছি না। প্রাণবল্লভের সহিত আমার সকল সুখ এমন কি নিদ্রা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। হায় হায়! আর আমি আমার পরাণ পুত্তলী শ্যামনাগরকে যমুনা পুলিনে কদম্বের তলায় দেখিতে পাইব না। সখি! এখন আমি কি করি? এখনও যে আমার প্রেম-পিপাসা মিটে নাই, এখনও যে আমার প্রতি অঙ্গ তাঁহার সুখস্পর্শ পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া আছে। সখি! শ্যামশূন্য এই বৃন্দাবনে আর আমি থাকিতে পারিব না। আর যাঁহার জন্য আমার এই মনোহর বেশভূষা, তিনিই যদি পরিত্যাগ করিলেন, তবে আর বসনভূষণাদির প্রয়োজন কি? সখি! এইসব এখন যমুনাজলে ভাসাইয়া দাও।" ভাবতরঙ্গে জর্জ্জরিত হইয়া প্রভু স্বরূপের গলা জড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"সখি! শ্যামবিহনে আমি বাঁচিব কিরূপে? কানু বিরহে কি প্রাণ বাঁচে? শ্যামনাম জপিতে জপিতে আমি এ ছার তনু ত্যাগ করিব। আমাকে গরল আনিয়া দাও, আমি পান করি।" অবস্থা বুঝিয়া স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর মনোভাবের অনুকূল গান ধরিলেন—"মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব। কানু হেন গুণনিধি, কারে দিয়ে যাব॥ তোমরা যতেক সখী, থেকো মঝু সঙ্গে। মরণকালে কৃষ্ণনাম, লিখো মঝু অঙ্গে॥ ললিতে প্রাণের সখি, মন্ত্র দিয়ো কানে। মরা দেহ প'ড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥ না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ, না ভাসাইও জলে। মরিলে তুলিয়ে রেখো, তমালের ডালে॥ সেই ত তমালতরু কৃষ্ণবর্ণ হয়। অবিরত তনু মোর, তাকে জনু রয়॥ কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥ পুনঃ যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব। বিরহ অনলে মাহ তনু তেয়াগিব॥"

গানটী শুনিয়া প্রভু ভাবাবেশে উন্মত্তপ্রায় হইলেন, দারুণ বিরহ-বেদনায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। প্রভুর অবস্থা দর্শনে স্বরূপ ও রামরায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন স্বরূপ গোসাঞি আবার গান ধরিলেন—"কি কহব রে সখি! আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥ আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥ শীতের ওড়নি পিয়া, গিরিষের বা। বারিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥ ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর নারি। সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥" গান শুনিতে শুনিতে প্রভু ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

প্রভুর সহজজ্ঞান এখন ফিরিয়া আসিয়াছে। আনন্দভরে স্বরূপের দিকে তাকাইয়া প্রভু তাঁহাকে সাদরে বলিলেন—"স্বরূপ! তোমার সুধা-মধুর কণ্ঠের সুমধুর গান শুনিলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়। তুমি আমাকে শ্রীরাধার **আত্মনিবেদনের** একটী পদ শুনাও।" স্বরূপ গোসাঞি গাহিতে লাগিলেন—"বঁধু! তুমি সে আমার প্রাণ। দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি, কুলশীল জাতি মান॥ অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন। গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন॥ পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়। তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন ভায়॥ কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ। তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥ সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাপপুণ্য সম তোমারি চরণ খানি॥" গান শুনিয়া প্রভু আনন্দে আত্মহারা হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক দেখা দিল। ক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রভু বলিলেন—"স্বরূপ! আত্মনিবেদনের আর একটী পদ শুনাও।" স্বরূপ গোসাঞি আবার গান ধরিলেন—"বঁধু! কি আর বলিব আমি। জীবনে মরণে, জনমে, জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি॥ তোমার চরণে, আমার পরাণে

বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি। সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া, নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥ ভেবে ছিলাম মনে, এ তিন ভুবনে, আর মোর কেহ আছে। রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥ একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়। শীতল বলিয়া, শরণ লইনু ও দুটী কমল পায়॥ না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে, যে হয় উচিত তোর। ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর॥ আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তবে যে পরাণে মরি। চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

গান শেষ হইলে প্রভু সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বরূপ! শ্যামসুন্দর ইহার উত্তরে কি বলিলেন?" তখন স্বরূপ আবার গান ধরিলেন—"রাই! তুমি সে আমার গতি। তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি, গোকুলে আমার স্থিতি॥ নিশি নিশি বসি, গীত আলাপনে, মুরলী লইয়া করে। যমুনা-সিনানে, তোমারি কারনে, বসি থাকি তার তীরে॥ তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে, কদম্ব-তলাতে থাকি। শুনহ কিশোরি, চারিদিক হেরি, যেমত চাতক পাখী॥ তব রূপগুণ, মধুর মাধুরী, সদাই ভাবনা মোর। করি অনুমান, সদা করি গান, তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥ চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি, জগতে আর কি হয়। এমন পিরীতি, না দেখি কখন, কখন হবার নয়।" এইরূপ নানাভাবের আবেশে,—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

(চৈঃ চঃ ২।২।৬৬)।

গম্ভীরালীলায় প্রভু বিবিধ ভাবতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ও ব্রজের সুমধুর প্রেমরস আস্বাদনের অভিনব পন্থা ভক্ত-সমাজের নিকট প্রদর্শন করিলেন। গম্ভীরালীলায় তিনি রাগমার্গে ভজনতত্ত্ব দেখাইয়া জীবকে শিখাইলেন—শ্রীকৃষ্ণানুরাগ ও একাগ্রভাবনা, এই

দুইটী সাধনার প্রধান সম্পত্তি। তিনি আরও শিখাইলেন—প্রাণের স্বাভাবিক টান ও তীব্র ব্যাকুলতা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-লাভ হয় না. বিষয়াসক্ত চিত্তে মধুময় কৃষ্ণ-প্রেম স্থান পায় না এবং স্বসুখবাসনা থাকিতে মধুর ব্রজ-রসের উদ্রেক হয় না। গম্ভীরা লীলায় প্রভু নিজে আচরিয়া জীবকে দেখাইলেন—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের কত আপনার জন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ভক্তের দেহ-মন-প্রাণ কিরূপ ভাবে মথিত ও বিকার প্রাপ্ত হয়।

গম্ভীরা লীলায় প্রভু শ্রীরাধা-ভাবের আবেশে শ্রীকৃষ্ণের রসমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া জগতে শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় প্রেম-মহিমা প্রচার করিলেন। কবি গাহিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হৈত, কেমনে ধরিত দে॥ রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা, জগতে জানাত কে?" শ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীশ্যামসুন্দরের ধরায় অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য (গৌরাঙ্গ তত্ত্ব দেখ) এই গম্ভীরা লীলায় পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রভুর এই গম্ভীরা লীলা এত নিগূঢ়, এত পবিত্র ও এত মধুর, যে ইহা বর্ণনা করা বা অনুভব করা তো দূরের কথা, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ বিনা এই লীলা বুঝিবার শক্তিও মায়িক জীবের নাই। প্রভুর কৃপা হইলে, তাঁহার দাসানুদাসের সঙ্গ হয়, তখন জীব ভাবতত্ত্বমূলক প্রভুর এই লীলা বুঝিতে পারে। ভাবের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন হৃদয়ের ভাবটুকুই গ্রহণ করেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর। বুঝিতে না পারে কেহো যদ্যপি হয় ধীর॥ বুঝিতে না পারে যাহা, বর্ণিতে কে পারে? সে-ই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥" (চৈঃ চঃ ৩।১৪।৪-৫)। প্রভুর এই গম্ভীরা লীলা ভক্তগণের অমূল্য ধন (চৈঃ চঃ২।২।৮০)। ভাগ্যবানেরাই ইহা আস্বাদন করিয়া থাকেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং

অপ্রকটের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে মহাপ্রভু বিষয়মুগ্ধ জীবরূপে নিজে আচরিয়া নিম্নলিখিত আটটী শ্লোকে ভজন-সাধনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এই আট শ্লোক বৈষ্ণবজগতে **শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক** নামে প্রসিদ্ধ। ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রভুর **শিক্ষাষ্টক** শ্লোক যেই পড়ে-শুনে। কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥ (চৈঃ চঃ ৩।২০।৫৬)।

১ম। চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং॥

২য়। নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
অকারি=প্রচার করিয়াছেন।
ইহ=এই নামে।
ন অজনি=জন্মিল না।

৩য়। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

৪র্থ। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

৫ম। অয়ি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিত-ধূলী সদৃশং বিচিন্তয় ॥

৬ষ্ঠ। নয়নং গলদশ্রুধারয়া,
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥
(পুলকৈঃ নিচিতং = পুলক দ্বারা পরিব্যাপ্ত)

৭ম। যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥

(যুগায়িতং = যুগবৎ দীর্ঘ বোধ হইতেছে। প্রাবৃষায়িতং = বর্ষাকালীন মেঘবৎ হইয়াছে। শূন্যায়িতং = শূন্যবৎ হইতেছে।)

৮ম। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো।
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

(আশ্লিষ্য = আলিঙ্গন করিয়া। বিদধাতু = বিহারই করুন।)

অন্বয়— [সঃ] পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য (আলিঙ্গন করিয়া) পিনষ্টু, বা অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু, বা [সঃ] লম্পটঃ যথা তথা বিদধাতু, (বিহারই করুন), তু (তথাপি) স এব মৎপ্রাণনাথঃ, ন অপরঃ। শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরাধার উক্তি।

শিক্ষাষ্টকের ব্যাখ্যা—

১। নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের—"সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং" ইত্যাদি—শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে পুণ্যময় বিষ্ণুর সহস্রনাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণ নাম একবার মাত্র গ্রহণ করিলে সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।

সাধনশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয় ঘোষণা করিবার জন্য, ইহাই যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন তাহা দেখাইবার জন্য, মহাপ্রভু বলিতেছেন—

(ক) চেতোদর্পণমার্জ্জনং—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জ্জন করে, অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। বিবিধ দুর্বাসনার দ্বারা চিত্ত-দর্পণ মলিন হইয়া থাকিলে, তাহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রতি-ফলিত হয় না। চিত্তের এই মলিনতা দূর করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার একমাত্র সহজ উপায় হইল শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন। এই সংসারক্ষেত্র রাগ-দ্বেষেরই বিলাস ভূমি। অনাদিকাল হইতে জীবের মলিন হৃদয় রাগ-দ্বেষে পরিপূর্ণ। **রাগ** বলিতে প্রিয় বস্তুতে আসক্তি ও **দ্বেষ** বলিতে অপ্রিয় বস্তুতে বিরক্তি বুঝায়। জীবের এই যে আবশ্যক-অনাবশ্যক-বোধ, এই যে লাভ-ক্ষতির ধারণা, এই যে সুবিধা-অসুবিধার বিচার,—ইহাদের সকলের মূলে থাকে এই রাগ এবং দ্বেষ। নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, আর বিশুদ্ধ চিত্তে রাগ-দ্বেষ থাকে না। চিত্তে রাগ-দ্বেষ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে সেই চিত্ত এখনও বিশুদ্ধ হয় নাই।

(খ) ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন সংসারের মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করে। বৃক্ষ সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে বনমধ্যে

যে আগুন লাগে তাহার নাম দাবাগ্নি বা দাবানল। এই দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত বনকে দগ্ধ করে। জীবের ত্রিতাপ-জ্বালাই তাহার সংসার-জ্বালা। ইহাকেই মহাদাবাগ্নি বলা হইয়াছে। অবিদ্যা বা মায়াই সংসার-জ্বালারূপ মহাদাবাগ্নির মূল কারণ। ভগবৎ-বিমুখ জীবের স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ সে যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, এই জ্ঞান মায়ার প্রভাবে আবৃত থাকায় দেহাদিতে আত্মাভিমান জন্মে। দেহে আত্মবুদ্ধিই জীবের সংসার বন্ধন, আর সংসার বন্ধনই জীবের ত্রিতাপ জ্বালার কারণ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপকে **ত্রিতাপ** বলা হয়। রোগ শোকাদি যাহা দেহ ও মনকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাই **আধ্যাত্মিক**। দস্যু, ব্যাঘ্র, সর্পাদি ভূতগণ হইতে যে দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহাই **আধিভৌতিক** এবং বজ্রাঘাত প্রভৃতি যাহা দৈব প্রেরণা হইতে আইসে তাহাই **আধিদৈবিক**। "ত্রিতাপং হরতীতি হরিঃ"—যে নাম উচ্চারিত হইলে ত্রিতাপ দূর হয় তাহাই **হরিনাম**। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের সকল প্রকার পাপের নিবৃত্তি হয় এবং দুঃখ দুশ্চিন্তারূপ নিখিল সংসার জ্বালা দূরীভূত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ—যিনি হরিনামের প্রভাবে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

(গ) শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং – শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন জীবের শ্রেয়ঃ বা কল্যাণরূপ কৈরব বা কুমুদপুষ্পকে চন্দ্রিকা বা জ্যোৎস্না বিতরণ করে। জ্যোৎস্নার সংস্পর্শে কৈরব বা কুমুদ পুষ্প যেমন বিকসিত হয়, তেমনি সর্ব্বশুভপ্রদ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে কলিহত জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হয়।

(ঘ) বিদ্যাবধূজীবনং—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন বিদ্যারূপা বধূর জীবন স্বরূপ। ভগবৎ-শক্তির দ্বিবিধা বৃত্তি—বিদ্যাও অবিদ্যা বা মায়া। তন্মধ্যে ভগবৎ-স্বরূপা বিদ্যাই জীবের পরম কল্যাণকর। ভক্তিই হইল শ্রেষ্ঠ

বিদ্যা এবং এই বিদ্যারূপা বধূর জীবনই হইল শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। নামকীর্ত্তন বিনা ভক্তিরূপা বধূ জীবিত থাকিতে পারে না।

(ঙ) আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন আনন্দরূপ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হয়। তখন জীব পূর্ণানন্দ উপভোগ করে।

(চ) প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি-পদেই প্রেমামৃতের পূর্ণ আস্বাদন লাভ করা যায়। শ্রীনামের প্রভাবে সাধক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সর্ব্ববিধ রসের পূর্ণ-আস্বাদন লাভ করে। তখন তাঁহার দেহ-মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

(ছ) সর্ব্বাত্মস্নপনং—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রাণীর আত্মাকে আনন্দরসে স্নান করায়। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীনাম বাগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করে এবং মনোমধ্যে বিহার করে। আবার তাহার ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কে কৃতার্থ করিয়া থাকে। এইরূপে সঙ্কীর্ত্তনানন্দের তরঙ্গ দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত আত্মাকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।

২। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবনিধি মহাপ্রভু দীন ভক্তভাবে আবিষ্ট হইলেন। তাঁহার যেন মনে হইল, শ্রীনামে তাঁহার অনুরাগ নাই। এইরূপে দৈন্যে ও বিষাদে অভিভূত হইয়া মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—"শ্রীভগবান বহুপ্রকারে নিজ নাম প্রচার করিয়া সেই সেই নামে নিজের সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন।" জীবের রুচি ও বাসনা অনুসারে শ্রীভগবানের অনন্ত নাম প্রকটিত এবং প্রত্যেক নামেই অনন্তশক্তি বিরাজিত। মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ॥" (চৈঃ চঃ ৩।২০।১৪-৫)। শ্রীনামগ্রহণে বা স্মরণে কোন

নিয়ম নাই, দেশ-কাল-পাত্রেরও বিচার নাই। সকলেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ও সর্ব্বশক্তিমান এই পবিত্র নাম যে কোনও স্থানে ও যে কোনও সময়ে গ্রহণ করিতে পারে। অতঃপর প্রেমের স্বভাববশতঃ দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"আমার দুর্ভাগ্য, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।"

৩। শ্রীনাম গ্রহণ করিলেই পাপক্ষয় হয় বটে, কিন্তু নামের মুখ্য ফল যে প্রেম, দেবদুর্ল্লভ সেই প্রেমলাভ করিতে হইলে চিত্তের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত, তাহাই শিক্ষাষ্টকের **তৃতীয় শ্লোকে** বলা হইল। মহাপ্রভু বলিতেছেন—"সর্ব্ববিধ গুণগৌরবে বিভূষিত হইয়া যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা সুনীচ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা হেয় মনে করিতে পারেন, বৃক্ষের ন্যায় অযাচক ও সহিষ্ণু হইয়া যিনি শত্রুমিত্র সকলের উপকার সাধন করিতে পারেন, স্বয়ং নিরভিমান হইয়া যিনি অপরকে সম্মানিত করিতে পারেন, তিনিই শ্রীনামের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রেমভক্তি লাভ করেন।" কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"উত্তম হঞা আপনাকে মানে 'তৃণাধম'। দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥ বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥ যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥ উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥ এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥" (চৈঃ চঃ ৩।২০।১৭-২১)। দুনিয়ার সকলকে সম্মান দিতে না সকলের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিলে শ্রীহরিনামে প্রকৃত অধিকার জন্মে না।

৪। যেরূপে নাম লইলে প্রেমোদয় হয় তৃতীয় শ্লোকে তাহার লক্ষণ বলিয়া প্রেমময় তনু শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের স্বভাববশতঃ স্বীয় চিত্তে প্রেমের অভাব অনুভব করিলেন এবং দীনজ্ঞানে আপনাকে মায়াবদ্ধ

সংসারী জীব মনে করিয়া ভক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অহৈতুকী বা শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। **চতুর্থ শ্লোকে** তিনি বলিতেছেন—"হে জগদীশ! ধন, জন, সুন্দরী নারী বা কবিত্বশক্তি—এ সব কিছুই আমি তোমার চরণে প্রার্থনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা এই, যেন জন্মে জন্মে তোমার শ্রীচরণে আমার অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিত শুদ্ধাভক্তি থাকে।" এই শ্লোকে প্রভু জীবকে শিখাইলেন যে **শুদ্ধাভক্তিই** জীবের একমাত্র কাম্য বা প্রার্থনার বিষয়। চিত্তে ভুক্তি-মুক্তির বাসনা থাকিতে সুদুর্লভ এই শুদ্ধাভক্তি লাভ হয় না।

৫। শুদ্ধাভক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে প্রভুর চিত্তে দৈন্যভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ভক্তভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে **দাস্যভক্তি** প্রার্থনা করিলেন। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। দাস্যভাবে তাঁহার সেবা করাই জীবের স্বধর্ম। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥" (চৈঃ চঃ ২।২০।১০৪)। জীব যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা বিস্মৃত হইয়া জীব শ্রীকৃষ্ণ- সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য সংসার জ্বালা ভোগ করিতেছে। স্বয়ং ভগবান হইয়াও তিনি জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত **পঞ্চম শ্লোকে** প্রার্থনা করিলেন—"অয়ি নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ! বিষম সংসার সমুদ্রে নিপতিত তোমার এই কিঙ্করকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত পরাগ বা ধূলি-তুল্য বিবেচনা কর। তুমি আমাকে তোমার শ্রীচরণের দাস করিয়া রাখ।"

৬। দাস্যভক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াই মহাপ্রভুর মনে হইল—প্রেমের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভ হয় না। তাই তিনি দৈন্য সহকারে সপ্রেম নাম-সঙ্কীর্ত্তনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া ভক্তভাবে **ষষ্ঠ শ্লোকে** বলিতেছেন—"কবে আমার এমন শুভদিন

আসিবে, যখন তোমার নামগ্রহণ করিতে করিতে আমার নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইবে, আমার কণ্ঠস্বর গদগদ বাক্যে রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং পরমানন্দভরে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে।" চিত্তে প্রেমের উদয় হইলে, নয়নে অশ্রু, কণ্ঠরোধ ও সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। প্রেমিক ভক্ত আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। অন্য কোনও প্রকার সুখভোগের বাসনা তাঁহার চিত্তে উদিত হয় না। অমূল্য এই প্রেমধন বিনা মনুষ্যজন্মই বৃথা।

৭। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর ভক্তভাব অন্তর্হিত হইল। বিরহবিধুরা শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন। প্রাণবল্লভের বিরহ-যন্ত্রণা তিনি যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ ভাবের আবেশে মহাপ্রভু **সপ্তম শ্লোকে** বলিতে লাগিলেন—"গোবিন্দ বিরহে আমার সময় যেন আর কাটে না। এক নিমেষ কালও যেন যুগযুগান্তর বলিয়া বোধ হইতেছে, বর্ষা-ধারার ন্যায় যেন আমার নয়নযুগল হইতে অবিরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, আর সমস্ত জগৎ যেন একটা বিরাট শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে, জগতে যেন আর কেহই নাই।" শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত উৎকণ্ঠায় প্রেমিক ভক্তের মনের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। গম্ভীরালীলায় প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া অধিকাংশ সময় এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেন।

৮। অতঃপর প্রভু ত্রিজগতে অতুলনীয় কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় রাধা-প্রেমের প্রকৃত স্বরূপটী দেখাইবার জন্য রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া শিক্ষাষ্টকের **অষ্টম শ্লোকে** বলিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ, আর আমি তাঁহার চরণসেবার দাসী। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে সর্ব্বতো-

ভাবে সুখী করাই তাঁহার দাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনি শঠ, লম্পট বা ধৃষ্ট—যাহাই হউন না কেন, আমি আমার দেহ মন প্রাণ সমস্তই তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি। তিনি তাঁহার এই দাসীকে গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া পরম সুখীই করুন অথবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, অথবা বহুবল্লভ হইয়া অন্য রমণীর সহিত যথেচ্ছ বিহারই করুন—সকল অবস্থাতে তিনিই আমার প্রাণনাথ, আর কেহ নহেন।" শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্য শ্রীরাধার যে কতদূর ব্যাকুলতা, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সুখের কামনা করেন। রাধাভাবে মহাপ্রভু যেন বলিতেছেন—"আমি তো কখনই আমার নিজের সুখ চাই না। শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে দুঃখ দিয়াও নিজে সুখী হন, তবু তাঁহার সুখেই আমার সুখ হয়। আমি কেবল তাঁহার চরণ-সেবার ভিখারী। তাঁহার সুখই আমার একমাত্র কাম্য। তিনি আমাকে যত্নই করুন বা অযত্নই করুন, যদি আমি তাঁহার চরণ সেবা হইতে বঞ্চিত না হই, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।"

নিজ সুখদুঃখাদির চিন্তা ত্যাগ করিয়া প্রেম-সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরাধার সহিত সঙ্গম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, তাই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিজ দেহ দান করেন। শ্রীরাধা সক্রোধে ভৎর্সনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার ক্রোধ ও ভৎর্সনা। শ্রীরাধা মান করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, তাই শ্রীরাধার মান। এইরূপ অলৌকিক প্রেম, এইরূপ অপূর্ব্ব প্রেমসেবা একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সম্ভবে। শ্রীরাধা বলিতেছেন—"যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ। মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস॥" (চৈঃ চঃ ৩৷২০৷৪৭)। ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যে ভাববন্ধনের ধ্বংস নাই তাহাই **প্রকৃত প্রেম**। সাধারণ

স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বীয় কান্ত কর্তৃক অপর রমণী সম্ভোগ অত্যন্ত দুঃখকর হয় বটে, কিন্তু প্রেমময়ী শ্রীরাধা বলিতেছেন—"আমাকে দুঃখ দিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, অপর রমণী সম্ভোগ করিয়া যদি তাঁহার সুখ হয়, তবে তাহাতে আমার দুঃখ হয় না, বরং তাঁহার সুখে আমার সুখই হইয়া থাকে। তবে যে আমি মানবতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ দেখাইয়া থাকি, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য। পাছে সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণের মরম বুঝিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সেবা করিতে না পারে, পাছে তাহাতে মদ্গতপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট হয়—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমি শ্রীকৃষ্ণসুখার্থে মান করিয়া থাকি। সর্ব্বাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসুখেই আমার সুখ।" বিশুদ্ধ ব্রজ-প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা নাই, ইহাতে স্বসুখবাসনার বা আমিত্বের লেশমাত্রও থাকে না। ইহাই বৈষ্ণব-সাধনার ও মধুর ভজনের চরম তত্ত্ব, ইহাই সাধন রাজ্যের সাধ্যাবধি।

প্রেমময়ের পদে আপনাকে বিলাইয়া দিতে না পারিলে প্রেমিক হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া জীব যখন তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারে—"ওগো প্রিয়তম! তুমি আমাকে যত ব্যথাই দাও না কেন, সকল সময়ে তুমিই আমার পরম প্রিয়, তুমিই আমার যথাসর্ব্বস্ব, তুমিই আমার একমাত্র কাম্য"—তখন আর তাহার কোন দুঃখজ্বালা থাকে না, তখন তাহার সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে তাহার অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিগূঢ় এই লীলা বিশ্বজনের হৃদয়ে প্রতিভাত হউক।

ওঁ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ। ওঁ তৎ সৎ।

বিষয়-সূচী

পাত্র-সূচী

NABADWIP SADHARAN GRANTHAGAR
ESTD.
1907
(P.O. NABADWIP) NADIA